আমি

শান্তি রায়

গ্রন্থজগৎ
৭জে. পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা ২৯

প্রথম প্রকাশ

৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

প্রকাশক

লাল মোহন দত্ত

৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড

কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ডি, সি, বোস এণ্ড কোং

৬৫বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

ব্লক

প্রভাত চন্দ্র দাস

১১/১ হরিপাল লেন

কলিকাতা-৬

মুদ্রণ

ঘোষ আর্ট প্রেস

শ্যামসুন্দর ঘোষ

১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭

—তিন টাকা—

শ্রীমতীকে—

আমি

আইভান ট্যুরগেনিভের সৃষ্ট একটি চরিত্র আছে তার নাম রুডিন। বছর চোদ্দ পনরো আগে উত্তর ইউরোপের সাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাসের ধারা যখন বাঙালী সাহিত্যিকদের যথেষ্ট নাড়া দিচ্ছে তখন এই রুডিন চরিত্রটি অত্যুজ্জ্বল অন্যান্য চরিত্রদের চাপে হয়তো একটু চাপা পড়ে গিয়েছিল, আজও হয়তো চাপাই আছে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে 'আত্মকেন্দ্রিক' চরিত্রগুলির মধ্যে রুডিন রীতিমতো দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আজ রুডিনের কথা মনে পড়ে। 'আত্মকেন্দ্রিক' প্রতিভাশালী এই যুবকের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবিটিও বেশ আন্দাজ করতে পারি। দেশ মুক্তির লড়াইয়ে রক্তে রাঙা পতাকা নিয়ে তার শেষ অভিযান—নিঃসঙ্গ সে অভিযানের দৃশ্যটি আজ পরিষ্কার দেখতে পাই। ঊনবিংশ শতকের মনীষী 'আত্মকেন্দ্রিকতার' চরম পরিণতি দেখিয়ে গেছেন। আর সেই সঙ্গে যেন মানব মনের প্রতি নির্দেশ দিয়ে গেছেন 'আত্মকেন্দ্রিকতাকে' সহজ ভাবে বুঝে দেখতে।

রুডিনের বাইরের মানুষটি আমাদের কাছে প্রকাশিত আর তার অন্তর্লোক আমাদের কাছে একটু অস্পষ্ট। মনীষী সে কথা ব'লে যাননি। শুধু আমাদের মনকে দিয়ে গেছেন নাড়া। সেই চোদ্দ পনরো বছর পূর্ব্বে প্রথম পরিচয়ের পর থেকে রুডিনকে নিয়ে নানা সময়ে একটু আধটু ভেবেছি। ভেবেছি নানা বয়সে নানা কথা। গোড়ার প্রশ্নটাই শুধু একই থেকে গিয়েছে। কেন এ রকম হয়? আর কি হ'তে পারতো?

উত্তর আজও জানি না। শুধু রুডিনের একটা ছায়া মূর্ত্তির পরশ আজও পাই। আর সে ছায়ামূর্ত্তির সঙ্গে মনে পড়ে আর দু'টি মানুষের কথা।

দু'টী মানুষ। একজন অনেক কাল আগেই চ'লে গিয়েছে। আর একজন এখানে ওখানে কোথাও আছে তবে কোথায় আছে জানি না।

শুধু জানি তারা এ দেশেরই মানুষ। ব্যবহারে কথায় চাল-চলনে তারা রুডিন নয় তবু রুডিনের কথা মনে প'ড়লে ওদেরও মনে পড়ে।

এদেশের দু'টী মানুষ। তায় অতি নগণ্য মানুষ। তাদের একজন খবরের কাগজ বিলি ক'রতো। বোধ হয় এখনও করে। খবরের কাগজ বিলি ক'রতে আসতো একটা আধভাঙ্গা সাইকেলে চেপে। বাইরের ঘরের রাস্তার ওপরে জানালার ধারে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে কাগজটা ছুঁড়ে দিতো মেঝের উপর, তারপর এক ঝটকায় চলে যেতো। তার প্রাত্যহিক আগমনে কামাই নেই। প্রতিদিন যথা-নিয়মে চায়ের টেবিলে কাগজটা পেতাম ঠিক। কামাই হ'তো দেখাশোনায়। শীতকালে তো কথাই নেই। ভোর-রাত্রে কখন এসে কাগজ দিয়ে যেতো জানি না। গরমের দিনে কখনো সখনো দেখতাম খাকী হাফ্‌সার্ট গায় চোখে পুরু লেন্‌সের চশমা আর হাসি মুখ নিয়ে কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে যাচ্ছে। মাসের গোড়ার দিকে কাগজের দাম নিতেও আসতো নিশ্চয়, কিন্তু সে খবর রাখবার প্রয়োজন আমার ছিল না।

প্রয়োজনটা কাগজ পড়াতেই সমাপ্ত। কাগজওয়ালা যুবক কি প্রৌঢ় অত দিকে মন দেবার মত মনের অবস্থা নয়। তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। গ্রাম থেকে এসে মাতুল গৃহে স্থান পেয়েছি। প্রচণ্ড ক'লকাতা সহরটা দু'চোখের উপর। সে চোখে ভোরবেলার মুহূর্তের দেখা কাগজওয়ালার ছবি মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। তবু মানুষের মন নিজের অজ্ঞাতেই দেখে নিশ্চয়। তা নইলে সেই কদাচিৎ দেখা লোকটার কথা পরিষ্কার আজও মনে আসে কি ক'রে? অবিশ্যি কাগজওয়ালাকে পরেও দেখেছিলাম, কিন্তু পরের দেখায় আগের দেখাকে মিশিয়ে নেয়নি। পর পর ছবিগুলি পরিষ্কার দাঁড়িয়ে পুরো একটা মানুষ হ'য়েই স্থান ক'রে নিয়েছে। শুধু স্থান ক'রেই যে নিয়েছে তা নয়, আরও একজন সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে।

অবিশ্যি তার এই সঙ্গীটি আমার মনেই তার সঙ্গী। বাইরের জগতে সঙ্গীটিকে সে চিনত একটু আধটু, খুব একটা জানতো না। অর্থাৎ নজরের পরিচয়টা ছিল কিন্তু মনের পরিচযটা ছিল না।

সঙ্গীটি আমার সঙ্গেই আই-এস্‌সি পড়তো। বেঁটে খাটো ছেলেটি। গায়ে একটা ছোট সাইজের পাঞ্জাবি। পায়ে একজোড়া অতি নগণ্য চটি। আর মুখের ভাবে না হাসি না গাম্ভীর্য্য, কি যে ছিল তা জানি না। শুধু জানি প্রক্‌সি দিতে কোনদিন তাকে ব'লতে পারিনি। ক্লাস পালিয়ে সিনেমায় তাকে কোনদিন ডাকিনি। কলেজের গায় হাফ্‌ রেস্তোরাঁয় কখনও তাকে দেখিনি, কখনো ডেকেও নিইনি। আর তা ছাড়া ছিল তার নাম আর প্রফেসরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। অবিশ্যি ঘনিষ্ঠতা ঘটতো প্রফেসরদের দিক থেকেই। জানতাম এ কথাটা, তবু যেন এ ঘনিষ্ঠতাকে খুব একটা মেনে উঠতে পারতাম না। আর সেই সঙ্গে জুটেছিল নামটি। নামে কি এসে যায় ? অথচ অত সব কিছুর সঙ্গে জুটে নামটিতে যে কিছুই এসে যায়নি তা বলি কি ক'রে। সেই নামের জন্য সেই বয়সে সম্পর্কে কিছুটা ছায়াপাত ক'রেছিল আর আজ প্রায় দেড় যুগ পরে তার নামের জন্যই তার নামটা হয়তো একেবারে ভুলে যাইনি। অথচ কাগজওয়ালার নাম ভুলে গেছি। ওর নাম ছিল বঙ্কুবিহারী কুণ্ডু।

একই ক্লাসে পড়ি আমি আর বঙ্কু। ক্লাসটি রীতিমতো বড়। শ' দুই আড়াই ছাত্রের মধ্যে আমরা যারা প্রক্‌সি দেই কিংবা আড্ডা দেই বা সুযোগ মত গল্পের বই পড়ি আর প্রফেসরদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাহাদুরি নেই, আমরা বসি এক দিকে। ছোটখাট একটা দল আমরা। আর বঙ্কু আড়াই শ' ছেলের মধ্যেও একান্ত ভাবে একা। ওকে দেখতাম প্রায় ঐ কাগজওয়ালার মতই। দেখতাম প্রায়ই কিন্তু নজর দিয়ে

দেখতাম কদাচিৎ। অথচ কদাচিৎ দেখা সেই বেঁটে খাটো ছেলেটির কথাও কাগজওয়ালার মতই পরিষ্কার মনে আছে।

কাগজওয়ালার সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি পরিচয় হ'ল থার্ড ইয়ারে। ইতিমধ্যে এতটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে গিয়েছে—প্রথম পরিচয়ের পুরো চমকটা প্রকাশ পেল না। অনেকখানি চাপাই থেকে গেল। অর্থাৎ শুধু আই-এস্‌সি পাশ দিয়েছি নয় সেই বয়সের অভিজ্ঞতায় বেশ অভিজ্ঞ হ'য়ে উঠেছি। পরীক্ষায় পাশ দিতে দিতে মাতুলের আশ্রয় ছেড়ে মেসের আশ্রয় নিয়েছি। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য টিউশন শুরু ক'রেছি। পুরনো কলেজ ছেড়ে নূতন কলেজে ভরতি হয়েছি। আর নতুন দেখা পৃথিবীর চমক কাটতে কাটতে নিজের কাছে এবং আর পাঁচজনের কাছে বেশ একটু পরিণত মনের পরিচয় দিতে শুরু ক'রেছি। অতএব হঠাৎ কাগজওয়ালাকে থার্ড ইয়ার বি, এস্‌সি ক্লাসে একই সঙ্গে বসতে দেখেও চমক লাগা ভাবটা চাপা দিয়ে বরং একটু হাসবার চেষ্টা করা গেল। কাগজওয়ালাও একটু হাসল। সে হাসির পরিমাণ তুলির একটা পোছের মতই সরল বটে কিন্তু এক পোছ রংয়ের মতই সে চোখে পড়েও পড়ে না— অথচ যেন অতি গভীর কোন অর্থ বহন করে। ওর হাতে একটা মস্ত বই। খাতা পত্রের বালাই নেই। হাসির অর্থটা ঠিক বুঝি না আবার পরিচয়টা জানবার ইচ্ছে রয়েছে মনে। মোটা বইটাকে আশ্রয় ক'রেই পরিচয় শুরু ক'রে দিলাম। কিন্তু ব্যক্তির পরিচয়ের গোড়াতেই বইয়ের পরিচয়ে থমকে যেতে হ'ল। বইটা একখানি অভিধান। নিশ্চিত ভাবে একটী ইংরেজী বাংলা অভিধান। পুরনো পাতা ছেঁড়া বাঁধাই ছেঁড়া অভিধানটি দেখে বার কয়েক বইয়ের মালিককে দেখে নিচ্ছি—পুরু লেন্‌স জোড়া ঘুরে এসে পড়ল বইয়ের উপর তারপর আমার মুখের উপর। তারপর আবার একটু হাসি। আমিও একটু হাসলাম। কি জানি কেন কোন প্রশ্ন করা হ'ল না। সে বারে পরিচয়টা সেই পর্য্যন্ত।

অভিধান আনা যে একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার সে কথাটাই যেন স্বীকার ক'রে নিয়ে চুপ ক'রে গেলাম। অভিজ্ঞ মন অবিশ্যি একটু দিশেহারা, কিন্তু একদিনে এর কিনারা পাব না তা বোঝবার মত মানসিক শিক্ষা তখন রপ্ত ক'রেছি।

ক্লাস শেষ ক'রে ল্যাবরেটরির দিকে যাচ্ছি অভিধানটি হাতে নিয়ে নবলব্ধ বন্ধুটি দেখি নেমে গেল কলেজের চাতালে। একটু অবাক হ'লাম। জিজ্ঞাসা ক'রতে ক'রতে দেখি চাতালের ধার থেকে টেনে আনছে সেই আধ ভাঙ্গা সাইকেলটি। তারপর সাইকেল চেপে বেরিয়ে গেল কলেজ থেকে।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেলাম। এই হ'লো দ্বিতীয় দফা পরিচয়। গোড়ায় জানতাম কাগজওয়ালা তারপর দেখলাম অভিধান হাতে আর শেষটায় ভাঙ্গা সাইকেল নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়েই চলে গেল। কম কথা কয় কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতেও যে নারাজ এ যেন ঠিক ওর হাসির সঙ্গে মানান-সই নয়।

শেষের পরিচযটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ডেস্ক্ খুলছি, মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল বন্ধুর সঙ্গে। পুরনো কলেজের দু'চার জনের সঙ্গে ইতিমধ্যে দেখা হয়েছে। বন্ধুও পুরনোদেরই একজন। এতকাল এক সঙ্গে পড়েছি কথাবার্তা বড় একটা হয়নি। আজ অবিশ্যি আমি এগিয়ে গেলাম। হয়তো সেকেণ্ড ইয়ারের সে বন্ধু এ নয কিংবা হয়তো সেকেণ্ড ইয়ারের সে আমি এ আমি নয। রীতিমতো অন্তরঙ্গের মত একগাল হেসে শারীরিক মঙ্গলের কথা জানবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলাম। বন্ধু মৃদু একটু উত্তর দিয়ে প্রায় মুখোমুখি উল্টো দিকের ডেস্কে কাজ ক'রতে চ'লে গেল। অন্তরঙ্গতা অস্বীকার ক'রল না কিন্তু আতিশয্যকে আমল দিল না। এই পর্য্যন্তই মনে পড়ে সেদিনের কথা। বাকিটা একটা মস্ত বড় ল্যাবরেটরির ছবি—সারি সারি ছোট বড়

শিশি বোতল, নানা রংয়ের এবং নানা ধরণের রাসায়নিক পদার্থ, জলন্ত বুন্‌সেন বার্ণার, ফ্লাস্ক, টেষ্ট টিউব, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের অতি মনযোগী সব ছাত্রের দল, আর বিরক্তি পূর্ণ মুখ নিয়েঘুরে বেড়াচ্ছেন জন দুই ডিমনষ্ট্রেটর—এই সব মিলিয়ে একটা ছবি। কিন্তু সে ছবিতে একটি নত মুখ আর দুটি কর্ম্মরত হাত প্রায় আমার উল্টো দিকের ডেস্কে—সমস্ত ছবিটায় একান্ত ভাবে ও যেন একটা নিজস্ব কোণ নিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

তারপর ক্লাস, প্রফেসর, ছাত্রদের ভিড়, পচা ডিমের মত গন্ধ যুক্ত সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন—এরই ভেতর একটা দিনের কথা। সে দিনটা অনেক কিছুর জন্যই দায়ী। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখি সে দিনটা আর তার আগের গায় গায় ঘেসাঘেসি পর পর দিন সপ্তাহ মাসগুলিকে। তারা প্রায় একই ধরণের। কাগজওযালা আসে যায়। দু'একটি ক্লাস সে করে, প্রাযই করে না, দু'চার দশটি কথাও হয়েছে। তা প্রায় সবই এক তরফা। একদিকে আমার ছোটখাট জিজ্ঞাসা অপর দিকে সামান্য হাসি আর দু'একটা সামান্য জবাব। হাতে কোনদিন একটি খাতা কোনদিন বা মোটা কিংবা চটি দুটি একটি বই। সেবই আর অভিধান নয়, কিন্তু বি, এস্‌সির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় নেই বল্লেই চলে। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা কিংবা দান্তের ডিভাইন কমিডি আবার হয়তো বা রমেশচন্দ্রের ভারতবর্ষের ইতিহাস। সে ইতিহাসের পাতায় মেয়েলি হাতে মেয়েলি নাম লেখা। কিন্তু সে মেয়ে কে, কি তার সঙ্গে সম্পর্ক, কিংবা সম্পর্কটা কতদূর গভীর সে সব ব্যাপারে কৌতূহল দেখাবার মত পরিচয়ের সুযোগ নেই। কাগজওয়ালা আছে আমরাও আছি। তবু ওর থাকাটাই যেন নানা প্রশ্নের উদ্রেক করে।

আর ওদিকে আছে বঙ্কু, কিন্তু তাকে দেখে প্রশ্নের উদয় হয় না শুধু মনে হয় এ মুখ আমার চেনা। কবে কোথায় দেখেছি তা মনে

নেই। সেই কবে দেখেছি কবে চিনেছি তাই যেন জানতে চাই আর জানতে গিয়েই বারবার দেখি। দেখার সুবিধে হয় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে।

সেই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেই একদিন সামান্য একটু বিপর্য্যয় ঘটে গেল। বেলা তখন গোটা দু'যেক হবে। আমরা জন আট দশ কেমিষ্ট্রি অনার্সের ছাত্র ব্লো পাইপে ফু দিয়ে দিযে মুখে ব্যথা এনে ফেলেছি আর সঙ্গে সঙ্গে ঘামছি। নানা সব বিদঘুটে সল্টের পরীক্ষা হচ্ছে। তাদের গলিয়ে পুড়িয়ে গন্ধ নিয়ে তারা যে যা ঠিক যে তাই তাই জানবার প্রাণপণ চেষ্টা। একনিষ্ঠ আমরা। আমরা জেনেও জানি না। আমার অবস্থা আবার ওরই মধ্যে অতিরিক্ত করুণ। আমার নাক ভরতি সর্দ্দি আর গলায় কাসি। সমস্ত ক্লাসে পচা ডিমের দুর্গন্ধ তার ঠেলায় মাথা ধরেছে, হাপরের মত শ্বাস টানছি আর কাজ ক'রছি। কি সল্ট তা মনে নেই। এক টুক্‌রো চারকোলের ভিতরে বিশেষ সল্টটি দিয়ে সঙ্গে মিশিযেছি পটাশিয়াম সায়ানাইড, তারপর ব্লো পাইপ দিয়ে তারই উপর আগুনের ফলক ফেলছি। সে ফলকের জোর আছে। সল্টের সঙ্গে সায়ানাইড মিশে গলে গিয়ে রীতিমতো ধোঁয়া উঠছে আর সুযোগ বুঝে সেই ধোঁয়ায় নাক দিয়েছি গন্ধ নিতে সল্টের গোপন পরিচয় জানতে। নাক বন্ধ তাই বেশ জোর টান দিয়ে ধোঁয়া নিচ্ছি, ব্যস্ আর কিছু বুঝবার আগেই হাত পা গেল বিগড়িযে। ব্লো পাইপ আর চারকোল প'ড়ল খসে। এক মুহূর্ত্তে ঘটে গেল ব্যাপারটা। সবই প্রায় ডুবে যায়। শুধু মাত্র এতটুকু একটা জ্ঞানের সামান্য একটু জেগে এবং জাগিয়ে ওঠার চেষ্টা ছাড়া—এখানে আর এক মুহূর্ত ও নয়। ছুটলাম বাইরে প্রায় অন্ধের মত। অন্ধের মতই ঢুকলাম একটা পরিচিত মেসে। তারপর কার একটা বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ। সেই থেকে প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক শুধু মুখ দিয়ে কেনা আর কোন রকমে টিক্ টিক্ ক'রে বেঁচে থাকা। সে যাত্রায় বেঁচেই গেলাম।

বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ শরীর একটু সুস্থ হয়েছে। বেঁচেই যে আছি তা তখন প্রত্যয় হচ্ছে। হাত মুখে জল দিয়ে ফিরে এলাম কলেজে। কলেজ তখন ফাঁকা। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের দরজায় মস্ত একটা তালা ঝুলছে। তালা দেখে আমার প্রায় মাথায় হাত দিয়ে ব'সবার অবস্থা। বইগুলো তো যাবেই কিন্তু ডেস্ক থেকে যদি বেয়ারা বা আর কেউ কিছু সরিয়ে থাকে, দাম মেটাতে বোধহয় বা বাকি বইগুলো বেঁচে দিতে হয়। অথচ উপায় নেই। চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন মনে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। কয়েক পা এগিয়েছি প্রায় মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল বন্ধুর সঙ্গে।

শান্ত ধীর স্থির বন্ধু এগিয়ে আসছে ফুটপাথ দিয়ে। ক্লাসেও যেমন জনবহুল রাস্তায়ও তেমনি। দুদিক দিয়ে যাচ্ছে আসছে জনস্রোত—সে জনস্রোতের সব মিলিয়ে যাহোক কিছু বিশেষত্ব আছেই। তাদের দ্রুততা ব্যস্ততা কথা বলার ভঙ্গী ক্লান্ত চেহারা পাশ কাটিয়ে চলার অনায়াস ভঙ্গী—এই সব মিলিয়ে মিশিয়ে তারা ক'লকাতার বিকেল বেলার জনস্রোত। রাস্তায় পা দিয়ে চলতে শুরু করলেই ক্রমে তাদের একজন হ'য়ে যেতে হয়। চলমান সেই জনস্রোতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে, নিজের নিজত্বটুকু নিয়েই আসছে, আমাদের বন্ধু। জনস্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে যায়নি। কথাটা তখন খেয়াল হয়নি। শুধু খেয়াল হয়েছিল খেয়াল করবার মত কিছু আছে এর চলার ভঙ্গীতে বলার ধাঁচে। বন্ধুও আমাকে দেখতে পেয়েছিল। মুখোমুখি হ'তেই মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলে:

—আমার কাছে যাচ্ছিলে বুঝি? চাবির খোঁজে?

বলতে বলতে ডেস্কের চাবিটা পকেট থেকে বার করে দিলে। হাত বাড়িয়ে নিয়ে চল্লাম বন্ধুর সঙ্গে পা মিলিয়ে। কোথায় সে যাচ্ছে জানি না। জানি শুধু এই তার সঙ্গে প্রথম চলা। নিঃশব্দে এগোচ্ছি দু'জনে।

কয়েক পা এগিয়ে অনায়াস গলায় প্রশ্ন করলে, কোথায় যাচ্ছ এখন ?

বল্লাম, উঁ, কোথায় আর যাব ! গোলদিঘির ধারে প্রায়ই এ সময়টা কাটাই—বলতে বলতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা আর শেষ করলাম না। কি যেন হিসেব ক'রে নিয়ে বল্লো, তা বেশ, চলো বসা যাবে 'খন।

আবার নিঃশব্দে পথ চলছি। কথা বলার মত বিষয় মনে আসে না। সিনেমা থিয়েটার খেলাধূলা চলবে না। রাজনীতিও খুব সচল হবে বলে মনে হ'ল না। আর আছে সাহিত্য বা বি, এস্‌সির পড়া নিয়ে কথা। বি, এস্‌সির পড়া তেমন পড়িও না জানিও না যে আলোচনা করবো। অতএব সাহিত্য। এই সব মনে মনে আলোচনা করতে করতে পথ চলছিলাম।

কলেজ স্কোয়ারে আসতে আসতে বন্ধু বল্লে, খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে ?

নিজের মনে ডুবে গিয়েছিলাম। কথাটার যোগাযোগ সূত্র বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম, কিসের ? কখন ?

—সায়ানিক ফিউমসের শকে। ও আমি পরীক্ষা ক'রে দেখছি, ভয়ের কিছু ছিল না।

স্কোয়ারে ফাঁকা বেঞ্চ নেই একটিও। ওরই মধ্যে একটা বেঞ্চে আর জন দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে স্থান করে নেয়া গেল। বিকেলের আলো মিলিয়ে আসছে। সাঁতারুর দল পুকুরের জল তোলপাড় করছে। এদিকে স্লিপিং খেলার ব্যবস্থা। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক ছেলেরা পিছ্‌লে পড়ছে জলে পরম আনন্দে। আর স্কোয়ারের চারদিকে লোকজন গিসগিস করছে। গ্যাসের আলো জলে উঠছে একটি দুটি ক'রে। খানিকক্ষণ এইসব দেখে শুনে বন্ধুর দিকে বার কয়েক তাকিয়ে নিয়ে বল্লাম, আমি চলে যাওয়ার পর বুঝি পরীক্ষা করে দেখেছিলে ?

বঙ্কু ঘাড় নেড়ে জানালে তাই বটে। তারপর বল্লে, আগে পড়াও ছিল।

একটু ইতস্ততঃ করে চট্ করে জিজ্ঞেস করলাম, ফিজিক্যাল কেমিষ্টির ক্লাস কেমন লাগে?

আমার দিকে তাকিয়ে বঙ্কু কি একটু ভাবলে তারপর বল্লে, তোমার খুব ভাল লাগে না সরকারের ক্লাস।' এখন থেকে মন না দিলে পরে বেশ শক্ত লাগবে। সাবজেক্টটা সত্যি শক্ত।

কথাটা এক হিসেবে মোড়লি, অথচ মোড়লি ছিলনা ওর কথায়, বল্লাম, মানে কি জান, সরকারের পড়ানই সুবিধের লাগে না।

একটু চুপ থেকে বঙ্কু বল্লে, সে আর বলে কি লাভ। কিন্তু তুমিও তো মন দাওনা। বসে বসে শুধু আউট বুক পড়বে।

একটু হাসির সঙ্গে বল্লাম, আউট বুক কাকে বলছো! বাঙ্গালীর ছেলে গল্পের বই পড়াটা যে তার জন্মগত নেশা।

কোন উত্তর দিলে না বঙ্কু। বুকের উপর দু'হাত আড়াআড়ি ভাবে রেখে পুকুরের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

তারপর মনে পড়ে কি কথায় যেন ওঠার মুখে বঙ্কু জিজ্ঞেস ক'রলে, পূজোর ছুটিতে দেশে যাচ্ছ নিশ্চয়ই?

পূজোর ছুটি! দেশ! একটু অবান্তর মনে হ'ল প্রশ্নটা। অবাক হলাম মনে মনে। কিন্তু কোন কিছুতেই অবাক হওয়াটা যেন একটু অনভিজ্ঞতার লক্ষণ, অবাক হওয়ার ভাবটা প্রকাশ করলাম না। বল্লাম— ঠিক জানি না। হয়তো যাচ্ছি। সেদিনের স্কোয়ারে বসার ছবিটা ওখানেই সমাপ্ত।

এরপর আবার সেই দৈনন্দিন জীবন যাত্রা। ব্যতিক্রম শুধু ক্লাস পালিয়ে সিনেমা দেখার ব্যাপারে। খানিকটা পকেটের জন্য আর মনের

সুর বদলে যাওয়ায় ছাত্রজীবনের এলোপাতাড়ি টানাপোড়েনের রস আর তেমন জুৎসই লাগছেনা। এ কলেজের পাশেও রেস্তোরাঁয় আড্ডা তেমনই বসে। কিন্তু জমিয়ে বসায় উৎসাহের অভাব ঘটছে। ওরই মধ্যে এক-দিন রেস্তোরাঁর জানালা দিয়ে দেখি কাগজওয়ালা আসছে তার ভাঙা সাইকেলে। গলিটায় ছাত্রদের ভিড়। ভিড়ের পাশ কাটিয়ে ব্রেক কসে কাৎ হয়ে সে এগোচ্ছে। হৈ হৈ করে ডেকে বল্লাম, এই যে, এদিকে। কোথায় যাচ্ছেন? ক্লাসে?

পুরু লেন্স জোড়া উঠল একটু উপরের দিকে, তারপর একটু হাসি। জানালার গরাদে হাত দিয়ে একদল চলমান ছাত্রদলকে পথ দিতে সে দাঁড়ালে। আমি জানালাম, ক্লাস আজ হবে না। রায় মুখার্জি কোম্পানি একসঙ্গে অনুপস্থিত।

কাগজওয়ালা নেমে পড়ল। তারপর সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লো, সুখবর। আচ্ছা চলি।

ভাঙা সাইকেলে চেপে কাগজওয়ালা অদৃশ্য হয়ে গেল গলির মোড়ে বড় রাস্তায়। আচমকা ঘটলো ব্যাপারটা। একটু থম্‌কে গিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ লক্ষ্য করেছে কিনা ব্যাপারটা। ভেতরে তখন মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল ফেটে পড়ছে। চায়ের পেয়ালা থেকে এক চুমুক চা টেনে নিতে স্বগতোক্তি বেরোল একটা—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্যই বটে। পড়াশুনা, রীতিমতো ক্লাস করা, প্রক্সি দেওয়া ইত্যাদি আমাদের আছে। কিন্তু কাগজওয়ালার আরও কিছু আছে। ভবানীপুর থেকে সাইকেলে উত্তর ক'লকাতার কলেজে আসা। ক্লাস করার চেয়ে না করাটাই বেশী। প্রক্সির ধারও কখনও ধারে না। প্র্যাকটিকাল ক্লাস যে কখন করে তা খেয়াল করিনি, তবে খুব একটা করে বলে মনে হয় না। বই পত্রের সঙ্গে যোগাযোগ যে খুব একটা আছে মনে হয় না। তার ওপর এই

রেস্তোরাঁ। সিনেমা কি আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া তাও ত' কখনো দেখিনে। অথচ কি ভাবে যেন তার হাসিমুখ সম্পর্ক বজায় আছেই। আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে প্রফেসরদের সঙ্গে ডিমনষ্ট্রেটরদের সঙ্গে—কেউ কখনো কাগজওয়ালাকে অসন্তোষ প্রকাশের বড় একটা কারণ পায়না।

মনে পড়ে প্রফেসর সরকারের ক্লাস। সে যুগে পূর্ববঙ্গ আগতদের উপর ছাত্রদের বক্রোক্তি কিছু ভাটা পড়েছে। কিন্তু প্রফেসর সরকার তার যৌবন বয়সের বাঙ্গাল অপ্রীতির জোয়ারে আটকা পড়ে গেছেন—বয়স তখন পঞ্চাশোর্দ্ধে, কথাবার্তা একটু জড়ান, কিন্তু কোন ছাত্রে কিছু বাঙ্গালত্বের গন্ধ পেলেই তরুণ বয়সের আবির্ভাব হয়, তিনি একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এমনি একদিন একটি ছেলের উপর কিছু ঝঞ্ঝা বর্ষণ হচ্ছে। আমরা বসে আছি চুপচাপ। আমার পাশেই কাগজওয়ালা বসে। একটু দূরে বঙ্কু। পূর্ববঙ্গজ হতচকিত দু'একটা উত্তর দেবার চেষ্টা ক'রে চুপ ক'রে আছে। আমি মৃদুস্বরে বল্লাম কাগজওয়ালাকে, ইয়ে, এর একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

সে বল্লে, প্রতিবাদ! তারপর একটু হাসির সঙ্গে এ পকেট সে পকেট হাতড়ে আমার কাছে পেন্সিলটা চেয়ে নিয়ে আমারই খাতায় লিখে দিলে, রবীন্দ্রনাথ আর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তফাৎ অনেক।

কোন কিছুই না বুঝতে পারাকে স্বীকার করার বয়স সেটা নয়। মুহূর্ত্তের হতবুদ্ধি ভাবটা চাপা দিয়ে বল্লাম, খাতায় না লিখে মুখে বল্লেও ত পারতেন।

আবার হাসিমুখে আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বল্লে, রাগ করলেন? তারপর লেখাটা পেন্সিল দিয়ে কেটে দিয়ে বল্লে, বিশ্বাস করুন ফিগারেটিভ কথার ধাত আমার নেই।

একটু চুপ থেকে কি একটু ভেবে নিয়ে আবার বল্লে, বার্ণার্ডশ আইরিশ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঙালী। টেরোরিস্টরা যতই বলুক, বাংলা দেশ সত্যি আয়ারল্যাণ্ড নয় রবীন্দ্রনাথের দেশ, কি বলেন, তাই নয় ?

শুনেছি ডাঙায় তোলা মাছ খাবি খায়। ডাঙায় না তুললেও বোধ হয় পুকুরের মাছ যদি হঠাৎ সমুদ্রের কোন মাছকে দেখে আচমকা তারই জলে একটু ঢোক গিলে নেয়, বোধহয় পরিচয় জানবারও সময় পায় না। খানিকটা ঢোক গিলে নিচ্ছি সরকারের দৃষ্টি পড়লো।

—ওয়্যাল !

গোড়ায় ভাবলাম এ বুঝি ফিজিক্যাল কেমিষ্টির ফর্মুলা বিশেষের উচ্চারণ। কিন্তু তা নয়, কারণ তখনও চলছে, ওয়্যাল ! ইউ স্যায়ার, ইউ ব্ল্যাক সার্ট !

কাগজওয়ালার গায় একটা ময়লা সার্ট আর আমার গায় বেগুনি রংয়ের হাতকাটা খদ্দরের সার্ট। ব্ল্যাকটা কে ? দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। সরকারের তখন মাথা নড়ছে। তর্জনির টিপ দিয়ে তিনি বল্লেন,

—আঃ মিন ইউ !

কাগজওয়ালা বসে পড়লো। বসতে বসতে বল্লো ফিস ফিস করে, প্রতিবাদের সুযোগ। প্রথমটায় সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদ দিয়ে শুরু হল। কত রোল, আই, এস্‌সির রেজাল্ট কি, অনার্স কি সাবজেক্টে এবং কেন। তারপর চট্‌ করে বিষয়ান্তর আধা কেমিক্যাল ইংরেজী আর আধা জড়ান বাংলায়। বোঝা গেল তিনি জানতে চাইছেন, যখন ক্লাস চলছে তখন কি এমন মুখরোচক আলোচনায় আমরা মত্ত থাকি তিনি তার অংশ পেলে বিশ্লেষণ করে দেখবেন। নানা কারণে একটু উৎক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলাম। ঠিক ঠিক যা যা কাগজওয়ালার সঙ্গে কথা হয়েছিল তারই ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত। সরল বাংলায় এই রকম দাঁড়ায় : ই বি স্যার নো ফল্ট। বেস্ট স্টুডেণ্ট ইন দি ক্লাস স্যার

এন ইবি। প্রতিবাদ করার ইচ্ছায় রোল ফর্টি টুকে (নাকি ফিফ্‌টি টু কাগজওয়ালার রোল ?) বলি। তার মতে রবীন্দ্রনাথ যদি এ্যাসিড শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হচ্ছে অ্যালকালি। শ' হচ্ছেন আইরিশ, টেরোরিস্টরা আয়ারল্যাণ্ড ভক্ত, বাট দেন বেঙ্গল ইজ বেঙ্গল, পূর্ব পশ্চিম নেই এখানে।

তোড়ের মুখে সরকারের তো মো একটু থমকে গিয়েছে। কথাটা শেষ করে একটা মুষ্টাঘাত করলাম হাই বেঞ্চটায়। সরকার তার নাকটা ঘষে নিয়ে বল্লেন, বেস্ট বয়টি কে ?

বল্লাম, বঙ্কু বিহারী কুণ্ডু। বলে বসে পড়লাম। যেন রণক্ষেত্রে প্রবেশের মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণান্তে পথ ছেড়ে দিলাম বঙ্কুকে। সরকারের চোখ জোড়া ক্লাসময় ছুটে বেড়াচ্ছে, কে ? কে ? বঙ্কু কে ? হু ইজ·· বঙ্কু উঠে দাঁড়াল। এত তর্জন গর্জনের পর ক্লাসটা একটু ঠাণ্ডা মেরে গেছে। আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে প্রফেসর ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন,

—আর ইউ দা বিস্ট বোয় ইন দা ক্ল্যাশ ? আর ইউ ফরম—এ্যাঃ হ্যাঃ—ইস্ট বেন্‌গঅল ?

বঙ্কু তার বেঁটে দেহটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। প্রফেসর সরকার একটু থেমে ক্লাসময় একটু তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, —আঃ নো ইউর রেজাল্ট পরহ্যাপ্‌স্‌, বাই নো মিনস্‌ দা বিস্ট, গুড্‌, স্থাটস্‌ অল। গ্যাটম্যানের পাতা উল্টেছো ? আই এসসি আর বি এস্‌সি স্বর্গ আর নরক। মাই লিটারেরি ফ্র্যায়াণ্ড স্থায়ার, ট্যাগোর হোপলেস কেমিষ্ট্রির ক্লাসে। ওয়্যাল, গ্যাটম্যান···

বঙ্কু মৃদুস্বরে বল্লে, পড়েছি স্তর।

—হোয়াট, ইয়াট ! গ্যাটম্যান ! ওয়াল ইয়েস, পড়া আর পড়ায় তফাৎ অনেক। ইয়ে দু'পাতা পড়েই গ্যাটম্যান পড়া হয় না, পড়তে গিয়ে ঘাম বেরোবে, দেন ইট ইজ পড়া।

বন্ধু আবার বল্লে, গেটম্যান সবটাই পড়েছি। আজই আপনার কাছে ক্লাস শেষে কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে……

কথাটা শেষ হ'লনা। সরকার একেবারে হৈ রৈ ক'রে উঠলেন। ছোট ক্লাস। ছাত্রও বেশী নয়। কিন্তু ওরই মধ্যে কাগজওয়ালা তার চার পয়সা দামের খাতাটি পকেটে নিয়ে দরজা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, সরকারের চোখ পড়ে গেছে। বিটের পুলিশ দৌড়ে আসে ঘুষের আশায়, আমাদের সরকার পুলিশ নন কিন্তু তিনি বোধহয় খুশী হন পার্সেন্টেজ কাটবার সুযোগ পাবেন ভেবে। অন্ততঃ সেই রকম খানিকটা চাপা উৎসাহ নিয়ে কাগজওয়ালাকে নিয়ে পড়লেন। বন্ধু তখনও দাঁড়িয়ে। কাগজওয়ালা দরজা থেকে ফিরে এসে আমার পাশে পূর্বের যায়গাতে দাঁড়াল। মুখে হাসি তার আছেই। আর হাতে আছে চার পয়সা দামের খাতাটি। শান্তভাবে দুটো বেঞ্চের ফাঁকে স্থান নিয়ে বল্লে,

—বলুন স্যর!

স্যরের তখন দু কষে ফেনা জমেছে, কপাল ঘেমে গেছে, পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে ক্রুর হাসি হেসে বল্লেন,

—আমি কি বলবো, বলবে তুমি। রোল?

—ফর্টি টু।

—অনার্স আছে?

—ও স্যর শীতের জামা।

—তার মানে? এটা তোমার বাড়ীর রক নয়, ইয়াকি এখানে ..

—শ্যামবাজারের ছেলে আমি নয় স্যর।

—বিহেইভ ইউর—ইউর সেল্ফ, আমি তোমার অনার্স কেটে দেব ·

—ওঃ স্যর ছেড়েই দিতাম।

—আঃ সি, ডু ইউ নো হু আঃ এম ?

কাগজওয়ালা একটু চুপ থেকে হাত তুলে ক্লাসটা দেখালে, তারপর বল্লে, উইদিন দিজ্ ফোর ওয়ালস ইউ আর আওয়ার টিচার, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। বিয়নড্ দিজ্ ওয়ালস আই এণ্ড ইউ আর জাস্ট সোশ্যাল বিইংস।

সরকার একটু থ মেরে গিয়েছিল। তিনি হঠাৎ শান্ত ভাবে বল্লেন বন্ধুকে, টেক্ ইউর সিট! তারপর টেব্‌লে বারকয়েক আঙুলের টোকা দিয়ে বল্লেন কাগজওয়ালাকে, সোশ্যাল বিইংস! তা বেশ, ক্লাস পালাও কেন ?

—ক্লাস না হ'লে ক্লাস পালাই স্যর।

—হোয়াট! ক্লাস না হ'লে মানে? ওয়্যাল, যা ক্লাস হ'য়েছে তা থেকেই প্রশ্ন করছি। বলে তিনি টেব্‌লের উপর থেকে বইটা নিয়ে পাতা উল্টোতে উল্টোতে কাগজওয়ালা বলে উঠল, অনর্থক পরিশ্রম করছেন, ও বই কখনো চোখেও দেখিনি।

—দেন, সরকার বই বন্ধ করে বল্লেন, দেন, হাউ ডু ইউ এ্যাক্সপ্যালইন ইউর—ইউর সেল্ফ, ইউ আর কনট্রাডিক্টিং……

কাগজওয়ালা একটু চুপ থেকে শান্ত ভাবে উত্তর দিলে, তা আর কি করবো স্যর, বয়স তো এখনও আছে, সমন্বয়ের চেষ্টা করবো। প্লিজ পারমিট মি টু গো!

প্লিজ কথাটা মোটেই প্লিজের মত শোনালনা। সরকার অন্যমনস্ক-ভাবে বল্লেন, ইউ মে, বাট দেন, তোমার এক হপ্তার পার্সেণ্টেজ আমি কেটে দেবো।

কাগজওয়ালা বল্লে, কেন স্যর? আপনি কাটবেন, বেশ ত কাটবেন, কিন্তু কেন ?

সরকার ফেটে পড়লেন, জবাবদিহি করতে বাধ্য নই আমি।

কাগজওয়ালা ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো ক্লাস থেকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা বেজে উঠলো। সরকার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বল্লেন, আমার চেম্বারে দেখা ক'রো।

একটু বিশদভাবেই বলা গেল সমস্ত ব্যাপারটা। ওদের দুজনকে একই সঙ্গে একটিমাত্র পরিপ্রেক্ষিতে আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বেশ একটু থমথমে মন নিয়ে সেদিন ক্লাস শেষে বাইরে এসে নীরব একটা কোণ খুঁজতে লাইব্রেরীতে যাচ্ছি কাগজওয়ালার সঙ্গে দেখা লাইব্রেরীর গলিতে। বগলে খানকতক বই। মুখে স্মিত হাসি। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে কি একটু ব'লে চলে গেল। ঐ ফাঁকে দেখলাম বগলে খান দুই ইতিহাসের বই। ইতিহাসের বইয়ের চেয়ে অবাক ক'রেছিল সেদিন ওর মুখের ভাব—সে মুখে ঝড় ঝঞ্ঝার এতটুকু চিহ্ন নেই। লাইব্রেরীতে লিজারটা কাটিয়ে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শেষে গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরছি। হোস্টেলের সামনে বন্ধুর সঙ্গে দেখা। কি জানি কেন দাঁড়ালাম। চুপচাপ দেখলাম ওর মুখটা। মুখের ভাবে কোন পরিবর্ত্তন নেই, কিন্তু একটু যেন ফ্যাকাসে। হেসে জিজ্ঞেস করলাম, সরকারের সঙ্গে কথা হ'ল ?

বন্ধু মাথা নেড়ে জানাল। হয়েছে, তারপর আমার হাত থেকে বইগুলি নেড়ে চেড়ে দেখে বল্লো, এ তো দেখছি গল্পের বই! বেশ লাগে তোমার গল্প উপন্যাস পড়তে ?

স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রশ্ন বন্ধুকে করতে শুনিনি। একটু অবাক হ'লাম। বল্লাম, বেশ আর কি লাগবে, সময় কাটাই এই পর্য্যন্ত। বইগুলি ফেরৎ দিয়ে আলগোছে জানাল, কেমিষ্ট্রির বই যদি দরকার হয় নিতে পার আমার কাছ থেকে।

ইঙ্গিত ছিল কথাটায় প্রকাশের ভঙ্গীটি যদিও অতি নির্লিপ্ত। ইঙ্গিতটা সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলাম, শরীর তোমার ভাল আছে ?

চমকে গেল কথাটায়, একমুহূর্ত্ত দুটো চোখ যেন হাৎড়ে বেড়াল এদিক সেদিক, তারপর একটু হেসে বল্ল, একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে বুঝি? তারপর একটু চুপ থেকে বল্লে, কলেজ স্কোয়ারে যাবে নাকি বিকেলের দিকে?

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করতে করতে বল্লাম, ঠিক কিছু নেই, যদি যাও ত যাই।

কথা বলতে বলতে হোস্টেলের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। বঙ্কু কি যেন ভাবছে মন দিয়ে। মাথাটা সামান্য ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। আমি সিগারেট টানছি চুপচাপ। মাথাটা ধীরে ধীরে সোজা ক'রে, আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে, আচ্ছা যাবোখ'ন আর একদিন। চলি।

বলে চলে গেল হোস্টেলে। আমি পা বাড়ালাম বাড়ীর দিকে। ওর ফ্যাকাসে মুখটা মনে থেকে গেল। বঙ্কুর রং এমনিতে উজ্জ্বল শ্যাম, তবে রক্তশূন্য নয়। চেহারায় যে কালোর ছোঁয়াচটা তাতেই ফ্যাকাসে হ'লেও ওকে ফ্যাকাসে বোঝা যাওয়ার কথা নয় চট্ ক'রে। মুখটা ফ্যাকাসে, কিন্তু আর কিছু নয়।

তারপর বেশ কিছুদিন পরে। সরকারের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ আগতদের যাহোক একটা সমতা ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ক্লাসগুলি চলছে বেশ একটু দুলকি চালে। ট্রেনের দীর্ঘযাত্রীদের মত মোটামুটি একটা বোঝা-পড়া হ'য়ে গিয়েছে—আর রোলকল, ক্লাস পালান, অধ্যাপকদের স্বস্ব ধাঁচ-গুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের দিনগুলি খানিকটা গা ছাড়া ভাব নিয়ে চালু আছে। রমাপতির ঘুম নিয়ে অধ্যাপক বিশ্বাসের চেঁচামেচি একটু কম। সরকার 'গ্যাটম্যানে' রীতিমতো মন দিয়ে ডুব দিয়েছেন। কি একটা পরীক্ষার নোটিশ পড়েছে বোর্ডে। তাই নিয়ে ছাত্রদের তরফ থেকে বেশ একটু প্রতিবাদ হ'য়ে গেল একদিন। গণিতের অধ্যাপক মিস্টার সাহা চিবোনো ইংরেজীতে বুঝিয়ে বল্লেন আমরা নাকি এখন

বড়ো হয়ে উঠেছি, দুদিন পরে···অতএব··। উঠে দাঁড়ালো কাগজওয়ালা। বল্লো, অতএব আমাদের আজ থেকেই বুড়িয়ে যেতে হবে—একথার মানে হয় না। জ্ঞানানন্দ চৌধুরী আর একটী ছেলে। সেও উঠে দাঁড়াল, কিন্তু বলতে পেলনা। উঠে দাঁড়াতেই হাসি ঠাট্টার ধমকে বেচারা বসে পড়ল।

এমনি সময় একদিন ল্যাবরেটারির দ্বারোয়ান 'পরবী' চেয়ে বসলো। পূজো এসে গিয়েছে। কথাটায় কি যেন ছিল। এখন হয়তো নেই, তখন ছিল। পূজো এসে গিয়েছে, তার মানে পূজোর ছুটি এসে গিয়েছে। 'পরবী' চাওয়ার পরব এটা। পরবী চাওয়ার যেন ধুম পড়ে গেল। কাগজ-ওয়ালা আর আমি দাঁড়িয়ে আছি চাতালটায়, প্রিন্সিপ্যালের খোঁড়া দ্বারোয়ানটা এসে হাত বাড়াল। কাগজওয়ালা চোস্ত হিন্দীতে জানিয়ে দিলে চাকরি বদল করতে সে রাজী কিন্তু 'পরবী' দিতে পারবে না। অবস্থা আমারও সুবিধের নয়। তবু খোলা কথাটা খুলে বলতে পারলাম না। বল্লাম, হবে'খন আর একদিন। খোঁড়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল। কাগজওয়ালা একটু হেসে বল্লে, সদ্বংশজাতদের নিয়েই বিপদ।

কাগজওয়ালার কথা তখন আর বুঝতে চেষ্টা করিনে। হেসে বল্লাম, তা বটে।

কাগজওয়ালা সাইকেলটা টেনে আনতে আনতে বল্লে, দয়া ক'রে গোটা কয় টাকা বকসিস নিয়ে যদি নামটা টিকিয়ে রাখে, তাহ'লেও, অথচ···বুঝতে পারছেন না, কেরানীবাবুর কথা বলছি। মাস চারেকের বাকী পড়লো কিনা···আচ্ছা চলি।

ঘণ্টা পড়তে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ঢুকছি দেখি মাথা নিচু ক'রে বন্ধু আসছে। ডাকলাম, বন্ধু! সাড়া নেই। কাছাকাছি আসতে বল্লাম, কি হে, এতটা ঝুঁকে থাকলে শেষটায় যে লোকের সঙ্গে ঠুকে যাবে।

হাসিমুখে ঢুকলাম দুজনে ভেতরে। কার্যকারণ জানি না, ফস ক'রে একটা কথা বলে ফেল্লাম। বল্লাম, অন্য কেউ হ'লে বলতাম, প্রেমে পড়োনি ত?

গম্ভীরতা থেকে উঠে এল বন্ধু। কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন দেখল দেয়ালের গায়, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্লো, প্রেম!

কথাটা খুব কিছু নয়, কিন্তু সেদিনের পচা ডিমের গন্ধ, সারিবদ্ধ কিপ্ স এ্যাপারাটাস, ঘন গম্ভীর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বন্ধুর উচ্চারণে কি যেন ছিল। আজও স-উচ্চারণ কথাটা আমার কানে বাজে। কি ছিল জানি না। ডেস্কের উপর বইগুলি রাখতে রাখতে বল্লাম, তাছাড়া আর কি!

বন্ধু একটু হাসল। কোন জবাব দিলনা। মনে মনে ভাবলাম বলি প্রেমে পড়েই ত আছ। বইয়ের সঙ্গে। মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। কিন্তু কর্মরত বন্ধুকে কথাটা বলা হ'লনা। বল্লাম অন্য কথা ক্লাস শেষের পর। বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যে হয় হয়। রাস্তায় বেরিয়ে দুজনে চলেছি গোলদিঘির দিকে। ভিড়ের ভেতরে পথ ক'রে নিতে নিতে বল্লাম, 'গ্যাটম্যান' আমার নেই। তোমার ত পড়া হয়ে গিয়েছে। ছুটিতে আমাকে যদি বইটা দাও।

মাথা হেলিয়ে বন্ধু জানাল, দেবে। তারপর মৃদুস্বরে বল্লো, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পড়া ছেড়ে এদিকে একটু মন দিয়েছ, বেশ। সময় আছে এখনও।

তারপর একটু থেমে বল্লে, আজকে ওটা কি বই?

গেটম্যানের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আশা করিনি। থমকে গিয়েছিলাম। তারপর বগলের বই নিয়ে কথা উঠতে একটু যেন ভয় পেয়ে গেলাম। গেটম্যানের কথা বলেছিলাম আর কোন [illegible] ছিলনা তাই একটা কথা পাড়তে। হাত বাড়িয়ে বগলের ভারি বইটা দিতে দিতে মনে হ'ল এ

ছেলেকে আমি আজও চিনিনি। বইটা নিয়ে নাড়া চাড়া ক'রে উল্টে পাল্টে দেখে ফেরৎ দিয়ে বল্লো, ফরাসি পড়ছ কত দিন ?

বল্লাম, এই ত দিনকতক শুরু করেছি। অভিধানটা সস্তায় পাওয়া গেল কিনে ফেল্লাম।

ওর প্রশ্নে একটা হাল্কাভাব ছিল তাই একটু গুছিয়ে বলতে চাইছিলাম কথাটা, কিন্তু গোলদিঘির একটা বেঞ্চে বসতে বসতে দেখি কথাটাই হাল্কা মুখের ভাবটা তা নয়।

বল্লাম, কি হ'লো বন্ধু, ফরাসি তো গপ্প নয় ?

মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, তা নয় সত্যি, কিন্তু গপ্প পড়ার জন্যেই ত পড়ছ ফরাসি। কষ্ট ক'রে বিদেশী ভাষা শিখবে, অথচ পড়বে গল্প।

চুপ ক'রে রইলাম। বিজ্ঞানের ছাত্র আমি গল্প সাহিত্য সত্যিই যে টাবু আমার কাছে। শুধু একটা উত্তর দেওয়ার জন্যেই বল্লাম, তাছাড়াও পড়ার কত কিছু আছে। ভাষাটা শিখে রাখছি এই পর্যন্ত। আর কি জান, ভাষা শিখতে গল্পের জুড়ি নেই। ওরা সব মানুষের মনের কথা কয় কিনা।

নির্বাক দৃষ্টিতে বন্ধু তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বল্লে, কি যে আজকাল হ'য়েছে, রাত্তিরে ঘুম হয় না। পূজোর ছুটি আসছে দিন কয় পরে। ঘুম আসবে না। তোমার হয় নাকি এরকম ?

পূজোর ছুটি আসছে তাই ঘুম হয় না বন্ধুর! গল্পে উপন্যাসে, কি জানি, বল্লাম, কৈ না ত। বন্ধু আমার কথাটার সুর টেনে বল্লো, হওয়ার কথাও নয়। আমিই কি জানতাম, ব্রাড়ীর জন্য···

কথাটা শেষ করলো না। আবার একটা নতুন কথা শুরু করলো, কি জান, ভাইয়েদের জন্য কি যে কিনি ভেবে পাই না। এত সব কেনার জিনিস এখানে! কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে আজ ক'দিন বিকেলের দিকে যাই আসি। এত লোক, এত দোকান পসার! একেকদিন দোতলা বাসে

চেপে চলে যাই ভবানীপুর পর্যন্ত। কত দোকান, কত আলো! তুমি কি নিচ্ছ?

নেব আর কি! নেবার কথাটাই যে শুনলাম এই মাত্র। তাই বল্লাম। বঙ্কু দূরের দিকে তাকিয়ে বল্লো, আঃ ছোট ছোট ভাই বোন, তাদের জন্য কিছু একটা নিতেই হয়। আমি কি নিয়েছি জান?

-- কি?

—রং চংয়ে জাপানী বল কিনেছি একটা ভাইয়েদের দেবো আর বোনের জন্য নিয়েছি একটা চিনে মাটির পুতুল।

আর আমি কিনেছি একটা ইংরেজী-ফরাসি অভিধান। পূজো পর্যন্ত আর কিছু কেনার পয়সা জুটবে বলেও মনে হয় না। বল্লামনা কথাটা. জিজ্ঞেস করলাম, বঙ্কু, গাঁয়ের নাম কি তোমাদের?

গাঁয়ের নামটি যে কি বলেছিল মনে নেই। লোহজঙ্গের কাছে কি একটা গ্রাম। পদ্মার কিছু দূরে একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের নামটি শুনে চুপ ক'রে আছি। গোলদিঘির জলে বিজলি আলোর ছলকানি পড়ছে চোখে। সাতারুর দল কখন উঠে চলে গিয়েছে। স্কোয়ারের ভিড় কমে আসছে ক্রমে। একটা মুড়িওয়ালা গরম মুড়ি হাঁক দিতে দিতে চলে গেল। মাথা তুলে দেখি ঝাপসা বাতাসের ফাঁক দিয়ে আকাশের গায় তারাগুলি জ্বলছে। রাত হ'য়ে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লাম, চল বঙ্কু, এবার ওঠা যাক্।

বঙ্কু মাথা নেড়ে বল্লো, যাচ্ছি।

তারপর একটু চুপ থেকে বল্‌লো, পকেটে তোমার একটা কাগজের পুরিয়া আছে, ওটা দাও।

—কাগজের পুরিয়া···!

কথাটা বলতে বলতে বলা হ'লনা। কাগজের পুরিয়াটার কথা

ভুলেই গিয়েছিলাম। বন্ধু সোজা তাকাল আমার দিকে, মাথা নেড়ে বল্লো, যখন পকেটে পুরছ তখনই দেখেছি।

কথাটা শুনতে শুনতে পকেটে হাত দিয়ে পুরিয়াটা মুঠো করে ধরে বল্লাম, তখনই দেখেছ, তা এতক্ষণ ত কিছু বলোনি ?

বন্ধু হাত বাড়িয়ে বল্লে, বলার আর এতে আছে কি। তুমি ত আর ছেলেমানুষ নও।

হেসে বল্লাম, তাহ'লে আর নিচ্ছ কেন ?

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বল্লে বন্ধু, দেখ, হঠাৎ কখন মেজাজ খারাপ হবে, সায়ানাইডের কথা তখন মনে পড়বে ঠিক। ও জিনিষ সঙ্গে রাখাই বিপদের।

পকেট থেকে বার ক'রে পুরিয়াটা দিয়ে দিলাম। বল্লাম, ও আমি অমনি নিয়েছিলাম, খুব একটা ভেবে চিন্তে নিইনি। হাতের কাছে শিশিটা, ভাবলাম নিয়ে রাখি। না হয় রইলই খানিকটা।

পার্ক থেকে বেরতে বেরতে ডাস্টবিনে পুরিয়াটা ফেলে দিয়ে বল্লো, তবু না রাখাই ভাল। মানুষের কত সময়ে রাগ হয় তার কি ঠিক আছে কিছু !

বিদায় নিয়ে বন্ধু চলে গেল। আমি মেসে ফিরলাম। একবার বুঝি মনে হয়েছিল, নাকি আজই মনে হচ্ছে, যদি কাগজওয়ালার চোখে পড়তো ব্যাপারটা। কি বলতো সে ? হয়তো কিছুই বলতো না। হয়তো বা উৎসাহ দিত, বলতো, সঙ্গে একটু রাখাই ভাল, মানুষের কখন কি হয় বলা যায় কিছু !

সেবার ছুটিতে বন্ধুর কথাটা আর কাগজওয়ালা যা ব'লতে পারতো প্রমাণ হয়ে গেল। বেশ মনে আছে ছুটি আসার মুখোমুখি সময়টা। দ্বারোয়ান দপ্তরীরা 'পরবী' চাওয়ার চেষ্টায় একটু ঢিল দিয়েছে। কার কাছ থেকে কত পাবে তার মোটামুটি একটা আন্দাজ ওরা পেয়ে গিয়েছে,

আর কার কাছ থেকে পাবেনা ভাঁওতায় ঘুরে মরবে তাও বুঝে নিয়েছে। তাই ওদের ঢিলা। আমরা ছাত্ররা হঠাৎ টের পেলুম সেবারের ছুটির নূতনত্ব। আই, এস্‌সি পড়ার সময়ও এটা বুঝতে পারিনি। ছুটি আসছে, তা নিয়ে মাতামাতি নেই, আছে পরস্পরের সংবাদাদি জানাজানি। কে কোথায় যাচ্ছে? কবে ফিরে আসছে? এই জিজ্ঞাসাবাদটা নূতন। থার্ড ইয়ারের এ কয় মাসে যে পরিবর্তনটা আমাদের হ'তে শুরু করেছে এ তারই একটা প্রকাশ। নানা যায়গা থেকে বি এসসি ক্লাসে আমরা জুটেছি অথচ এরই মধ্যে একটা সামাজিক ঘনিষ্ঠতা আমাদের এসে গিয়েছে। এটা পূর্বে ছিল না। কখন এসেছে জানি না। কিন্তু কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দায়িত্ববোধ সেই প্রথম টের পেতে শুরু করেছি। কার কি রকম পড়াশুনো হ'লো তা নিয়ে ঠাট্টা হাসি কমে গিয়েছে। আর্থিক দৈন্য কিংবা অতিরিক্ত অর্থ—কোনটা নিয়েই খুব একটা বলাকওয়ার স্পৃহায় ভাটা পড়েছে। আমরা সবাই মিলে যেন একটা পরিবার। খবরাখবরের পাল্লা চলছে। অধ্যাপকরা বন্ধুভাবে কতটা পড়ানো সম্ভব হ'লো এবং কতটা হবে না তাই নিয়ে আলোচনা করছেন মাঝে মাঝে।

রোল নাম্বার উঠে গিয়ে নাম জানাজানির পরিচয়টাও সে সময়েই শুরু। মনে পড়ে দুটো ছেলেকে। একজন ইন্দু অপরজন ত্রিদিবেশ্বর। হঠাৎ দেখি আমরা বেশ পরিচিত। ত্রিদিবেশ্বর যাচ্ছে না কোথাও। ইন্দু চশমাটা নাকের ডগায় তুলে দিয়ে হেসে বল্‌লো, ত্রিদিবেশ্বর থাকেন বেহালায়। ছুটিটা বেহালায় কাটাচ্ছেন বলুন। মাফ করবেন আপনার নামের সঙ্গে বাবু জুড়ে দিতে পারছি না।

ত্রিদিবেশ্বর কি একটু ভেবে নিয়ে বল্‌লো, বাপ মা এমন নামই রেখেছিল, চাকরি জুটবে কিনা সন্দেহ! নামটা কি সোজা আপদ!

বন্ধু যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। আমাকে দেখে গেটম্যানটা হাতে

দিয়ে চলে গেল নিঃশব্দে। ইন্দু বইটা দেখে চশমাটায় আর একটা ঠেলা দিয়ে বল্লো, চাকরি! চাকরি পাবো বলেই ত বি, এস্‌সি পড়া। কিন্তু ব্যাপার যা দেখছি পাশ করাই ত বিপদের।

কাগজওয়ালা এসে দাঁড়াল পাশে। কথাটা ওর কানে গিয়েছিল। হাসিমুখে আমাদের তিনজনকে দেখে নিয়ে বল্লে, আমার আইডিয়া কি জানেন, বাঙ্গালী ছেলের ছাত্রত্ব পেরোয় না কোন দিন।

বেশ লাগল কথাটা। বল্লাম, অবিশ্যি কলেজ থেকে বেরিয়ে, পড়েও না কোন দিন।

ত্রিদিবেশ্বর যেন একটু চটে গেল। সে বল্‌লো, কলেজ থেকে বেরিয়ে, পড়া শুনার আশা করাই ভুল। রিসার্চ যারা করে তাদের কথা বলছিনা।

কাগজওয়ালা একটা হাই তুলে বল্লো, রিসার্চ মানে পি সি রায়ের ছাত্রত্ব করা, ওতো রিসার্চ নয়, ও হচ্ছে এন্টি টি ক্যাম্পেন। আর সত্যি বলতে কি, ওতো এক রকমের চাকরি। খসলেই ফুরোল।

হাসি পেল ওর কথার ধরণে। হাসলো না ত্রিদিবেশ্বর, বল্লো, মাফ করবেন। ঠিক এ ধরণের মন নিয়ে দেখতে গেলে সবই হলদে দেখায়।

ইন্দু খানিকটা মাঝে পড়া গোছের ভাব নিয়ে বল্লো, কিন্তু চাকরি যে আমাদের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য তাতে আর দ্বিমত কি?

কাগজওয়ালা মাথা নেড়ে বল্লো, তা মাইনেটা যা-ই হোক।

ত্রিদিবেশ্বর জুড়ে দিলে, আর কাজটা যা-ই হোক্‌, উকিলের মুহুরি হ'তে পারলেও বাঁচোয়া।

সবাই হেসে উঠলাম। মনের কোণে একটা দাগ পড়লো। এই তাহ'লে জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়টা শুরু।

খুব সম্ভব সেদিনই ঘটলো বিশ্রী একটা ব্যাপার। ফিজিকস্‌ পড়ান গম্ভীর একজন ভদ্রলোক। নামটা খেয়াল নেই। মিষ্টার বল খুব

সম্ভব। তারই ক্লাসে আমরা যে ছাত্রত্ব পেরিয়ে ভদ্রলোকত্ব দাবি করছি তারই একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। গ্যালারির উপরের দিকে রমাপতি তার চির অভ্যস্ত ঘুমে মগ্ন। ক্লাসে একটা বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া দেখাচ্ছেন মিষ্টার বল। দৈবাৎ কি ক'রে একটা বাল্‌ব ফেটে গেল সশব্দে। রমাপতি ঘুম ভেঙে প্রায় লাফিয়ে উঠে বই খাতা নিয়ে গ্যালারি থেকে ছুটে নামতে নামতে থেমে গেল। বাল্‌ব ফাটার শব্দ তারপর রমাপতির দৌড়ঝাপ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল মিষ্টার বলের সক্রোধ গর্জন রমাপতির উপরে। বেচারা রমাপতি! ব্যাপারটা সে বুঝতেই পারেনি প্রথমটায়। তর্জন গর্জন একটু থামতে রমাপতি ধীরে সুস্থে জানালো, সে দুঃখিত, হঠাৎ চমকে উঠে সে অন্যায় ক'রে ফেলেছে।

মিষ্টার বলের প্রথম ঝাপ্টা কমে গিয়েছে। তিনি কায়দা ক'রে বল্লেন, তোমার ঘুমনোয় আমার কোনদিনই আপত্তি নেই, কিন্তু জিজ্ঞেস করি ভবিষ্যতে কলেজের পড়া শেষ হ'লে কি ক'রবে? অবিশ্যি সুবিধে আছে তোমাদের মত ছাত্রদের। চাকরি তোমাদের জোটেনা। আর জুটলেও পনর বিশ টাকার কেরানীগিরির ঊর্দ্ধে নয়। সে অবস্থায় হয়তো বা ঘুমনো চলে।

একটা লড়াই শুরু হয়ে গেল। রমাপতি রীতিমতো সজাগ হয়ে উঠে রীতিমতো ভুল ইংরেজীতে বল্লো, কলেজ থেকে পাশ ক'রে কিংবা না ক'রে বেরিয়ে মিস্টার বলের চেয়ে দ্বিগুণ মাইনে দিয়ে গোটা দুই এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সে রাখবে।

ফলে মিষ্টার বল রমাপতির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার ক্ষমতা জারি করলেন, ইউ গেট আউট!

উঠে দাঁড়াল কাগজওয়ালা, একটা কথা স্যর, ফাঁসির আসামীকে শাস্তি দিতে বিচারক দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন। রমাপতিবাবুকে বেরিয়ে যেতে বল্লেন আপনি, একটা প্লিজ জুড়ে দিতে পারতেন।

মিষ্টার বল ছোট কথায় কাজ সারলেন, প্লিজ জুড়ে দেযা না দেয়া তার ব্যাপার।

উঠে দাঁড়াল রোল থার্টি টু। বেঞ্চের উপর একটু ঝুকে পড়ে বল্লো, চাকরি দেয়ার ব্যাপারটা আপনার নয় স্তর।

পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, রমাপতি বাইরে যাবে না স্তর, আপনি উইথড্র না করলে।

ইন্দু স্বভাবতঃই একটু লাজুক প্রকৃতির। আজ সেও উঠে দাঁড়াল। চমৎকার ইংরেজীতে বল্লো, আমরা সবাই আপনার কাছে আপনার বক্তব্যের জন্য একটা ব্যাখ্যান দাবি করছি।

গ্যালারির একটু ওপরের দিকে কাগজওয়ালা তখনও দাঁড়িয়ে। হাতে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ। সেটা নাড়তে নাড়তে সে বল্লো, ক্লাসের পক্ষ থেকে আপনাকে দুটো কথা জানাবার আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ কেরানী জীবন নিয়ে আপনি যে ইঙ্গিত করেছেন তা আপনার পদমর্যাদা বহির্ভূত। দ্বিতীয়তঃ আপনার কথায় এই মুহূর্তে যা প্রকাশ পেয়েছে ছাত্র অধ্যাপক সম্পর্কটা তার চেয়ে উঁচু জিনিস। রমাপতি বাইরে গেলেও তা ঢাকা পড়বে না।

এইবার উঠলো বঙ্কু। ক্লাসের গোলমাল কমে এসেছে ততক্ষণ। মিস্টার বল কিছু একটা বলবার জন্য ফাঁক খুঁজছিলেন। বঙ্কু উঠে দাঁড়াতে তিনি যেন একেবারে চমকে গেলেন, এ্যাণ্ড ইউ টু!

খানিকটা 'এট্ টু ব্রুটে'র মত শোনাল কথাটা। বঙ্কু বল্লো ধীরে ধীরে, রমাপতিবাবু আপনার ক্লাসেও অনেক দিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। আপনি তা মেনে নিয়েছেন। আজকে বালব্ ফাটার দরুণ ঘটেছে ব্যাপারটা। আপনি যদি ইচ্ছা করেন এত কথাবার্তার কিছু প্রয়োজন হয় না। আমরা আপনার ছাত্র, আপনি আমাদের অধ্যাপক। আপনি আপনার নিজের বুদ্ধিতে যা ভাল মনে করেন তাই করুন।

কিন্তু রমাপতিকে বার করে দিলে সত্যি কি একটু খারাপ দেখায় না ?

বঙ্কু বসে পড়ল। মিস্টার বল তাঁর বই রেজেষ্ট্রি গুটিয়ে নিয়ে বল্লেন, ওয়েল দেন, তাহ'লে আমাকেই বেরুতে হচ্ছে। উইথ নো ইল ফিলিং। ঘণ্টা প্রায় বাজে।

বেরিয়ে গেলেন মিস্টার বল। সমস্ত ক্লাসের মনভাব কি হয়েছিল জানিনা। শুধু আমার মনে হয়েছিলো কি রকম যেন ফাঁকা হয়ে গেল সব কিছু।

তার পরের দিন হয়ে গেল ছুটির আগের শেষ ক্লাস। কাগজওয়ালাকে কিছু বলবো ভেবেছিলাম। কিন্তু সেদিন সে আসেনি। ক্লাস শেষে বঙ্কুর সঙ্গে হোস্টেল পর্য্যন্ত এলাম। এটা ওটা সেটা কথা হ'ল। ভদ্রতা ক'রে বল্লাম, গেটম্যানটা দিয়ে দিলে অসুবিধা হবে না ?

উত্তরে বঙ্কু বল্লো, অসুবিধা কেন হবে ? ও তো পড়া হয়ে গিয়েছে।

কুতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম, আর পার্টিংটন আর কোহেন ?

একটু মৃদুস্বরে বল্লে, তাও পড়েছি।

এতটা আশা করিনি। জিজ্ঞেস করলাম, তাহ'লে এখন কি পড়ছ ?

—এখন ! এখন পড়ছি পি, সি, রায়ের হিষ্ট্রি অব হিন্দু কেমিষ্ট্রি আর টেক্সট বইগুলি রিভাইজ করছি। তাছাড়া প্র্যাকটিক্যাল ত আছেই।

হোস্টেল অবধি পৌছে দিয়ে ফিরে এলাম। বই পত্র বাক্স বিছানা গুছিয়ে সেদিনই সন্ধ্যের দিকে ক'লকাতা ছেড়ে গেলাম। পূজোর ছুটিটা কাটলো দেশের জল হাওয়ায়। সঙ্গে বঙ্কুর প্রদত্ত ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রির বইটা। বই খুলে দু'চার পাতা পড়ি আর মাঝে মাঝে মনে পড়ে লৌহজঙ্গের সেই গ্রামের কথা। বেজগাঁও হবে বোধহয় গ্রামের নাম। বঙ্কুর সব পড়া হয়ে গিয়েছে ! আশ্চর্য্য ! আর মনে পড়তো কাগজওয়ালাকে। হয়তো তার কিছুই পড়া হয়নি। সেটাও আশ্চর্য্য !

ছুটির পর আবার কলেজ শুরু। খবরটা দিলে ইন্দু। ত্রিদিবেশ্বর সুইসাইড করেছে সায়ানাইড খেয়ে। ক্লাসময় ছড়িয়ে গিয়েছে কথাটা। ক্লাসে একটা থম্‌থমে ভাব। বঙ্কু আসতে ওকে বল্লাম। খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নেড়ে বল্লো, কত বড় দুঃখের কথা।

আর কিছু না বলে গ্যালারির সামনের সিটে গিয়ে বসল। জন দুই তিন ছাত্র দরজায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। ওদের সঙ্গে গিয়ে জুটলাম। একটা শোকসভার কথা হচ্ছিল। এসে দাঁড়াল কাগজওয়ালা। বল্লাম, শুনেছেন খবরটা?

হেসে বল্ল, খবরের কাগজ বিলি করি, খবরটা শোনাই ত সম্ভব।

শোকসভার কথা শুনে বল্লো, ইংরেজীতে একে বলে সিলি। শোকসভা কেন করবেন? হি ওয়াজ ইয়ং। ইয়ংম্যান সুইসাইড ক'রলে বুঝতে হবে এ ছাড়া তার উপায় ছিল না। এতে শোকের কি আছে?

কাগজওয়ালার কথা ওরা মানতে পারলো না। রমেন রীতিমত ক্ষেপে গেলো। কে একজন ঠাট্টা করে বল্লো, আপনার দেশ কোথায় মশায়?

কাগজওয়ালা বল্লে না কিছুই। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। কে একজন খড়ি দিয়ে বোর্ডের গায়ে লিখে দিলে সভার কথাটা। অধ্যাপক ক্লাসে আসতে বোর্ড থেকে লেখাটা তিনি পড়লেন। ছাত্রদের ভেতর থেকে কে একজন মুখে বল্লো ত্রিদিবেশ্বরের পরিচয়। রোল কলের পর অধ্যাপকের অনুমতি নিয়ে নীরবে তিন মিনিট দাঁড়িয়ে আমরা শোক প্রকাশ করলাম। তারপর অধ্যাপক মহাশয়কেই সভাপতি ক'রে সভার কাজ শুরু হ'য়ে গেল।

ত্রিদিবেশ্বরকে স্কুলজীবন থেকে চিনতো রোল সিক্সটি। সে-ই বল্লো ত্রিদিবেশ্বরের খুঁটি নাটি জীবন কাহিনী। ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র ছিল

সে। ছিল তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পরিবার বেশ পাকাপোক্ত দরিদ্র। সে-ই ছিল তাদের ভবিষ্যৎ। একটু রগচটা ছিল। খুব একটা কারুর সঙ্গে মিশতোনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর আরও জন দুই বেশ একটু আবেগময় কথাবার্তা শোনাল। কিন্তু ঠিক সুরটি যেন পাওয়া গেল না। এইবার উঠে দাঁড়াল কাগজওয়ালা। তেমনি হাসিমুখ আর স্মিতভাব। ক্লাসময় একবার তাকিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে শুরু ক'রলো, আমি প্রতিবাদ করি। ত্রিদিবেশ্বরকে কিছু বলবার নেই আমার। আইদার হি ওয়াজ এ হিরো অর এ কাওয়ার্ড। কিন্তু প্রতিবাদ করি আমাদের দেশীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যার একটা প্রতিচ্ছবি আজ এখানে এই সভায় পাচ্ছি। ত্রিদিবেশ্বর কেন স্যুইসাইড করেছে আমরা জানি না, কিন্তু সভা করে চোখের জল ফেলে ব্যাপারটা মুছে ফেলতে······

আর বলা হ'লনা প্রায় জন চার পাঁচ এখান থেকে ওখান থেকে গর্জে উঠলো, ইউ শাট্ আপ! উইথড্র দি রিমার্কস! বসে পড়ুন। বেরিয়ে যান।

হাতের মুঠো উপরে তুলে কাগজওয়ালা বল্লে, আমি যা বলতে চাইছিলাম তা আপনারা কাজের ভেতর দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এরপর আমার বলবার আর কিছু নেই।

কাগজওয়ালা ব'সে পড়তে একে একে দুয়ে দুয়ে প্রায় চার পাঁচজন ছোট বড় বক্তৃতা দিলে। প্রায় একই কথা। অত্যন্ত শোকের কথাটাই সবাই জানালে। তারপর উঠে দাঁড়াল বঙ্কু। এটা আশা করিনি। পাঁচজন লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলার ইচ্ছা সে রাখে তা তার পরিচয়ে কোনদিন প্রকাশ পায়নি।

বঙ্কু বল্লো, ত্রিদিবেশ্বর আমার পাশের ডেস্কে কাজ ক'রতো। কথাবার্তা বেশী বলতো না। কাজ করতো মন দিয়ে। তার মৃত্যু সত্যি

অভাবনীয়। মানুষ একদিন মরে। কাজেই বাঁচবার পথটা যদি সে বেছে নিতো তাহ'লে বোধ হয় তার সমস্থার একটা কিছু সমাধান জুটতো। কিংবা আমরা যদি আরও একটু ঘনিষ্ঠ হ'তাম, আরও একটু জানাজানি থাকে আমাদের, পাঁচজনকে আরও গভীর ভাবে বুঝবার চেষ্টা যদি আমরা করি, ভবিষ্যৎ ত্রিদিবেশ্বর তাহ'লে বাঁচবার পথটাই পায় ব'লে আমার ধারণা। ওর মৃত্যুর জন্য আমরা অনেকটা দায়ী সে জন্যই আমার দুঃখ।

বসে পড়ল বন্ধু। অধ্যাপক একবার তাকালেন চারদিকে। তার-পর উঠে দাঁড়িয়ে সময়োপযোগী কিছু বল্লেন। তাঁর বলা শেষ হ'য়ে যেতে যেতে ঘণ্টা পড়ে গেলো।

ছুটির পর এই শুরু হ'ল আমাদের কলেজ জীবন। সেটা অক্টোবর মাসের শেষ। শীত তখনও দূরে। তবে দিন ছোট হয়ে আসছে। ক্লাস সংখ্যা গিয়েছে বেড়ে। তারপর থাকে প্র্যাকটিক্যাল। ছোট দিনে কুলোয় না। সন্ধ্যে হয়ে যায়। নীরব নিস্তব্ধ কলেজ বাড়ীতে আমরা জন কয় আলো জ্বালিয়ে বিশ্লেষণ করে চলি। তারপর বিশ্লেষণ ফল টুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি সে দিনের মত কলেজ শেষ করে।

মাঝে মাঝে বন্ধুকে সঙ্গী পাই। কোনদিন জুটে যায় কাগজওয়ালা। কিন্তু সংঙ্গী সে বড় একটা হয় না। ভাঙা সাইকেলে তেলের আলোটা জ্বালিয়ে নিতে নিতে দু'চারটা কথাবার্ত্তা হয়।

—শুরু হ'য়ে গেল আপনার নর্থ টু সাউথ জার্নি?

—দি ইটার্নেল জার্নি!

কোনদিন বা বলি, আচ্ছা, থাকেন ত ভবানীপুরে, ওদিকের কলেজেও তো পড়তে পারতেন?

—তা পারতাম, এদিকে একটু সুবিধে আছে। ইউ নো বিজিনেস কোয়ার্টার আর ফ্যামিলি কোয়ার্টার দূরের জিনিস। আই মিন কাগজওয়ালারা সব নর্থেই থাকে।

একদিন সাহস ক'রে বলেই ফেল্লাম, সেদিন বলছিলেন ফ্যামিলি, ইউ নো ইউ আর এ কিউরিয়স এলিমেণ্ট···

—ফ্যামিলির কথা জানতে চাইছেন? অগণন, তার কি শেষ আছে? কলেজে একটা, গৃহে একটা, কাগজ আনতে যাই মেড়োর দল রুখে দাঁড়িয়ে পা মাড়িয়ে তাড়িয়ে দিতে চায়, তা তবু তারাও একটা ফ্যামিলি। জানেন ত গম্বুজ নিবাসী কবি বলেছেন, সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, খানিকটা তাই আর কি!

এমনি ছুটোছাটা কথার টুকরো মনে পড়ে সেদিনগুলির সঙ্গে জড়িয়ে। আর মনে পড়ে বন্ধুর সঙ্গে পথ চলা। বিকেলের দিকে বন্ধু যায় মেডিক্যাল কলেজে। তার এক মামা সেখানে টি বি ওয়ার্ডে আছেন, তাকে দেখতে। আমি যাই কলেজের গেট পর্য্যন্ত। ভেতরে যেতে দেবে না বন্ধু। তার মতে টিবি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ আর আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়।

অক্টোবর নভেম্বর দুটো মাস চলে গেল। বন্ধু নিয়মিত মেডিক্যাল কলেজে যায় আসে। নভেম্বরের শেষের দিকে ওর মামা গেলেন মারা। দিন কয় বন্ধু একটু গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর যেন ফিরে এল ক্রমে।

ডিসেম্বরে বন্ধু হোস্টেল ছেড়ে দিলে। উঠলো গিয়ে প্রফেসর সরকারের বাড়ীর একটা রুমে। ব্যবস্থাটা ক'রলেন প্রফেসর নিজেই। ওর পড়াশুনোর সুবিধে হবে। ব্যবস্থা করলেন বটে, কিন্তু খুব সুব্যবস্থা বলে মনে হ'লনা। পড়াশুনোত' করছেই। তার উপরে 'আরও' পড়ার ব্যাপারটা যেন কি রকম একটু অস্বাভাবিক ব'লে ঠেকল।

ডিসেম্বরে একটু শীত পড়েছে। গরম জামা গায়ে উঠি উঠি করছে। কারওবা উঠেছে। ক্লাস ব্যবস্থা হ'য়ে উঠেছে শুন। 'সম্মানের' সঙ্গে যারা পড়তে চায় তারা পড়ার সম্মান রেখে চলেছে আর যারা তা চায় না তারা

সরে পড়ছে। অধ্যাপক মহল কেউ কেউ চাদর জড়িয়ে ক্লাসে আসছেন, কেউবা গরম স্যুট চড়িয়ে এসে ঘামতে থাকেন।

এমনি সময় একদিন বঙ্কু আর আমি যাচ্ছি গোলদিঘির দিকে। বঙ্কু একটা ওষুধের দোকান থেকে এক বোতল 'অম্বান' কিনে নিলো। ওটা টনিক। জানলাম ওরই মুখে। সরকার পরিবারের ডাক্তার প্রেস্‌ক্রাইব করেছেন আর সরকার নিজে টনিকটার তারিফ করেছেন। কিন্তু আমার মনে টনিক আর বঙ্কুতে কোথায় যেন বেথাপ্পা সুর আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, সরকার আর 'সরকারি' ডাক্তারের অভিপ্রায় আর অভিমতটি কি?

বঙ্কু বল্লে, অভিপ্রায় ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হই। প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক না ওকে পেরিয়ে যায়। আর অভিমত অসুখ বিসুখ নেই কিন্তু টোনিং আপ দরকার।

হয়তো সরকার সম্বন্ধে আমার মনোভাবটা খুব সুবিধেব নয়। তাই অভিপ্রায়টা ভাল লাগলো না। আর টনিক প্রেসক্রাইব করেন যে ডাক্তার তাকে কেন জানি হাতুড়ে মনে হ'তো। যেখানে দেখতে পাইনে সেখানেই তাগা মাদুলি ঝুলিযে দেবার চেষ্টা টনিক দিয়ে। বঙ্কু বোধ হয় বুঝলো আমার মনোভাবটা। বল্লে, ওদের কথাতেই কি আর খাচ্ছি, সত্যি ইদানীং শরীরটা আর জুৎ লাগেনা। টনিকটায় কিছু হ'তেও ত পারে, কি বল?

কিছু হোক এই ছিল ওর কথায়। অবাক হ'লাম। এতো বঙ্কু-বিহারী কুণ্ডুর কথা নয়। বল্‌লাম, তা হ'তে পারে, খেয়েই দেখ না কিছুদিন।

বড় দিনের ছুটির পর শীত জমে পড়ল। সার্টের উপর একটা হাতে বোনা সোয়েটার চাপিয়ে এল কাগজওয়ালা। আর কিছু নয় চোখে পুরু লেনসের চশমা, গায়ে আধ ময়লা সার্ট আর পায়ে সেণ্ডেল—সব মিলিয়ে

ওর হাসি সত্ত্বেও একটা সিরিয়স ভাব ছিল ওর চেহারায়। সোয়েটারে সেটা উবে গিয়েছে। কথাটা ওর কতটা জানা ছিল জানতাম না। সেদিন ক্লাসে রোল কলে কাগজওয়ালার রোল কল হ'ল না। কাগজওয়ালা উঠে দাঁড়িয়ে বল্ল, আমার রোলটা স্যর মিস করেছেন।

অধ্যাপক ঝুঁকে দেখলেন খাতাটা, তারপর বল্লেন, উঁহু মিস করিনি। রোলটা দেখছি নেই। ইউ আর মিসড্।

সোয়েটারের জন্যই হোক আর যে জন্যই হোক ক্লাসে একটা হাসি পড়লো। হাসলো কাগজওয়ালা নিজেও। বল্লো, ফ্রেণ্ডস্ ইউ আর লাফিং এ্যাট মাই পভার্টি। মাইনে দেওয়া হয়নি তাই আমি ব্ল্যাক শিপের দলে পড়ে গিয়েছি।

বলতে বলতে বেরিয়ে গেল অধ্যাপকের অনুমতি নিয়ে। কাগজ-ওয়ালাকে নিয়ে ক্লাসময় একটা হাসির প্রচেষ্টা ছিল জানতাম, কিন্তু হাসির প্রকাশ দেখলাম সেই প্রথম আর সেই শেষ। বন্ধু মৃদুস্বরে বল্লো আমাকে, তোমার মাইনে বাকী পড়েনি ত?

মাথা নেড়ে জানালাম পড়েনি। ও বল্লো, পড়লে চেপে যেওনা জানিয়ো। একটা ট্যুইশন নিয়েছি। হাতে কিছু টাকা আসছে।

সেদিন বিকেলে বসেছি দুজনে গোলদিঘির ধারে। কি একটা উপলক্ষে কলেজ ছুটি হয়ে গিয়েছে বেশ একটু আগে। গোলদিঘির জলে তখন সূর্য্যের সোজাসুজি আলো নেই। এ পাশে ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংসের পাশ দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে অস্তগামীপূর্ব কয়েকটা রশ্মি। সিনেটের দিকে আঙুল তুলে বললাম বন্ধুকে, গ্রীস দেশীয় ধাঁচে তৈরি, জানো?

বন্ধু বললো, জানি না। কিন্তু যদি প্রশ্ন করি কি সিমেণ্ট দিয়ে ওটা তৈরি তাও বলতে পারবে ব'লে মনে হয় না?

বল্লাম, তা পারবো না। কিন্তু একটা কথা ট্যুইশন নেওয়াটা

তোমার ঠিক হয়নি। এদিকে বি, এস্‌সি পড়া ওদিকে ছাত্র ঠ্যাঙানো সামলাতে পারবে কি?

সময় লাগলো না ওর উত্তর দিতে। বল্‌লো, তা পারবো। ছাত্র ত আজই পড়াচ্ছিনা যে পারবো না। যখন আই, এসসি পড়ি···অর্থাৎ যখন, ভাল ছাত্র ব'লে ক্লাসের তোমরা একটু দূরে দূরে রাখতে এ বেলা ছ'টি ওবেলা ছ'টি ছাত্র পড়িয়ে তখন খাওয়া থাকা আর কলেজের মাইনে জোটাই। কি ব'লে সেই রেসিডেনশিয়াল টিউটর আর কি! তারপর আর ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া হ'য়ে উঠতো না। তাছাড়া নিজের পড়াশুনা ত ছিলই। ও রেসিডেনশিয়াল ব্যাপার আই, এস্‌সিতেই খতম না ক'রলে উপায় নেই তাই একটু মন দিয়ে পড়তাম। তবু স্কলারশিপটা পেলাম না। অবিশ্যি কলেজ সুযোগ দিয়েছে কম নয়। একটা স্টারের জোরই কত দেখ! উপায় নেই ভাই, নিজের শরীর ত আছেই, বাড়ীতেও অল্প বিস্তর কিছু পাঠাতে হয় অন্ততঃ হবে, তাই ট্যুইশন। তবু কি জান, ক'লকাতায় প্রথম এসেছিলাম ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে একদম ঝাড়া হাত পা, আজতো দুবেলা দুটির জন্য নিশ্চিন্ত।

একসঙ্গে এত কথা তায় আত্মকথা বন্ধুর মুখে! ভাবিয়ে তুল্লে। একটু হাল্‌কা ভাব আনবার জন্যে বল্লাম, মারোয়াড়ীরা আসে ঘটি কম্বল সম্বল ক'রে তারপর তোলে চারতলা ছ'তলা বাড়ী, আর ব্যাংক ব্যালান্স। তুমি এসেছিলে ঝাড়া হাত পা, নিদেন একতলা একটা বাড়ীর চেষ্টা করবে নিশ্চয়?

একটু হাসল বন্ধু। বল্লো, কি করবো তা জানিনা।

বল্লাম, তা বটে। কি করবো জানতে গেলে কি করা যায় তা জানা যায় না।

বন্ধু আবার একটু হাসল। বল্‌লো, এ সবতো কথার মার প্যাঁচ। চলো ওঠা যাক। ট্যুইশন আছে।

বললাম, একটা কথা, ট্যুইশনটা. জুটিয়ে দিয়েছেন কে ?

বন্ধু বললে, প্রফেসর সরকার।

বন্ধু চলে গেল ট্রামে চেপে ওর ট্যুইশন করতে। সিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। গ্রীসদেশের ধাঁচে গড়া সিনেট হল। সে দিন সেই হলের সামনে দাঁড়িয়েই মনে হয়েছিল প্রাচীন গ্রীকরা বলতো নেমেসিস একজন দেবী তিনি অন্ধ। আমার মনে হ'ল তিনি দেবী নন তিনি দেবতা। আর অন্ধও নন। তিনি আমাদের প্রফেসর সরকার।

বন্ধু আর কাগজওয়ালাকে নিয়ে আমার কাহিনী এই। কাহিনী না ব'লে বলা ভাল কথা। ভেবে দেখবার মত ব্যাপারটা। কাহিনী আর কথা। বন্ধু আর কাগজওয়ালা কি কাহিনীর খোরাক জোগাতে পারে ? পৃথিবীর পথে চলতে গিয়ে আমরা যারা সাধারণ তারা ঠোক্কর খেয়ে উহুঃ বলি, দরকারে অ-দরকারে পথের ধারে ব'সে বিশ্রাম করি, দু'চারপা চ'লে পাঁচটা লোকের সঙ্গে দু'পাঁচটা কথা কই, আর যাওয়ার যায়গাটা নিয়ে খুব একটা মাথাও ঘামাইনা ; সোজা সরল পথ, একদিন পৌছলেই হবে, পৌছন যাবেই একদিন—এ যে হাজার লোকের পায়ে পায়ে তৈরি পথ। ওদের সে রকম নয়। পথে ওদের সঙ্গী খুব একটা জোটে ব'লে মনে হয় না। জুটিয়ে নেবার চেষ্টা বা ভাবনাও ওদের আছে ব'লে মনে হয় না। পথ চলে তাই পথিক, কিন্তু পথটা সম্ভবতঃ প্রায়ই নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গ এই যাত্রার বড়জোর একতরফা বর্ণণাই চলে- তারা এই পথ দিয়ে গিয়েছিল, এই ভাবে গিয়েছিল—সঙ্গীহীন একান্ত এই পথিকদের কাহিনী ব'লে কিছু একটা গড়ে উঠবার সুযোগ ঘটে না।

কদাচিৎ ওদেরকে আশ্রয় ক'রে প্রফেসর সরকারের মত লোকের চাপা আকাঙ্ক্ষা পল্লবিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু একটু খুঁচিয়ে দেখলেই দেখা যায় ওদের যাত্রাপথ আছে ঠিকই—সরকারের চাপা

'আকাঙ্ক্ষা বড়জোর খানিকটা ছায়াপাত ক'রেছে, পথের বেশ খানিকটা জুড়ে দুঃস্বপ্নের কুয়াশা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাতে পথের নিশানায় কিছু ভুল হয়নি, শুধু পথচলা হয়ে উঠেছে বিঘ্নপূর্ণ। এরকম ঘটল বঙ্কুর জীবনেই। কাগজওয়ালা এ থেকে বাদ পড়ে গেল। প্রফেসর সরকার বঙ্কুকে ডেকে নিলেন তাঁর গৃহে। গৃহে বঙ্কুর নিশ্চিন্ত অধ্যয়নের স্থান হ'লো। পাঠ্য এবং অতি পাঠ্য পুস্তকরাশির আমদানি হ'তে লাগলো অতি অনায়াস বিধি ব্যবস্থায়। কলেজ লাইব্রেরী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এবং এ সব যায়গায় অভাব ঘটলে সরকারের নিজস্ব লাইব্রেরী থেকে বই আনার সহজ এবং সোজা ব্যবস্থা হ'ল। দেশে বাপ-মা ভাই-বোনের আর্থিক অবস্থার জন্য দুর্ভাবনার হাত থেকেও বঙ্কু মুক্ত হ'ল। বেশী মাইনের আপাত দৃষ্টিতে অল্প খাটুনির ট্যুইশন জুটল তার। কলেজের প্রফেসরদের সাহায্য প্রাপ্তি ঘটবার ব্যবস্থারও বিলম্ব হ'লনা। অবশেষে পারিবারিক ডাক্তার আদিষ্ট হ'লেন তার শরীরের যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান করতে। খাওয়া পরার ব্যবস্থাও হ'ল। এরপর রইল বঙ্কু আর বই আর আগামী পরীক্ষা এবং সে পরীক্ষায় নিশ্চিত ভাল ফল।

সরকারের ব্যবস্থার কিছু কিছু ঝাঁঝ পড়লো আমাদের উপরেও। সরকারের ক্লাসে বঙ্কু ছাড়া আমরা প্রায় সবাই হ'য়ে উঠলাম নিরাকার পরমব্রহ্ম। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ডিমনষ্ট্রেটররা সরকারের উপদেশ এবং আদেশ পেযে পেয়ে ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় বঙ্কুর উপর একটু অসন্তুষ্টই হয়ে পড়ল। আর যদি বা কালে ভদ্রে বঙ্কুর সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়ীতে যাই বেশ বুঝতে পারি আবহাওয়ায় সরকারের রোষদৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠছে।

সেবার মার্চ্চ মাসের গোড়ার দিকে বেশ দিন কত ঝড়-ঝাপ্টা হ'য়ে গেল। বৃষ্টিপাতও খুব কম হ'ল না। কি একটা ছুটির দিনে পরেশনাথের মন্দির দেখতে এবং দেখাতে গিয়েছি, ফেরার পথে সঙ্গীকে

সরাসরি একটা বাসে তুলে দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পা বাড়িয়েছি ঝড় শুরু হয়ে গেল। মাথা নীচু ক'রে ঝাপ্টার বেগ সামলাতে সামলাতে এগোচ্ছি জল শুরু হ'য়ে গেল। বন্ধুর বাড়ী তখন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঐ পথটা যেতে যেতেই একেবারে ভিজে গেলাম। গায় মাথায় জল গড়িয়ে পড়ছে। ভেজা জামা কাপড় আর সপসপে চটিজোড়া নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওর ঘরে ঢুকে পড়লাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সরকারের আবির্ভাব হ'ল :

—কি চাই ?

বন্ধু টেব্‌লে পড়ছিল। বলে উঠল, আমার বন্ধু। দেখা করতে এসেছে।

বলতে বলতে একটা গামছা এগিয়ে দিল। ভেজা জামাটা কোন রকমে ছেড়ে দিয়ে গা হাত পা মুছে নিচ্ছি সরকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। হঠাৎ বৃষ্টিতে ভেজা কিছু অপরাধ নয়। তবু অপরাধী একটা ভাব যেন চেপে বসছে মনে। ভিজে গেলে একটা জবুথবু ভাব আসাই সম্ভব, কিন্তু তার সঙ্গে মিশে এই অপরাধী ভাবটা, অথচ সরকার দাঁড়িয়েই আছেন। বন্ধু একটা কাপড় এগিয়ে দিলে। বাইরে তখনও জোর ঝড-জল হচ্ছে। ওদিকের খোলা জানালাটা দিয়ে এক ঝাপ্টা ঝড়ো হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানাটার উপর। সরকার একেবারে হা হা ক'রে উঠলেন, বন্ধ কর, বন্ধ কর জানালা! বন্ধুকে দেখছ, নিজেকেও দেখা দরকার। বিছানা ভিজে গিয়ে জ্বর টর হ'লে আবার কামাই···

তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, এই ঝড় জলে তো আর যেতে পারছনা, একটু বসেই যাও।

বল্‌লাম, তাছাড়া আর উপায় কি ?

গলার স্বরে চাপা উত্তেজনা কিছুটা ছিলই। সরকার উত্তরে

বল্লেন—হুম! ইয়ে, বঙ্কু সকালবেলায় যে নোটটা দিয়েছিলাম ওটা ফেলে রেখোনা শেষ করে ফেল।

বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন। শেষ ক'রে ফেলার আদেশটা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাসে একফোটা গ্যাস ছেড়ে দিলে যেমন তা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র, এই শেষ কথাটাও যেন তেমনি ছড়িয়ে রইল। অর্থাৎ দিব্যি নিরিবিলি যে আড্ডাটি জমে উঠবে তাও আর সম্ভব নয়। চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমি বসে রইলাম। আর বঙ্কু চৌকির একটি ধারে গিয়ে বসে পড়ল। খালি গায় একটু যেন শীত শীত লাগছে আমার। বল্লাম, একটা জামা টামা থাকে তো দাওনা!

মাথা নেড়ে বঙ্কু জানাল, জামা নেই। উঠে গিয়ে একটা চাদর এনে দিলে। চাদরটা গায় দিয়ে বসে রইলাম। চুপচাপ ব'সে ব'সে টেবলের উপর বই-এর পাতা উল্টাচ্ছি। বঙ্কু চৌকিতে বসে বসে পা দোলাচ্ছে। বাইরে ঝড়ের বেগ কমে আসছে, বেড়ে উঠছে বৃষ্টির তোড়। বঙ্কুর মনের ভেতরে কি হচ্ছে বঙ্কুই জানে। আধো আলো আধো আঁধার ঘরটায়। চুপচাপ কাটছে সময়। ক্রমে সন্ধ্যে হ'য়ে এল। বঙ্কু উঠে গিয়ে ইলেকট্রিক আলোটা জ্বেলে দিলে। একটা চাকর এসে দু'পেয়ালা চা দিয়ে গেল। চা পেয়ে অনেকক্ষণ পর যেন কথা বলার মত কিছু পেলাম। উৎসাহের সঙ্গে বল্লাম, আঃ চা!

বঙ্কু বল্লে, উপায় কি, খেয়েই ফেল!

ক্যাটক্যাটে আলোয় মুখের রং কি হলদে দেখায়? সেদিন যেন ওর মুখের চেহারটা হলদে দেখাচ্ছিল।

চায়ের খালি বাটি দুটো বঙ্কু বারান্দায় রেখে এল। সরকারের বাড়ীর দিকটা একেবারে নিঃঝুম। বল্লাম, আচ্ছা বঙ্কু এই ক'বার আসছি তোমাদের এখানে এ বাড়ীর কোন সাড়া শব্দ পাইনি কখনো!

বন্ধু বল্‌লে, ক'বার এসেছ বটে, কিন্তু এইবার যদি শেষ বার হয় মন্দ না। ওবাড়ীতে সাড়া শব্দ কথনো হয় না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে কথাগুলি। মুখের পাশটা তাকিয়ে দেখলাম। হুঁ, মুখটা ফ্যাকাশে বটে। আর একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়েছিল, এ মুখের উপর দিয়ে কখনও চোখের জল গড়িয়ে পড়ে না।

জলে ভেজা পিচের রাস্তা দিয়ে একটা বিছানার চাদর গায় ফিরে আসছি, একবার ফিরে তাকালাম বাড়ীটার দিকে। বাইরে থেকে আর পাঁচটা বাড়ীর মতই। ফুটপাথের ওপর একটা ডাস্টবিন বাড়ীটার গায় গায়। একটা গ্যাসের আলো জ্বলছে টিমিটিমি। হঠাৎ গাটা যেন কেঁপে উঠল। অতিকায় একটা মাকড়সা যেন জাল ছড়িয়ে ওৎ পেতে আছে বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গে।

পরদিন বন্ধু এলনা ক্লাসে। যতদূর মনে পড়ে সেই তার প্রথম অনুপস্থিতি। কলেজের পর বেশ একটু সমস্যায় পড়ে গেলাম। একবার যাওয়া দরকার খবর নিতে। অথচ ওর বাড়ীর দিকে পা বাড়াতেই পা যেন ভারি হয়ে উঠল লোহার মত। কলেজের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করি,—জামা কাপড় ফেলে এসেছি আর একটা চাদর নিয়ে এসেছি। কিন্তু বিগত সন্ধ্যাটা যেন তখনও চলে যায়নি। পর পর গোটা দুই তিন বাস চলে গেল দক্ষিণে। বিকেলের আলো মিলিয়ে আকাশে মেঘ বেশ জাঁকিয়ে আসছে। শেষ চৈত্রের আর একটা ঝাপ্টা তৈরি হয়ে উঠছে। পাশ থেকে কে ডেকে উঠল, কি মশাই, যাবেন না ?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি গোলগাল মুখ নিয়ে ক্লাসের নূতন আসা একটি ছেলে। আলাপ পরিচয় হয়নি। কিন্তু দেখছি ছেলেটি ওসব ধার ধারে না। ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে উঁচু-নিচু এলোমেলো দাঁত-গুলি বার করে হেসে বল্ল, থাকেন নিশ্চয়ই দক্ষিণে। চলুন ওঠা যাক !

একটা বাস্-কে হাত দেখিয়ে বাঁধকে রোখকে নানাবিধ সংকেত ক'রে দাঁড় করিয়ে ছেলেটি উঠে পড়ল। দক্ষিণে আমি থাকি না, কিছু কাজ ছিল ওদিকে। সেসব কিছু না ব'লে আমিও উঠে গেলাম সঙ্গে। বাসে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হ'ল। স্কটিশের ছাত্র। কিন্তু অত কড়াকড়ি সইতে না পেরে চলে এসেছে আমাদের কলেজে। এসেছে বটে, খুসী হয়নি। কেন হয়নি তা কিছুই বোঝা গেল না। শুধু বার বার একই কথা ব'লে আমাকে বোঝাতে চাইল, কিংবা নিজেই খুব ভাল ক'রে বুঝে নিল—এ কলেজের সব কিছুই অতি থার্ড ক্লাস।

বল্লাম, তা বেশ তো, আরও তো কলেজ রয়েছে আর একবার বদলে ফেলুন।'

পকেট থেকে একটা সিগ্রেটের প্যাকেট বার ক'রে আমার দিকে একটা এগিয়ে দিয়ে বল্লো, চলে ত' নিযে নিন। নিলাম সিগারেটটা। কি যেন একটা মন্তব্য ক'রলে ছেলেটি বাড়ী নিয়ে, অর্থাৎ বাড়ীর অভিভাবক আর কলেজ বদ্লির কথা নিয়ে। বৃষ্টি তখন বেশ চেপে এসেছে।

ছেলেটির নাম বোধহয় রমেশ। এই রমেশ নামটা মনে আছে দেখে বেশ অবাক লাগছে। আমার কথকতার সঙ্গে তার যোগসূত্র খুব ঘনিষ্ঠ নয়। খুব একটা মেলামেশাও ঘটেনি। অথচ নামটা বেশ মনে আছে। মনে থাকার আপাততঃ একটা মাত্র কারণ খুঁজে পাচ্ছি। ঠিক কারণ নয়—একটা সামান্য ঘটনা।

পরের দিন ঘটল ঘটনাটা। সেদিনও বন্ধু ক্লাসে আসেনি। মনে মনে মতলব করছি সরকারের ক্লাসটা ফাঁকি দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসব। সরকারের ক্লাসের আগের ক্লাসটায় রমেশের পাশাপাশি ব'সে। রমেশ নিচু গলায় নানা কথা বকে যাচ্ছে। কিছু তার শুনছি

কিছু শুনছি না। রমেশ নালিশ জানাচ্ছে প্রফেসরদের নিয়ে। ক্লাসে সিগারেট খাওয়া যায় না তাই নিয়ে কি যেন বল্ল বার কয়েক। তারপর শুরু হ'ল ওর 'থার্ড ক্লাসে'র ধাক্কা, সবই থার্ড ক্লাস। ক্লাসরুম, ব্ল্যাকবোর্ড, ছাত্রের দল, প্রফেসর ভদ্রলোক, মাথার উপর ঘুরছে পাখাটা, কলেজের বাইরে মোড়ের মুখে রেস্তোরাঁ, আর অই ছেলেটা। আঙুল তুলে দেখাল ক্লাসের একটা দিকে। আমি একটু অন্যমনস্ক। ভাবছি বন্ধুর কথা, ভাবছি ওর কাছে গিয়ে কি দেখব, কি বলব, কতক্ষণ থাকব—এই সব। আঙুলটা লক্ষ্য ক'রে দেখলাম জনকয় ছাত্র আর কাগজওয়ালা। তাদের একজন একটু ঢুলছে। কাগজওয়ালার মনোযোগী লেন্স দুটো নিবদ্ধ বোর্ডের দিকে। ঠিক কোন ছেলেটা রমেশের লক্ষ্য বোঝা গেলনা। বুঝতে চেষ্টাও করলাম না।

বি এস্ সি পড়ে, থার্ড ইয়ারে। বয়স উনিশ কুড়ি—বৎসরের হিসেবে, কিন্তু বাল্যের স্বভাব স্থির হ'য়ে রাজত্ব করে যাচ্ছে—এমনি ছেলে রমেশ। শুধু রমেশ কেন হয়ত অনেকেই, কিন্তু রমেশ যে নিশ্চিতই তাই—তারই প্রমাণ হয়ে গেল ক্লাসটা শেষ হ'তেই। ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। ছাত্ররা বেরোচ্ছে দরজা দিয়ে। বাইরে বেশ ভিড়। দরজা দিয়ে বেরোতে হচ্ছে ধীরে ধীরে। আমি আর রমেশ এগোচ্ছি পাশাপাশি। আমাদের ঠিক সামনে যাচ্ছে কাগজওয়ালা। দরজা পেরোতে পেরোতে রমেশ ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে কাগজওয়ালাকে মারলে ধাক্কা পাশ থেকে-আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল একটি গাল—শালা! আচমকা ঘটলো ব্যাপারটা। আশে পাশের আমরা দু'চারজন একটু থমকে গিয়েছি। কাগজওয়ালার চশমাটা সরে গিয়েছিল সে অই ঠিক ক'রে নিচ্ছে। রমেশ ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। কাগজওয়ালা মুহূর্তের ভেতরে বারান্দায় বেরিয়ে রমেশের হাত চেপে ধরলো। এও আচমকা। ছোটখাট বেশ একটা ভিড় জমে গেল ওদের

তুজনকে ঘিরে। ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবার এবং শোনবার চেষ্টায় পায়ের ডগায় ভর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে দিলাম আমি। কাগজওয়ালা শক্ত মুঠোয় ধরেছে রমেশের একটা হাত, কথা বলছে মৃদুস্বরে। বলছে, আপনার মুখ থেকে গাল শুনে আমি প্রতিবাদ করিনা। শালা বলায় আমার ক্ষতি নেই। ক্ষতি হবে আপনার বোনের।

রমেশ এক ঝটকায় ব'লে উঠল, চোপরাও, কাগজ বেচে খাও তাই করোগে যাও, কলেজ তোমার···

ভিড় থেকে সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্ন, নানা মন্তব্য, ছিটকে পড়ল ওদের তু'য়ের উপর। কাগজওয়ালা বিনীতভাবে বল্লো, ব্যাপারটা আমার, আমাকে সামলাতে দিন!

রমেশ আবার কি বলতে বলতে, কাগজওয়ালা জোর গলায় ব'লে উঠল, আপনার রাগটা কি নিয়ে? কাগজের দাম দেননি, না কি, আত্মসম্মানে ঘা খেয়েছেন? রমেশ মুক্ত হাতটা দিয়ে পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বার ক'রে হাত বাড়িয়ে বল্লে, এই নাও তোমার দাম। ফের আবার যাবে কাগজ দিতে···

কাগজওয়ালা নোটটা নিলে না। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ রমেশের দিকে। তারপর হঠাৎ চারপাশে চোখ বুলিয়ে বল্লে, দামটা আপনার কাকার কাছে পাওনা। আচ্ছা, ছুটির পর দেখা হবে। বড্ড ভিড় জমে গিয়েছে।

ব'লে হাতটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। রমেশকে নিয়ে পড়ল জনকয়েক। জনকয়েক চল্লো ক্লাসের দিকে। ভিড়টা কমে গেল। ব্যাপারটায় কি যেন আছে। কাগজের দাম নিয়েই কি এতটা ঘটে? প্রশ্নটা মনে মনে আওড়াচ্ছি, দেখি প্রফেসর সরকার উঠে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে টিকিয়ে টিকিয়ে। ওকে জিজ্ঞেস করলেও জানা যায় কি

হয়েছে বঙ্কুর। জিজ্ঞেস করার কথাটাই মনে হ'ল জিজ্ঞেস করাটা হ'লনা। নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি বঙ্কুর কাছে। ভাবছি বঙ্কুর কথা নয়, রমেশ আর কাগজওয়ালার কথা। কাগজওয়ালা ওদের বাড়ীতে কাগজ দেয়। দাম বাকী পড়েছে তাই নিয়ে কি রমেশের উষ্মা? অথচ রমেশের দাতব্য দেখে মনে হয় দামটাই বড় নয়। কোন দিক দিয়ে কি যে ভাববো বুঝলামনা, শুধু অন্তরের কোথায় যেন ইঙ্গিত পেলাম কাগজওয়ালার এ একটা নূতন দিক। দাম বাকী পড়েছে, বাকীর জন্য তাগাদা দিয়েছে, শান্তভাবে রমেশের ছেলেমানুষিকে বাধা দিয়েছে,—সবই সত্যি, কিন্তু ব্যাপারটা চুকিয়ে না দিয়ে ছুটির পর দেখার কথাটা উঠলো কেন? ছুটির পর কাগজওয়ালা আর রমেশ কথা বলবে সেখানে থাকা সম্ভব নয়। অথচ একটা কৌতূহল জাগছে মনে ব্যাপারটা কি জানবার জন্য। ওদের ছেড়ে দিয়ে খানিকক্ষণ নিজেকে নিয়ে পড়া গেল। এই কৌতূহল—এও তো একটা দুর্বলতা। কিন্তু কেন?

বঙ্কুর ঘরের দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তে সাড়া দিলে বঙ্কু, কে? উত্তর দিলাম। দরজা খুলে দরজায় দাঁড়াল বঙ্কু। চোখ দুটো লাল। মুখটা আরও ফ্যাকাশে। আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে, পরশু থেকে জর। খুব বেশী নয় সামান্য। তোমার জামা কাপড় ধোপা বাড়ী চলে গিয়েছে। এক-নিশ্বাসে কথাগুলি বল্লে যেন কথাগুলি বলবার অপেক্ষাই সে করছিল। তারপর একটু থেমে আবার বল্লো, জামাকাপড় কলেজেই দিয়ে দেব। এ বাড়ীতে তোমার না আসাই ভাল, মানে আসতে না হ'লেই, অর্থাৎ আমি বলছিলাম···

একটু হাসি টেনে বল্লাম, ঠিকই বলেছ। নেহাৎ দায়ে পড়েই এসে গেলাম। আর এসে যখন পড়েইছি···

বঙ্কু কি একটু ভেবে মাথা নেড়ে বল্লো, আমারও ছাড়া দরকার এ বাড়ী। মাস তিনেক আছি বটে। কিন্তু···যাকগে, আচ্ছা কলেজেই যাচ্ছ বোধহয়—কি বই ওটা?

হাতের বইটা দেখে নিয়ে বল্লাম, ও একটা নাটক। ইব্‌সেনের গোস্টস্‌।

বঙ্কু একটু হাসলো, এই দুদিন কিছুই প্রায় পড়া হয়নি। ভাবছিলাম তোমার মত নাটক নভেল পড়ার অভ্যেস থাকলে···

হাত বাড়িয়ে দিলাম বইটা। বঙ্কু মাথা নেড়ে বল্লো, উঁহু, এখন আর দরকার নেই। ফ্যারাডের বই পড়ছি একটা, সেও কম নাটকীয় নয়।

জুৎসই কিছু একটা বলে চলে যাব ভাবছি, সুযোগ পেয়ে গেলাম। বল্লাম, সে-ত' বস্তু নাট্য। যা ঘটে গিয়েছে তারই চমক লাগা ঝলসানি। আর এ হচ্ছে জীবন নাট্য, যা ঘটছে এবং ঘটতে পারে, শুধু চমক লাগায়না একেবারে বাক্যহারা ক'রে ফেলে। আচ্ছা চলি।

বারান্দার পাশ দিয়ে ছোট সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম চত্বরে। তারপরে বাইরের রাস্তায়। গেটে দাঁড়িয়ে একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম বঙ্কু দাঁড়িয়ে আছে রেলিং ধরে। বাতাসে উস্‌কো চুলগুলি উড়ছে। মুখের একদিকে পড়েছে আলো। চোখে চোখ পড়তে বঙ্কু একটু হাসল।

ফিরে এলাম কলেজে। গোটা দুই ক্লাস তখনও করা চলে। আর তাছাড়া আছে ছুটি শেষের ব্যাপারটা। সে ব্যাপারে কোন দিক থেকেই আমার সংস্পর্শ কিংবা সংস্পর্শের সম্ভাবনা নেই, তবু কৌতূহলটাই আকর্ষণ হ'য়ে রইল মনে। ক্লাস শেষে বেরিয়ে দেখলাম কাগজওয়ালা তার আধা ভাঙা সাইকেলটা নিয়ে বেরোচ্ছে কলেজ থেকে। গেটের বাইরে রমেশ অপেক্ষমান। সেকেণ্ড ইয়ার

আর ফোর্থ ইয়ার ক্লাস তখন নেই, তাই ছাত্র সংখ্যা কিছু কম। চত্বরে কিছু ছেলেরা রয়েছে ছিটিয়ে। গেটের বাইরে একদল ছাত্র। কাগজওয়ালা গলিতে বেরোতে বেরোতে আমি এসে গিয়েছি কাছাকাছি। কাগজওয়ালা রমেশকে একবার দেখলে তারপর সাইকেলটা দেয়ালের গায় রাখবার জন্য এদিক ওদিক তাকালে। সুবিধা হ'লনা। ছাত্রের দলটা দাঁড়িয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। এদিক ওদিক তাকাতে কাগজওয়ালার চোখ পড়ল আমার দিকে। একটু হেসে বল্লো, একটু ধরোত ভাই সাইকেলটা।

আমাকে তুমি সম্বোধন কাগজওয়ালার সেই প্রথম। কিন্তু সে কথা ভেবে দেখবার সময় তখন নেই। কাগজওয়ালা এগিয়ে যাচ্ছে রমেশের দিকে। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগ্রেট নিয়ে রমেশও এগিয়ে এল এক পা। আমার বেশ মনে আছে কাগজওয়ালার মুখে তখনও হাসি। একমুহূর্ত্ত সময় গেল। তারপরেই কাগজওয়ালা 'ত্থাথ্ না ত্থাথ্' টেনে মারলে ঘুষি। আর সঙ্গে সঙ্গে রমেশ টাল খেয়ে পেছনে গেটের গায়ে একটা ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়লো রাস্তায়। পড়লো মানে একেবারে শুয়ে পড়লো। একটু এপাশ ওপাশ একটু হাত পা ছুঁড়েছিল বোধহয়। কিন্তু রাস্তায় পড়ে থাকার ছবিটাই আমার পরিষ্কার মনে আছে। আর আঙুলের ফাঁকের সিগারেট্টা ছিটকে পড়েছে দূরে। সেই থেকে উঠছে সামান্য একটু ধোঁয়ার রেশ।

ঘুষির সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটে গেলো তার বিশদ বর্ণণা দেবার প্রয়োজন হয় না। এই যা হয়ে থাকে। ছাত্রেরা হৈ হৈ ক'রে এসে জুটল। একটু দূরে রাস্তা থেকে জনকয়েক এল ছুটে। রেস্তোরাঁ থেকে আর কলেজ থেকে বেরিয়ে এল জনকয়েক ভিড় বাড়াতে। জন দুই প্রফেসরও বাদ গেলনা, অর্থাৎ দাঁড়িয়ে

পড়লেন। যা হ'য়ে থাকে তার থেকে বাদ গেল শুধু এই যে কাগজওয়ালা দৌড়ে পালাল না। রমেশ মাটিতে পড়তে পড়তে প্রথমটা তাকে ধরবার চেষ্টা করলো, তারপর চুপচাপ দেহটার পাশে হাটু পেতে নাকের কাছে হাত নিয়ে আর চোখের পাতা উল্টে দেখে বেরিয়ে এল ভিড় থেকে। চোখের নিমেষে ডেকে নিয়ে এল একটা রিক্সা। তারপর অনুরোধ উপরোধ ক'রে ভিড়ের ভেতরে একটা রাস্তা ক'রে আর জন দুই ছাত্রের সাহায্যে রমেশকে তুলে দিলে রিকসাটায় আধশোয়া অবস্থায়। নিজেও বসলো তার পাশে। ওদিকে কলেজের দরোয়ানটা জল নিয়ে এসেছে বালতিতে। একজন ডিমনেস্ট্রেটর নিয়ে এসেছেন স্মেলিং সণ্ট আর ভিড় থেকে উঠছে প্রচুর মন্তব্য। সব মিলিয়ে একটা অতিব্যস্ত কোলাহল। এর ভেতর একমাত্র আমি সাইকেলের স্ট্যাণ্ড হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। এগিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, পিছিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয় না। রিক্সা থেকে কাগজওয়ালা ডেকে বল্ল, মেডিক্যাল কলেজ যাচ্ছি। সাইকেলটা নিয়ে আপনি আসুন।

উত্তেজনার মুহূর্তে হ য়েছিলাম তুমি। এখন হলাম আপনি। মুহূর্তেই কথাটা ভেবে নিয়ে রিক্সাওয়ালা রিক্সা টানতে টানতে হেঁকে জিজ্ঞেস করলাম, মেডিক্যাল কলেজে কোথায়?

ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিলে কাগজওয়ালা, ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেণ্ট।

রিক্সাটা চলে গেল। আমিও চলতে শুরু করেছি। এইবার ভিড়টা ঘিরে ফেল্লো আমাকে। কে, কেন, কোথায়, কি ব্যাপার? বল্লাম, থার্ড ইয়ার বি, এস্, সি এ ছাড়া আর কিছুই জানা নেই।

ভিড় থেকে কোনো রকমে নানা ছিটকান মন্তব্য কুড়োতে কুড়োতে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর সেই সাইকেল ঠেলে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু হ'ল মেডিক্যাল কলেজের দিকে। সে যাত্রা নাতিদীর্ঘ তাই রক্ষা। চৈত্র শেষের শেষ বেলার সে সময়টায় কি রকম একটা গুমোট ভাব।

আকাশে মেঘ নেই। জল দেয়া ভেজা রাস্তায় স্যাণ্ডেল পায় যাত্রাটা খুব সহজ নয়। তায় আছে সঙ্গীটি। ট্রাম বাস বাঁচিয়ে লোকের ধাক্কা সামলে প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ পৌছন গেল। রাস্তায় তখন গ্যাসের আলো জ্বলছে। আর সামনের থমথমে বাড়ীটার এখানে ওখানে জ্বলে উঠেছে বিদ্যুতের বাতি। ভেতরে ঢুকলাম। খোঁজ খবর নিয়ে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড-টাও পাওয়া গেল। মস্ত বড় বাড়ীটার সিঁড়ির তলা দিয়ে চোর কুঠরির মত ঢাকা দেওয়া কোঠাগুলি যে অতি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হাঁসপাতালের অংশ জানা না থাকলে কিংবা বেশ ক'রে জেনে না নিলে খুঁজে বার করা অসম্ভব। কিন্তু খুঁজে বার ক'রেও সুবিধে হ'ল না। আমি যদি বা ভেতরে যেতে পারি সঙ্গীর কি ব্যবস্থা করি ভেবে পাই না। সন্ধ্যার অন্ধকারে বিদঘুটে সব গন্ধের আবহাওয়ায় রইলাম দাঁড়িয়ে। একটু ভেতরের টিম্‌টিমে একটা আলোর রেশ প্রায় পৌঁচেছে আমার কাছাকাছি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি একটিমাত্র ভরসায়। কাগজ-ওয়ালা বেরিয়ে এলে হয়তো তার চোখে পড়বো। লোকজন যাচ্ছে আসছে দুটি একটি। একটা মাতালকে নিয়ে ঢুকে গেল একটা পুলিশ। একজন নার্স বেরিয়ে এল উঁচু খুরওয়ালা জুতোর খুট খুট শব্দ তুলে। দূরে কোথায় কে যেন কাতরভাবে চেঁচাচ্ছে। শুনছি এই সব। আর ভাবছি দিব্যি গোলগাল মুখ। ফর্সা রং। এলোমেলো উঁচুনিচু দাঁত আর উল্টে দেয়া চুল। আর নধর কান্তি। ঘুষি খাওয়া বা দেওয়া কোন দলেই সে নেই। কাগজওয়ালাকে বোধ হয় বা গায়ের ঝাল মেটাতে, কিংবা আশৈশব ভারিক্কি চালটা বজায় রাখতে গিয়ে বেচারা শুয়ে আছে এরই ভেতরে কোথাও। রমেশের কথা ভাবছি আর ভাবছি কাগজ-ওয়ালার কথা। এতদিন জানতাম সেও নেই ঘুষি দেওয়া বা খাওয়ার দলে। একেবারেই নেই তা মনে হয়নি কোনদিন, তবে রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক যে ঘুষি মারতে পারে সেদিক থেকে কথাটা মনে আসেনি।

আর তাছাড়া ঘুষির বহরটাও মন্দ নয়। রমেশ শীর্ণদেহ মোটেই নয়, যদিচ—সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে একটা হাত রেখে কে যেন দাঁড়াল—মুখ তুলে দেখি কাগজওয়ালা।

বল্লাম—কেমন আছে ?

চাপা গলায় বল্লো—ভালই। কতক্ষণ এসেছেন ?

সত্যি কথাটা চাপা দিযে বল্লাম, এই একটু আগে। কি হয়েছে ?

কাগজওয়ালা সাইকেলটা আমার থেকে নিয়ে চল্লো দেয়ালের ধারে। সাইকেলের গা থেকে শিকলটা খুলতে খুলতে বল্লো, বলছি। সাইকেলে তালা দিয়ে দুজনে দাঁড়ালাম এসে ভেতরে। জায়গাটায় অন্ধকার চেপে আছে। দূরের সেই বাতিটার আলো পড়েছে মাঝামাঝি একটা যায়গায় একটা ফালির মত। ওদিকে দরজার গায় একটা পর্দা। কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। একটু দূরে বাঁদিকে ওযার্ডে যাবার মুখটা। আমি বল্লাম, দেখে আসি একবার।

আমার হাতটা ধরে কাগজওযালা চাপা গলায় বল্লো, 'একটু পরে।

আবার চাপা গলায় বল্লাম, সিরিযস নয় তো ?

এদিক ওদিক দেখে নিয়ে কাগজওয়ালা হাতটা উল্টে বল্লো, সিরিযস না হ'লেও সিরিয়স।

তারপর একটু থেমে বল্লে, ওকে কি যেন দিচ্ছে এখন। একটু পরে গিয়ে দেখে আসবেন। জ্ঞান হয়নি এখনও। আমি যাচ্ছি ওর বাড়ীতে খবর দিয়ে আসতে। রাতটা আপনাকে থাকতে হচ্ছে। বলেন ত আপনার মেসে একটা খবর দিয়ে আসি।

বল্লাম, আচ্ছা।

কথাটা গলা দিযে যেন ঠিক বেরুল না। চাপা অন্ধকার, একটু আধটু আলো এদিকে সেদিকে। কোথায় যেন একটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে

সাতটা বেজে গেল। খুট্ খুট্ ক'রে একটি নার্স বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে একবার নজর বুলিয়ে চলে গেল ভেতরে। কাগজওয়ালা নিঃশব্দে চলে গেল।

দেয়াল ঘেঁষে একটা বেঞ্চ। বেঞ্চটায় বসে একটা সিগারেট ধরালাম। দেশলাইয়ের কাঠিটায় খস্ ক'রে একটু শব্দ উঠে জ্বলে উঠল। সিগারেটটা ধরাতেও যেন ভয় লাগে। কি জানি এখানে বুঝি সিগারেট খাওয়ার নিয়ম নেই। খুব মন দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটায় টোকা দিয়ে ছাই ঝেড়ে ফেলে আবার টানছি—বেশ মনে আছে ধীরে ধীরে একটা কথা মনে উঠল, এটা ক'লকাতা, ক'লকাতার মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সি ওয়ার্ড। এখান থেকে একটু বাইরে গেলে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, লরি আর জনতা, আর আছে আলো। অথচ এখানে এই বড় বাড়ীটার তলায় গোপনে অন্ধকারে আমি সিগারেট টানছি। আমার পেছনে লোহার খাটিয়ায় সারি সারি রোগীরা শুয়ে। ইথারের গন্ধ, আর রোগীদের কাতরোক্তি, নার্সদের উষ্মা, আবার ওরই ভেতরে চলছে মন জানাজানি বা অই রকম কিছু। এই একটু আগে একটা নার্স আর একটা যুবক এসে দাঁড়াল পর্দাটার সামনে, কি একটু কথা কইল, একটা চুমু খেল, একটু বুঝিবা হেসে উঠল, তারপর চলে গেল। এ যেন ক'লকাতা নয়। অন্য কোথাও। এরা যেন এ পৃথিবীর লোক নয়। অন্য কেউ।

আজ লিখতে বসে অবাক লাগছে। সে সন্ধ্যার এবং তারপর সারাটা রাত্রির খুঁটিনাটি প্রতিটি কথা আর ছবি আমার মনে যেন গেঁথে বসে আছে। বাইরে ঘটেছিল যা কিছু তা মনে আছে, আর ভেতরে ঘটেছিল যা কিছু তাও মনে আছে। অবাক লাগছে যা যা দেখেছিলাম আর শুনেছিলাম তা মনে থাকার জন্যে নয় মনের ভেতরে পর্দায় পর্দায় রিন্ রিন্ ক'রে যা বেজে গিয়েছিল সে রাত্রে তা ঠিক ঠিক মনে থাকার

জন্যে। কিন্তু তা এ গল্পের ভেতরে আসে না। শুধু এই বল্লেই যথেষ্ট এই পরিবেশে রুগ্ন আর্তদের কাতরোক্তি শুনতে শুনতে পীড়িত বন্ধুর অচেতন মুখচ্ছবি দেখতে দেখতে আমার মনে যেন সুর সঙ্গীতের ঢেউ খেলে গেল। অবাক হ'য়ে সেদিন ভেবেছিলাম আজও ভাবি সঙ্গীত চিত্র নৃত্য সাহিত্য এরা জীবনের কোন্ পরিপূরক ?

রাত্রি গভীর। রমেশ তখনও অচেতন অবস্থায় পড়ে। বাইরের বেঞ্চের উপরে আমি আর কাগজওয়ালা বসে আছি। (কাগজওয়ালার নাম এখন মনে পড়ছে, কিন্তু নানা কারণে নামটা দিলাম না। কাগজওয়ালা হিসেবেই সে যদি বেঁচে থাকে অন্ততঃ এ কাহিনীতে তাহলেই যেন সাম্য থাকে। অবিশ্যি এতে ব্যক্তি বিশেষের আপত্তি উঠবার কথা। সে ব্যক্তি বিশেষের সম্যক পরিচয় দেওয়া এখনই সম্ভব নয়, কিন্তু যতটা জানি তাতে বুঝি নামের ব্যবহার না ক'রলে সে ব্যক্তি-মন বেঁকে বসবে। তবু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কাগজওয়ালার কাগজওয়ালা হয়ে থাকাটাই ভাল মনে হচ্ছে।)

লিখলাম বৃহত্তর স্বার্থের কথা। বৃহত্তর স্বার্থ মানে সমাজ জীবনে চলাচলের সুবিধা। সমাজ হয়তো প্রত্যক্ষভাবে কাগজওয়ালার নাম জানলেই কিছু একটা অসুবিধা ঘটিয়ে বসবে না, কিন্তু অন্তরালে তার কাজ চলবেই। অন্ততঃ আমার মত এই। এ মতে কাগজওয়ালা কি প্রশ্ন করবে জানিনা। কিন্তু এটা বেশ জানি ব্যক্তি বিশেষ এ বিষয়ের অর্থাৎ অন্তরালে কাজের উল্লেখে হেসে কুটিপাটি হবে। হয়তো বা এক ছুটে উঠে গিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে এসে বসবে, তারপর গম্ভীর হ'য়ে প্রশ্ন করবে, অন্তরালের কাজ কতটা এগোল ? হয়তো বলতে বলতে আবার হাসবে। তাকে আমি দেখেছি মাত্র বার কয়। আর সেই রাত্রে প্রথম তার কথা শুনলাম। এই বার কয়েক দেখা আর বার কয়েক শোনা থেকে মালতীর নাম দিতে ইচ্ছে হয় 'মেঘ ও রৌদ্র'। গিরিবালা নাম্নী

সেই বালিকা কি একাই মেঘ ও রৌদ্র, নাকি হ্রস্ব-দৃষ্টি সম্পন্ন জাম আঁটির আঘাত প্রাপ্ত যুবকটি রৌদ্র আর গিরিবালা মেঘ তা কোনদিন ভেবে দেখিনি ; কিন্তু মালতী নিঃসন্দেহে 'মেঘ ও রৌদ্র'। বেশী বার দেখিনি সত্যি কিন্তু যতটা দেখেছি তা থেকেই বুঝেছি হাসি কান্নায় পরিপূর্ণ মেয়েটি একাই মেঘ হ'য়ে বর্ষায় আর রৌদ্রের উজ্জ্বলতায় ফসলের ফলন করে। হয়তো সে শুধু মেঘও নয় আর রৌদ্রও নয়, আরও কিছু। আরও কিছুটা কি ? কিন্তু বিশেষণ আর নয়। সরল পরিচয় দিলে হয়তো 'আরও কিছুটা' বলা সহজ হয়।

মালতী রমেশের বোন। রমেশের বাবা আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। কিন্তু সংসারটা চালিয়ে নেন তার ছোট ভাই। রমেশের কাকা ডাক্তার। তাঁর পসার ভাল। রমেশের পড়াশুনার খরচ দেন তার কাকা আর কাকীমা দেন তার বাবুয়ানার খরচ। ওরা দু'ভাই দু'বোন। রমেশ বড়। তারপর এক ভাই। তারপর দু'বোন। মালতী আর প্রদীপ। নিঃসন্তান কাকা কাকীমা এদেরকে মানুষ করেছেন, কিন্তু, কাগজওয়ালার ভাষায়, পিতামাতা তাঁদের দায়িত্ব তথা অধিকার পরিত্যাগ করেননি। এতকাল সমস্যাটা চাপাই ছিল। সংসারের আরও পাঁচটা হাসি কাসি কথাবার্তার ফাঁকে আরও নানা সমস্যার চাপে এটা কখনো প্রকাশ্যে রূপ পায়নি। কাকার আর্থিক স্বচ্ছলতা, পিতামাতার হৃদয়াবেগ, পুত্রকন্যাদের স্ব স্ব মতিগতি-এ তিনের অসামঞ্জস্যের ভারসাম্য সম্ভবতঃ রক্ষা পেয়েছে পিতা পিতৃব্যের সৌহার্দ্যের ছটায়। ওরা দুটি ভাই। অগ্রজ ও অনুজ, ওদের ভ্রাতৃপ্রেমের ঔজ্জ্বল্যে—অন্ততঃ ওরা ভেবেছিলেন—সংসারের সব কিছুই পরিষ্কার হ'য়ে উঠবে। কিন্তু তা হয়নি। মালতীর বয়স হয়েছে। লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করবার মতলব ছিল কাকার। পিতামাতার অন্য কিছু ছিল। বয়স্থা কন্যার বাইরের কলেজে ছাত্রী জীবন তারা

মেনে নিতে পারেননি আর পারেননি তার দীর্ঘ অনূঢ়া জীবন।

এখান থেকে কাগজওয়ালার ভাষায় বলা যাক ইতিহাসটা: 'তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। মালতীও পড়তো সেই সঙ্গে। সায়ান্সের ক্লাসে মেয়েদের সংখ্যা কম। কিন্তু চোখ তুলে কিংবা খেয়াল ক'রে তাকে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। চোখ তুলে না দেখলেও চোখে সে পড়েছে। তা সে হচ্ছে জলে ছায়া পড়ার মত। তাতে জলের কৃতিত্ব নেই ছায়ারও কিছু বাহাদুরি আছে ব'লে মনে হয় না। আর পাঁচটা মেয়ের মত সে পড়ে। ক্লাসে আসে। সামনের দিকের বেঞ্চে বসে। ছেলেদের হাসি ঠাট্টা শুনে হয়তো বা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে কিংবা রোষের দৃষ্টি হানে। আবার প্রফেসরদের মনোযোগী দৃষ্টির সামনে হয়তো বা হতবাক হ'য়ে থাকে। আমি এই মত। এই যেমন এখন, তখনও তাই। ক্লাসে কখনো যাই, কখনোবা যাই না। বই নিয়ে যাই আবার কাগজ নিয়েও যাই। আমি কাগজওয়ালা। তাই বলে আলাদা জীব নই। অথচ আলাদা জীব নিশ্চয়ই। কিন্তু তার কারণ আমি আলাদা ব'লেই আলাদা। এটা ওরা—মানে ক্লাসের আর পাঁচটা ছেলে জানতো না। ওরা জানতো কাগজওয়ালা বলেই আমি আলাদা বা বলতে পারি সেই জন্যেই আলাদা ক'রে রাখতো। অবিশ্যি ওদের জানায় আর আমার জানায় তফাৎ ছিল। ওরা ঠারে ঠোরে ক্রমে ক্রমে জেনেছিল আমি কাগজ বেচে খাই। জেনেছিল কলেজের মাইনে না দিয়েই ক্লাস করি আর জেনেছিল আমার জামাটায় ফুটো আছে কিন্তু মনে আমার ফুটো নেই। হয়তো জেনেছিল হয়তো জানেনি। অথচ আমি জানতাম। যাকগে কি আমি জানতাম কি জানতাম না তা ব'লে কি হবে। সত্যি বলেই জেনেছিলাম অনেক কিছু। পরে জেনেছি, এই যেমন আজকে আপনাকে বলতে বলতে জানছি, আপনাকে, শুধু আপনাকে কেন, কাউকেই যে বলবো এ আমি জানতাম না। আর রমেশকে যে

ঘুষিটা মারলাম, ঘুষি আমি মেরেছি কিন্তু তার পাত্র আলাদা। রমেশের মত ছেলেকে যে ঘুষি মারতে পারি তাও কি জানতাম? রমেশ মালতীর ভাই।'

একটু ঠাট্টা করবার ইচ্ছে হ'ল। বল্লাম, হয়তো ভাই বলেই রমেশকে যে মারতে পারেন তা মনে হয়নি···

কাগজওয়ালা উত্তর দিলে, উঁহু, হয়তো ভাই বলেই মারতে পেরেছি।

তারপর একটু চুপ থেকে বল্লো, কথাটা বলেছেন ভাল। অন্ধকারে আপনার মুখটা দেখতে পাচ্ছিনা ঠিক। খুব সম্ভব ঠাট্টা করছিলেন ওকথা ব'লে, কিন্তু কথাটা বলেছেন ভাল। মালতীর ভাই বলেই মেরে বসেছি। মারামারি করেছি অনেক। সে মেড়োদের সঙ্গে কাগজ কিনতে গিয়ে। অবিশ্যি তার আগে মার খেয়েছিও অনেক। তারপর মার দেয়া আর খাওয়ার দিনগুলি সরে গিয়েছে। মেড়োরা আমাকে চিনে নিয়েছে। সগোত্র ব'লে নয় সমধর্মী ব'লে মেনে নিয়েছে। আমিও ওদের মেনে নিয়েছি। আজ যদি একটি বাঙালী ছেলে কাগজ কিনতে যায় কাগজের অপিসে আর মেড়োদের মার খায়, কি আমি ক'রবো জানি না। মারের হাত থেকে বাঁচাব নিশ্চয়ই। সে বাঙালী ব'লে নয়, সে মার খাচ্ছে একটা ছেলে ব'লেই। ফার্স্ট ইয়ারের কথা বলছিলাম। এসে গেল মার খাওয়ার কথা। বিদ্যায়তন, শিক্ষামন্দির। শিক্ষা সভ্যতা ভব্যতা। ফার্স্ট ইয়ার ত নয় সে হচ্ছে সভ্য জগতের ওয়েটিং রুম। ওদিকে বন জঙ্গল আছে তার পাশে পাশে। দেশের বিচারে আছে, কালের বিচারে আছে। ক্লাসরুম, কলেজ বিল্ডিং, ইউনিভার্সিটি— যেখানেই যান, যাকগে। কথাটা খুলেই বলি। কলেজ ছুটি হয়। মেয়েরা দল বেঁধে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি আমার ভাঙা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কোন্‌দিন ঠেলে নিয়ে বেরুই

কোনদিন বা সাইকেল চেপে বেরুই। বোধহয় পুজোর ছুটির পরে ঘটলো ঘটনাটা। সাইকেল চেপে বেরুচ্ছি। একদল মেয়ে দাঁড়িয়ে ফুটপাথ আর রাস্তায়। আর একদল ছেলে দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের উল্টোদিকে কলেজের গেট পর্য্যন্ত। সাইকেলটা নিয়ে বেরুতে বেরুতে কে যেন মারলে ধাক্কা। টাল সামলাতে পারলাম না। মেয়েদের গা বাঁচিয়ে গড়িয়ে পড়লুম গিয়ে রাস্তায়। কিন্তু ঠিক গা বাঁচান গেল না। একটি মেয়ের গা ঘেঁষে গেল সাইকেলের সামনের চাকাটা। ছেলের দল হৈ হৈ ক'রে এগিয়ে এল বীরদর্পে। এগিয়ে এলাম আমিও মেয়েটির কাছে। হৈ হৈ ক'রে গালাগাল আর প্রশ্ন বর্ষিত হচ্ছে তারই ভেতরে মেয়েটিকে বল্লাম, 'মাফ করবেন। দৈবাৎ ঘটে গিয়েছে। দৈবের উপর হাত নেই আমার।' মেয়েটি মেয়েদের ভিড়ের ভেতরে মিলিয়ে যেতে যেতে মাথা নেড়ে গেল। ছাত্রের দল ছাড়লো না। ওরা আমাকে আর আমার সাইকেলকে নিয়ে শুরু করলো, ইতর ভাষায় যাকে বলে ইতরামি। ফলে হাতের কাছের ছেলেটা ধাক্কা খেয়ে পড়লো গড়িয়ে। তারপর পেছনের ছেলেটার হাত থেকে জামার কলারটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে মারামারি শুরু হ'য়ে গেল। জড় পদার্থটাকে বাঁচাতে আর নিজেকে সমর্থ রাখতে মার খাওয়াটা দেওয়ার চেয়ে হয়ে গেল বেশী। দু'চার ফোঁটা রক্তপাতও জুটলো। কে দু'একজন অধ্যাপক এসে যাহোক ক'রে সামলে দিলেন ব্যাপারটা। সাইকেলের সামনের চাকাটা গিয়েছে একটু দুমড়ে। ভাঙা সাইকেল তায় দুমড়োন চাকা। নিজের একমাত্র জামাটা বহুক্ষত। কোন রকমে এগোচ্ছি সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে। জামার হাতায় পড়ছে রক্ত। রাস্তার লোকেরা নাককাটা ছেলেটাকে দেখে অবাক হচ্ছে। কেউ বা দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করছে। একটা গলির আশ্রয় নিলাম। একটা বাড়ীর গায়ে সাইকেলটা কাত্ করে রেখে জামা দিয়ে নাক আর

ঠোঁটের রক্তটা পুছে নিচ্ছি পেছন থেকে মেয়েলি গলায় ধ্বনিত হ'ল, 'আমাকে মাফ করুন।' পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, সেই মেয়ে। উঁহু সেই মেয়ের কথা যতটা জেনে বুঝেছি আর শুনে বোঝার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি তা আপনাকে বলছি না। বলছি না কারণ আমি নিজেও সে সব বলবার মত ক'রে জানিনি। অপরাহ্নের আলোয় দেখা সে কন্যার কাহিনী দিব্যি একখানা উপন্যাস তৈরি হ'তে পারে। আমিই পারি তৈরি করতে। মেঘলা দিনে মাথায় ঘোমটা নেই কালো ব'লেই কৃষ্ণকলি আরও কত কিছুই বলা যায়। তা মোটেই নয়। তাই বলে ভাববেন না আমি চাঁদের পানে তাকিয়ে মুখ টুখ দেখিনা। দূর, তা কেন। চাঁদের পানে মুখের আশায় চোখ তুলে তাকানোর কথাটাই নেই আমার —কি ব'লে গিয়ে—আমার অভিধানে। সে মেয়ে কেন এসেছিল, কি ভেবেছিল, চলে গিয়েই বা তার মন কোন নেশায় কতটা মেতেছিল তা জানিওনা জানবার আগ্রহও নেই। সাইকেলের accident থেকে আজ পর্যন্ত মানে আজকের এই অচেতন রমেশ পর্যন্ত সব কিছুই একটানা accidentএর সারি। পাড়ায় এলেন একজন নূতন ডাক্তার। রাস্তায় গাড়ীর ধাক্কা খাওয়া একটা ছেলেকে নিয়ে ঢুকলাম তারই চেম্বারে। সেই থেকে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়ের পঞ্চম পাদে, অর্থাৎ, আদি নিবাস, পিতৃ পরিচয়, বর্ত্তমান আবাস, কি পড়া হয় এবং অবশেষে কি করা হয়—এরই ফলে তিনি জানলেন বাড়ীতে বাড়ীতে কাগজ বিলি ক'রে বেড়াই। কাগজ বিলি করি তবুও পড়া-শুনো করি অতএব আমি একটি আদর্শ যুবক এবং আমাকে সাহায্য করা কর্তব্য। সেই তাগিদে নূতন জনকয় কাগজ পড়ুয়া আমার জালে জড়িয়ে গেল। তাদেরই একজন রমেশের কাকা। রমেশকে তখন জানি না, রমেশের কাকাকে সামান্যই জানি। আর সেই মেয়ের কথাতো ওঠেই না। সে পড়ে কলেজের ফাষ্ট ইয়ারে। কলেজের

ছাত্রী সে। কোথায় কোন কাগপাড়ায়, না বগপাড়ায় থাকে কে জানে? একটা উপমা দি। গভীর রাত্রে চাঁদের আলো ঝরছে। আলোর ঝরণা বেয়ে নেমে আসে আকাশ-পরীর দল। রাখাল ছেলে তার পরশ পায় পরিচয়ও হয়। তা সে রাতের পরিচয়। সে পরিচয় পৃথিবীর আইন মানে না। ভোর হ'তে পরীর দল চলে যায়, মিলিয়ে যায়। ভোরের আলোয় রাখাল শুধু জানে যারা এসেছিল তারা চলে গিয়েছে আবার হয়তো আসবে। আর কিছু সে জানে না জানবার চেষ্টাও করেনা। অর্থাৎ আকাশ-পরীর খোঁজ খবর মাটির পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। রাখাল ছেলে পাওয়ার চেষ্টাও করেনা। রাজপুত্র হ'লে অবিশ্যি আলাদা কথা। কলেজের মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের সম্পর্কটা অনেকটা অই আকাশ-পরীর মত। তবু একদিন অঘটন ঘটল। শীতের ভোরে, বোধ হয় ডিসেম্বর মাসই হবে সেটা, জোর কদমে সাইকেল চালিয়ে শরীরটাকে গরম ক'রে রাখছি। প্রায় শ'খানেক কাগজ বিলি সম্পূর্ণ আর সামান্যই বাকী। মাথা বেড়ে একটা কাপড় জড়ান আমার। কান ঢেকে বেশ মগুগুল হ'য়ে সাইকেল চালাচ্ছি। রমেশদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম। ওদের বাড়ীর জানালা থাকে বন্ধ। খড়খড়ি ফাঁক ক'রে কাগজটা ছুঁড়ে দেই ভেতরে। তাই করছি, কিন্তু সেদিন দেখি খড়খড়িটা উঠবে না। একটু টানা হেঁচড়া করছি, বারকয়েক সাড়াও দিলাম। কাগজটা হাতে নিয়ে ভাবছি কি করি এখন? জানালাটা খুলে গেল। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিতে দেখলাম এ সেই মেয়ে যার নাম মালতী। সেই একটা দিন। স্বীকার ক'রবো রক্তের ঋণ সেদিন অস্বীকার করতে পারিনি। কাগজওয়ালা আমি, হ'কারদের সঙ্গে আমার জীবনের ভাল ওঠা নামা করে। একদা আমার বাবা ছিলেন ভদ্রলোক, তারই ছেলে আমি। দুর্ভাগ্য আমার

কাগজ বেঁচে খাই। কিন্তু তদ্দিনে মোড় ঘুরে গিয়েছে। আমি সত্যি চ'কার। দৈবাৎ আমার বাবা ছিলেন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। দৈবাৎ আমি কলেজে পড়ি। কিন্তু সেদিন সেই শীতের সকালে মালতী নামে একটি মেয়ে নিঃশব্দে জানালা খুলে কাগজখানা নিতে নিতে বুঝলাম, আছে সবই তবে আছে চাপা। যারা আছে অতি গোপনে আর যাদের প্রকাশ অতি নগণ্য ইতিউতির ভেতর দিয়ে সেদিন তারা বেশ নাড়া দিয়ে গেল। বোধ-হয়-বা এও ভেবেছিলাম, ভাগ্যিস্ আমি কলেজের ছাত্র। সেই থেকে একটু আধটু ব্যবহারিক পরিবর্তনও দেখা দিল। মালতীর সঙ্গে একটু আধটু কেমন আছেন, কখন এলেন, শুরু হ'য়ে গেল। খুব বেশী নয়। বেশী হওয়ার সুবিধে ছিলনা। ভাঙা সাইকেল, মায়ের হাতের সেলাই করা জামা, আর গৃহের দৈন্য নিজের অজ্ঞাতেই রাশ টেনে রাখে।'

এই পর্য্যন্ত বলতে বলতে কাগজওয়ালা চুপ হ'য়ে গেল। শুরু করতে বলিনি, থেমে যাওয়ার পরও চুপ ক'রেই রইলাম। কিন্তু সে শুধু বাইরে। মেডিক্যাল কলেজের অন্ধকার বারান্দায় ব'সে ব সে আচমকা এমন কাহিনী শোনবার জন্য কোন প্রস্তুতি ছিল না। ভেতরে রমেশ তখনও অচৈতন্য। বাইরে রাত্রি গভীর। কাগজওয়ালা উঠে গেল ভেতরে রমেশের কাছে। আমি সন্তর্পণে একটা সিগারেট ধরালাম। এতো কথা বল্লো কাগজওয়ালা, কিন্তু আজ সকালে রমেশের টাকা ছুঁড়ে দেয়ার ব্যাপারটা যে কি তা বলেনি। ফিরে আসতে এই প্রশ্নটাই করলাম। আর এও মনে আছে প্রশ্নটা করতে করতে কি যেন খুঁজে দেখছিলাম। কি খুঁজে দেখেছিলাম সেদিন বুঝিনি, আজ অবিশ্যি খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। কাগজওয়ালা একটা সিগারেট চেয়ে নিলে। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে চোখ রেখে বল্লে,—আপনি হয়তো ভাবছেন হঠাৎ এত কথা কেন? তা বটে, মানুষের

কাহিনী শুনতে যাওয়ায় বিপদ আছে। উঁহু, আমাকে বলতে দিন,— না রাগ করিনি আমি। আর সত্যি বলতে কি আপনাকেই যে বলছি তা নয়। রাত্রির অন্ধকারে খানিকটা নিজে নিজেই শুনে নিলাম। দিনের আলো আসুক, মেসে ফিরে যান, তখন মনে হবে কাহিনীটা রাত্রির ব'লেই চক্‌চকে। দিনের আলোয় শতকরা নব্বইটা প্রেমের উপাখ্যানের সঙ্গে এ ভিন্ন নয় কোথাও। নাটকে পাবেন, উপন্যাসে পাবেন, কলেজীয় যুবকদের জীবনে পাবেন। তফাৎ শুধু এই আজকের সকালের ব্যাপারে। আজ সকালে রমেশের কাকাকে আমি চড় মেরেছি। মাস দুই ভদ্রলোক কাগজের দাম বাকী ফেলছেন। ওদের বাড়ীতে কাগজের চাহিদা বেশী। মাসিক সাপ্তাহিক কোনটাই বাদ পড়ে না। দু'মাসে বাকী পড়েছে কুড়িটা টাকা। সেই টাকা চাওয়ার চরম পরিণতি হচ্ছে প্রৌঢ় ভদ্রলোক চড় খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন সকালে, আর বিকেলে তারই ভাইপো ঘুষি খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল। ওদিকে রমেশের বাবা মা হয়তো আমারই বাপান্ত করছেন। কাকাও হয়তো কিছু করতেন, তিনি বাড়ী ছিলেন না এই রক্ষে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সব যে চড়াও করতে ছুটে আসবে সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

হাতের সিগারেটটা জ্বলে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাগজওয়ালা উঠে গেল ভেতরে। খানিক পরে আমাকেও ডেকে নিয়ে গেল। রমেশের তখন জ্ঞান হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার খেয়াল হয়েছে এটা তার বাড়ীর খাট নয়, নরম বিছানায় সে শুয়ে নেই। সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে অতিরিক্ত সাবধানী রমেশ কাতর হয়ে বলছে, আমাকে তোমরা বাঁচিয়ে দাও। আমার কাকাকে ডেকে দাও। তোমার টাকা তুমি নিয়ে নাও। কাকা কুড়িটা টাকা আমাকে দিয়েছিল······বলতে বলতে চুপ হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে রমেশ ক্লান্তভাবে চোখ বুজলে।

ভোর হ'য়ে আসতে আমি চলে এলাম। চড়াও করার ব্যাপারটা চোখে দেখতে দিতে কাগজওয়ালা নারাজ। চড়াও করা দেখার জন্য নয় মালতীকে দেখার জন্যে একটা ইচ্ছে ছিল। তা সেটা তখন সম্ভব হ'লনা।

দিনের আলোয় ঘুম ঘুম চোখে বাড়ী ফিরেছি। বেশ মনে আছে মালতী আর কাগজওয়ালার কাহিনী থেকে রংয়ের জলুস সত্যি আর নেই।

সেদিন আর কলেজ যাওয়া হয় নি। পরদিন কলেজ গিয়েছি। স্বভাবতঃই একটা কৌতূহল মনে কাল কি হয়ে গিয়েছে জানবার জন্যে। ক্লাশে গিয়ে দেখি রমেশ আসেনি আর আমাদের কাগজওয়ালার মুখের হাসিটা নিবু নিবু। প্রায় নেই বল্লেই চলে। যারা ওকে জানে তারাই শুধু অতীতের হাসির রেশটা টের পাবে। নূতন কেউ সে মুখে হাসি বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ। একটা লিজার পিরিয়ডে জিজ্ঞেস করলাম রমেশের কথা। উত্তরে বল্লে, ভালই আছে বোধ হয়। একটু হাসি টেনে আবার জিজ্ঞেস করলাম, চড়াও করেছিল শেষ পর্যন্ত ?

উত্তরে জানালে, তা করেছিল।

আর কিছু না বলে কাগজওয়ালা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বল্লে, আপনাকে আমি রমেশের ঠিকানাটা দিচ্ছি, ছুটির পর একবার দেখা ক'রে আসবেন ?

বুঝলাম রমেশের কথাটা জানতে চায়। কিন্তু কারণ যা-ই হোক যেতে লজ্জা পাচ্ছে। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। সম্ভবতঃ সেটা লজ্জারই ব্যাপার। কাগজওয়ালা আবার প্রশ্ন করলো, যেতে পারবেন ?

বল্লাম, যাবো।

ঠিকানাটা নিয়ে সেদিন বিকেলে যাচ্ছি ভবানীপুরের দিকে। বাসে চেপে যাচ্ছি আর ভাবছি ভাই মার খেয়েছে আর চড় খেয়েছে

কাকা মালতীর অবস্থা কাগজওয়ালার চেয়ে হয়তো কম করুণ নয়। চড়াও করে তারা যে খুব ভব্য আর ভদ্র ব্যবহার করেনি এতো বোঝাই যাচ্ছে। কি জানি তারা জানেন কিনা মালতীর সঙ্গে ওর পরিচয়ের কথাটা। রমেশও কি জানে?

রমেশের বাড়ী থেকে ফেরার পথে ভাবছি ওদের কথা মোটেই নয়, ভাবছি নিজের কথা। গত বাঁধা সুর সঙ্গত করতে করতে গিয়েছিলাম গিয়ে যা শুনলাম আর যা বুঝলাম তাতে তাল মেলেনা। রমেশের কাকা বেশ স্নেহের সঙ্গেই ডেকে নিলেন। কাগজওয়ালার বন্ধু বলেই পরিচয় করিয়ে দিলে রমেশও তার কাকার সঙ্গে।

ওর শোয়ার কোঠায় ঢুকতে ঢুকতে যে মেয়েটি পেছন ফিরে তাকিয়ে একটু কৌতূকের হাসি গোপন করে চলে গেল সেই বোধ হয় মালতী। তারও চকিতে দেখা চোখে মুখে কোন বিগত ঝড় কিংবা আগত ঝঞ্ঝার চিহ্ন দেখতে পেলাম না। ওব কাকা আমার পরিচয় পেয়ে কাগজওয়ালার বেশ একটু প্রশংসাই করলেন।

একটু পরে এলেন রমেশেব বাবা। তিনিও বেশ সহজভাবেই জেনে নিলেন ঘুষি থেকে শুরু করে মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত কাহিনী। একমাত্র রমেশ রইল শুযে তার গম্ভীর মুখ নিয়ে। ফেরার পথে এই কথাটাই ভাবছিলাম হিসেব অনুসারে কাগজওয়ালার মুখের চেহারা গম্ভীর হওয়ার কথা নয় তবু তার মুখে নাই হাসি, আর ভাবছিলাম নিজেব কথা। কার্যকারণ নিয়ে চমৎকার মীমাংসা করে রেখেছিলাম। বাস্তবে দেখলাম কাগজওয়ালা আজও সেই দূরের মানুষ। মেডিক্যাল কলেজের অন্ধকারে মালতীর কাহিনী বলতে বলতে সে এসে দাঁড়ায়নি আমাদের সঙ্গে। অথচ সে দিন যে কথা বলেছিল তা ঠিক আর পাঁচ-জনেরই মত। মনের জমান কথা বন্ধুকে ভাগ দিয়ে একটু হাল্কা হওয়া। কিন্তু সত্যই কি তাই?

এদিকে থার্ডইয়ার শেষ হয়ে আসে। ক্লাসে নোটিশ পড়েছে ছুটির আগেই বার্ষিক পরীক্ষা। বঙ্ক তখনও আসছে না। রমেশ একদিন এসেই চলে গেল। শরীর তার ভাল নয়। গরমটা কাটিয়ে আসবে হিমশীতল কোন যায়গায়। একদিন ক্লাসে এসে শুধু কোন বই কতটা পড়া হয়েছে তাই জেনে গেল। কাগজওয়ালার মুখে ফিরে এল ক্রমে আবার একটু হাসির ছোঁয়াচ। একা একা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করি। উল্টো দিকের ডেস্কটা ফাঁকা। ওদিকে ইন্দু অতি ব্যস্ত। ডান দিকে একটু দূরে ত্রিদিবেশ্বর কাজ করতো। সে ডেস্কটাও ফাঁকা। এরই ভেতর বিকেলের দিকে এলেন এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধ এলেন ইন্দুর সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে। গায়ে একটা সাদা চাদর আর মোটা পৈতে। পরনে থান কাপড় আর পায়ে বিদ্যাসাগরি চটি। হাতে একটা লাঠি আর চোখে নিকেলের চশমা সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। ইন্দু বৃদ্ধকে নিয়ে যেতে যেতে বল্লো ফিস ফিস ক'রে, ত্রিদিবেশ্বরের বাবা।

আমরা জন চার পাঁচ ঘিরে এলাম বৃদ্ধের চারদিকে। তিনি এসে দাঁড়ালেন ত্রিদিবেশ্বরের ডেস্কের কাছে। গম্ভীর মুখে দেখলেন ডেস্কটা। তারপর দেখলেন আমাদের। মৃদুস্বরে বল্লেন, এইখানে বুঝি কাজ করতো।

ইন্দু বল্লে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ ডেস্কটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বল্লেন, বড় ভালো ছেলে ছিল।

কাগজওয়ালা মুখটা বাড়িয়ে বল্লে, ছাত্রও সে বেশ ছিল, অথচ কেন যে এরকম করলো......

বৃদ্ধ বল্লেন, সংসার বড় বিচিত্র যায়গা বাবা। দুঃখে কষ্টে তাকে মানুষ করছিলাম, অথচ সেই দিলে ফাঁকি। তোমরা বাবারা ভাল ছাত্র হয়ে ওঠ। তোমরা ওকে মনে রাখবে সেই হচ্ছে আমার সান্ত্বনা।

কাগজওয়ালা বল্লো, মনে আমরা রাখবো ঠিকই, কিন্তু কেন এরকম করলো জানতে ইচ্ছে হয়।

ইন্দু বাধা দিয়ে বল্লো, থাক, থাক, সে কথা থাক।

বৃদ্ধও তাই বল্লেন, হ্যা বাবা, থাক সে কথা থাক।

বৃদ্ধ চলে যেতে কাগজওয়ালা বল্লে আমাকে, পণ্ডিতমশাই জানেন নিশ্চয়ই, বলবেন না। বিচিত্রতার ভাঁওতায় এড়িয়ে গেলেন।

কথাটা সেদিন রূঢ় মনে হয়েছিল। দিন কয়েক পরে বন্ধুকে বলেছিলাম ব্যাপারটা। সে বল্লে, এখন আর জেনে কি হবে? অবিশ্যি বলা যায় না জেনে নিলে হয়তো ভবিষ্যৎ ত্রিদিবেশ্বর বেঁচে যেতেও পারে।

অসুখ থেকে উঠে এসেছে বন্ধু। মুখে দুর্বলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। গলার স্বরটা কেঁপে উঠল ত্রিদিবেশ্বরের কথা বলতে বলতে। কিন্তু মনে হ'ল শুধু গলার স্বরই নয়, ওর মতামতগুলিও যেন কম্পিত। ছুটির পর আমাকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে চল্লো কলেজ স্কোয়ারের দিকে। কলেজ স্কোয়ারে বসে বল্লাম ওকে কাগজওয়ালা রমেশ আর মালতীর কথা। সব শুনলে মন দিয়ে কিন্তু একটা প্রশ্নও করলে না। একটা মন্তব্যও জুড়ে দিলে না। কথা শেষ হ'তে প্রশ্ন করলো আমার পড়াশুনো নিয়ে তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে অনুরোধ করলে, এই গরমের ছুটি আসছে। দু'মাস আড়াই মাস সময়। চেষ্টা যদি করি ভাল রেজাল্ট নিশ্চয়ই সম্ভব।

অনুরোধ জানালে। উত্তরে বল্লাম, সাধ্যমত চেষ্টা নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু মনটায় যেন নাড়া খেলাম। কাগজওয়ালার কথায় বন্ধু কিছু বলেনি। সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। ওর জগতে কাগজওয়ালা পড়ে না। আমি আছি ওর সীমানার ধারে ধারে। কিন্তু ওর অনুরোধ করবার ভঙ্গিতে একটা অদ্ভুত করুণভাব। অসুখ হয়েছিল

সেরে উঠেছে। মাস দুই কাটিয়ে আসবে গৃহে পিতা মাতা ভাই বোনের কাছে। তারপর ফোর্থ ইয়ার। দেখতে দেখতে এসে যাবে বি-এস-সি পরীক্ষা। বন্ধুর শ্রম আর অধ্যবসায় হবে সার্থক। এতে কোথাও কোন হতাশা থাকবার কথা নয়, মনে মনে দুর্বল হবারও কথা নয়। কিন্তু সেদিন বিকেলে স্কোয়ারের জলে যখন গ্যাসের আলো পড়ছে পাশের দিকে বন্ধুর মুখের উপর চোখের দৃষ্টি ফেলে মনে হয়েছিল পদ্মাপাড়ের ছেলে এ, এরতো কোন দুর্বলতা থাকবার কথা নেই। প্রায় ওঠবার মুখে বল্লে বন্ধু, পরীক্ষাটা আর দিচ্ছিনা। কাল পরশু নাগাদ যাবো দেশে। তারপর ফিরে এসে দেখা যাবে, কতদূর কি করা যায়, কি বল ?

হাসিমুখে বল্ল, সে তো নিশ্চয়ই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কি একটা পরীক্ষা উপলক্ষে দিন কয় কলেজ বন্ধ। কলেজ খুললেই শুরু হবে বার্ষিক পরীক্ষা তার পরেই সুদীর্ঘ গরমের ছুটি। অই দিন কয় ছুটির ভেতরে আমার মেসে বন্ধু এল প্রায় প্রত্যেক দিন। সে আসে বসে দু'একটা কথা কয় তারপর চুপচাপ শুয়ে থাকে আমার আধ ময়লা মেসের বিছানায়। চোখ বুজেই থাকে তবে ঘুমোয় না। ক্লান্তভাবে শুয়ে শুয়ে কি যেন ভাবে। ক'দিন আর হবে। দিন পাঁচ সাতের বেশী নয়। অই পাঁচ সাতটা দিন একটার সঙ্গে আর একটা যেন মিশে আছে। কেউ খুব পরিষ্কারভাবে আলাদা নয়। সবগুলি মিলে মিশে পরপর দিন ক'টা মোটামুটি একটানা একটা দিনের ছবির মত মনে আছে। সে ছবিটা বর্ষার দিনের মত ঝাপসা। সারা আকাশ জুড়ে মেঘের আস্তরণ, মাঝে মাঝে ঝিমোনো ঝিরি ঝিরি ইলসে গুড়ি, গাছগুলি ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছে— এমনি একটা ছবি। রঙিন কিংবা চকচকে, বিদ্যুতের ঝলক লাগা চমকিত ক্ষণের সঙ্গে কিংবা নাটকীয় ভাব ভঙ্গীতে পরিপূর্ণ ক্যানভাসের সঙ্গে এ ছবির তুলনা চল্লেনা।

জীবনের পটভূমিতে অই ঝাপসা ছবিটি উপেক্ষা পেয়েই এসেছে অনেক-কাল। প্রদর্শনীতে রঙিন বড় বড় তৈলচিত্রের পাশে অজ্ঞাত চিত্রকরের প্রথম প্রতিভার প্রকাশপত্রটির মত ভবিষ্যতের অপেক্ষায় সে যেন মনের কোনেই বাসা বেঁধে ছিল। ঝাপসা দিনের সে ছবিটিতে একটি মাত্র অস্বস্তি সামান্য একটু খিচ্ রেখে গিয়েছে; পরিপূর্ণ সাম্যতার পথে একটু অন্তরায় সৃষ্টি করে গিয়েছে। সে আমার বাজে বই পড়ার বাতিক। গ্রীষ্মের দিনে মেস যখন ফাঁকা জানালার ধারে চেয়ারটিতে ব'সে একটা কিছু বই নিয়ে ক্রমে ঘুমে ডুবে যাওয়ার অভ্যাসটি তখন প্রায় স্বভাব হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু বন্ধুর উপস্থিতিতে বইএ হাত দিতে পারিনা। ও এসে বসে দু'চারটি কথা কয়, তারপর শুয়ে পড়ে। গল্পের সুযোগ দেয় না। আর আমি চেয়ারে ব'সে এ বই সে বই নাড়া চাড়া করি হাই তুলি। না পারি বি এস সির পাঠ্যপুস্তকে মন দিতে না পারি হাতের কাছে বাজে কোন বই তুলে নিতে। বন্ধু হয়তো বুঝতো। বুঝেও চুপ করে থাকতো। বলতো না গেটম্যান পড়তে। অথচ অনুমতি দিতো না- গল্পের বই পড়ার। ওরই ভেতর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'তে হ'তে নিচ থেকে যখন শব্দ উঠতো কল থেকে জল পড়ার আর রাস্তা থেকে ভেসে আসতো লেংড়ি আমের জন্য গালভরা পশ্চিমি আহ্বান আর পাশের আধা তৈরি বাড়ীটার কড়িবরগার গা থেকে শোনা যেতো মজুরদের কাজের একটানা ঠুং ঠাং শব্দ আমি বন্ধুর দিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে তার ঘুম সম্বন্ধে খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে যে বইটা নিয়ে বসতাম সেটা ট্যারগেনিভের রুডিন। একপাশে ঘুমন্ত বন্ধু আর একদিকে চেয়ারে ঠেসান দিয়ে আমি পড়ছি রুডিনের কাহিনী। তারপর এক সময় বন্ধু ঘুম থেকে উঠতে উঠতে বই রেখে উঠে যেতাম একটু কিছু খাবারের জন্য। বইটা প্রায় শেষ হ'য়ে আসছে এমন সময় একদিন বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখি বন্ধু চোখ চেয়ে

আছে। চোখে চোখ পড়তে একটু হেসে বল্লে, বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে? হাতের বইটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বল্লাম, কৈ না ত?

—তা'হলে বৃষ্টির মত শব্দটা কিসের?

আমি কিছু বলতে বলতে নিজেই বল্লে, ওহো! কল থেকে জল পড়ছে, তাই নয়?

মাথা নেড়ে জানালাম, তাই বটে। একটানা উঠছে শব্দটা। কান দিয়ে শুনলাম খানিকক্ষণ। বৃষ্টির শব্দের মতই বটে। শুয়ে শুয়েই বল্লে বন্ধু, প্রথম প্রথম কলকতায় এসে আমি সত্যি ওটা বৃষ্টির শব্দ বলেই ভুল করতাম। তারপর আর ভুল হ'ত না। আজ আবার মনে হচ্ছে ঠিক যেন বৃষ্টি। ঠিক কি রকম জান? দেশে গাঁয়ে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দের মত।

হাতের কাছে আমার রুডিন বইটা। মন কিছুটা বইয়েতে আর কিছুটা ওর কথায়। সুবিধে মাত্র এই যে রুডিন অপেক্ষা করে। ডস্টয়েভ্স্কির বইয়ের মত চোখ কান মন সব একেবারে টেনে নিয়ে ছুটতে থাকেনা। ঘরের ভেতর বিকেলের আলো ঝিমিয়ে আসছে আর খানিকটা সূর্য্য রশ্মি জানলা গলিয়ে পড়েছে ছাতের গায়। এই সময়টায় দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছি গত কয়েকটা দিন। সেদিন বন্ধু উঠে বসে বল্লে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চলো বেড়িয়ে আসিগে।

বল্লাম, চলো। ঘুমিয়ে পড়তো রোজই, আজ বোধ হয় একটু ক্লান্ত তাই সামান্য বেশী ঘুমিয়ে নিচ্ছিলে?

মাথা নেড়ে বন্ধু বল্লো, একদিনও ঘুমোই নি। আজই বোধ হয় একটু ঘুমের মত—কি জানো ক্লান্ত লাগে তাই চোখ বুজে পড়ে থাকি।

তাহ'লে, ভাবলাম আমি, প্রতিটি দিনই ওকে আড়াল ক'রে যে বই পড়েছি তাও খুব সম্ভব দেখেছে। কিন্তু কিছু বলেনি। সেদিনও কিছু

বল্লে না। বেড়াতে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবে আজ? গড়ের মাঠে না গঙ্গার ধারে?

বন্ধু উত্তর দিলে মাথা নেড়ে, না, চলো আজ আবার সেই কলেজ স্কোয়ারে যাই। বেশ লাগে। সিনেট হল, ইউনিভারসিটী, সংস্কৃত কলেজ আর হেয়ার সাহেবের স্ট্যাচু।

সেদিন স্কোয়ারে বসে রইলাম বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত প্রায় আটটা নাগাদ। কথাবার্তা নয়। দু'জনে বসে আছি। কদাচিৎ দু একটা প্রশ্ন আর জবাব।

—বন্ধু, দেশে যাচ্ছ কবে?

—এইবার যাবো।

কিছুক্ষণ পরে বন্ধু জিজ্ঞেস করছে,

—পারবে তো ভাল রেজাল্ট করতে?

—ভাল রেজাল্ট, সে তো তুমি করবে। ওসব ধাত আমার নেই। মাথা নেড়ে বন্ধু বলে,

—উঁহু, এ ধাতের কথা নয়। তুমি আমার বন্ধু তাই ক'রবে ভাল রেজাল্ট।

তারপর একটু চুপ থেকে,

—কি জানো ক'লকাতা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছেনা এবার। আর এই ক্লান্তিটা···

আমি একটু সান্ত্বনার সুরে বলি,

—ইংরেজীতে একে বলে কনভ্যালেসেণ্ট পিরিয়ড। অসুস্থতার পর এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

তারপর আবার একটু চুপচাপ। আবার হয়তো দু'টো চারটে কথা।

—ইংরেজ সাহিত্যিক ল্যাম্বের একটা 'এসে' আছে এই নিয়ে।

—ল্যাম্ব কে ? স্যাকস্‌পিয়রের গল্প লিখেছেন যিনি ?

—হুঁ ।

রাত আটটা নাগাদ বঙ্কু গাঝাড়া দিয়ে যেন উঠে বসে ।

— চলো ওঠা যাক্। পরীক্ষা এসে গিয়েছে। তোমার পড়া কিছুই হচ্ছে না।

আরও কিছুটা ব'সে থেকে দু'জনেই উঠে পড়লাম। ফাঁকা ট্রামে উঠে বঙ্কু চলে যায় সরকারের বাড়ী। আমি মেসে ফিরি। মনে হয় বঙ্কু যেন যাই যাই ক'রেও দেশের দিকে যাচ্ছে না। কি একটা অপেক্ষায় আছে। কিসের অপেক্ষায় তা তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম ওটা বিদায় নেয়ার অপেক্ষা।

ছুটিটা কাটলো। কলেজ খুলতে আগত পরীক্ষার গুরুত্বটা বুঝলাম ইন্দুর কথায়। ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো কি পড়েছি, কতটা পড়েছি, এই সব প্রশ্ন নিয়ে। উৎকন্ঠিত আরও জনকয়েকের সংগে কথা হ'ল। ক্লাশে এল কাগজওয়ালা। ইন্দু আমার পাশে দাঁড়িয়ে শুনলো খানিকক্ষণ তার পর চলে গেল। জ্ঞানানন্দ চৌধুরি এক ফাঁকে এসে পাশে দাঁড়িয়ে টুক করে প্রশ্ন করলো,

—বঙ্কু বাবু কিছু ইম্পট টেণ্ট বলে টলে দেন নি ? কথাটায় কিছু একটা ইঙ্গিত ছিল। ইন্দু জ্ঞানানন্দের দিকে ঘুরে বল্লো, ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রির সবই ইম্পর্টেণ্ট। ওর আর বলে দেয়ার কি আছে ?

আমি বল্লাম, পড়িতো দু'চার পাতা তায় আবার ইম্পর্টেণ্ট দেখার সময় কোথায় ?

জ্ঞাননান্দ বল্লে, দু'চার পাতা বলেই তো জেনে নিলে সুবিধের। এরই মধ্যে বঙ্কু এল ক্লাসে। ইন্দু তাকে ডেকে আনলে। বল্লে, বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি। গেটন্যান ত এক লাইনও বুঝি না।

জ্ঞানানন্দ সোজাসুজি বল্লে, বোঝাবুঝির সময় নেই এখন। বঙ্কু

বাবু যদি দু' একটা দাগ টাগ দিয়ে দেন। কোত্থেকে রমাপতি এসে হাজির। আগত পরীক্ষার জন্যই হোক আর যে জন্যই হোক তার ঘুম কিছুটা উবে গিয়েছে। সে অবিশ্যি ইন্সপেক্টরের তাগিদ দিলে না। কিছু একটা বলার জন্যই যেন বল্লে, বঙ্কু বাবুর প্রিপারেশন কেমন হ'ল ?

প্রশ্নটা অতি অবান্তর। ইন্দু কি একটা ব'লে কথাটা চাপা দিচ্ছিল বঙ্কু বল্লে, প্রিপারেশন হয়েছিল ভালই। কিন্তু পরীক্ষাটা দেওয়া হচ্ছেনা। দেশে চলে যাচ্ছি।

কথাটা আমার জানা। ওরা এই প্রথম জানলে। আমি জানতাম, কিন্তু বিশেষ খবর বলে মনে হয়নি। কথাটা শুনে ওদের এক দমকে চুপ হ'য়ে যেতে দেখে বুঝলাম ওটা ওদের কাছে একটা বিশেষ সংবাদ। হঠাৎ চুপ হয়ে গিয়ে একটু পরে ইন্দুই বল্লে প্রথম, দেবেন না ? কেন ? শরীর সারে নি তাই ?

জ্ঞানানন্দ বল্লে, যা-চ'লে, যার জন্য পরীক্ষা সেই দেবেনা পরীক্ষা !

রমাপতি একটা হাই তুলে বল্লে, অবিশ্যি আপনার পরীক্ষা দেওয়া না দেওয়ায় আমার কিছু এসে যায় না। যেমন ফেল তেমনি ফেল।

ইন্দুটারই কিছু সুবিধে হবে। ফার্ষ্ট হওয়ার একটা চান্স....

ইন্দু বল্লে, মরুক ছাই ফার্ষ্ট হওয়ার চান্স...

আরও কি যেন বলতে বলতে প্রফেসর ক্লাসে এসে যাওয়ায় কথাটা বলা হ'লনা। কিন্তু সে দিনটা অই ব্যাপারই চল্লো। ছাত্ররা একে একে বোধ হয় প্রায় সবাই একটু আধটু কিছু বলে দুঃখ প্রকাশ ক'রে গেল। আর আমি বঙ্কুর পাশে ব'সে ওদের কথা শুনে শুনে বুঝলাম অনেকদিন আগের কাগজওয়ালার সেই কথাটা—পরিবার কি একটা ! ক্লাসে একটা পরিবার...

প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে এলো বঙ্কু। দু'চার জন এগিয়ে এসে বল্লো বঙ্কুকে, শরীর আপনার ভাল নেই, কেন আর এই গ্যাসের আবহাওয়ায়

সময়টা কাটাবেন। আমিও বল্লাম কথাটা। বঙ্কু উত্তর দিলে, প্র্যাকটি-ক্যাল ক্লাস করতে সে আসেনি। সে এসেছে ডেস্কের জিনিসগুলি বুঝিয়ে দিতে। নিয়ম মত গ্রীষ্মের ছুটির আগে ডেস্কের জিনিসগুলি ফেরৎ দিয়ে আবার ছুটির পরে ফেরৎ নেয়ার কথা। আমাদের কথাটা খেয়াল ছিল না। একজন ডেমনষ্ট্রেটরকে ডেকে এনে বঙ্কু ডেস্ক খুলে বার ক'রে দিলে তার ধোয়া মোছা চকচকে ফ্লাস্ক টেষ্ট-টিউব উলফ্‌স বটল আরও সব যন্ত্রপাতি খুঁটিনাটি। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম তার ডেস্কের চারদিকে। ডেমনষ্ট্রটর ভদ্রলোক জিনিসগুলি বুঝে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলেন, পরীক্ষাটা দিয়ে গেলেই ত পারতে? আর ত মাত্র ক'টা দিন বাকী। তোমার রেজাল্ট কি হয় জানবার ইচ্ছে আমাদের সবারই।

মাথা নেড়ে বঙ্কু বল্লে, ইচ্ছে ছিল আমারও। ডাক্তার বাবু কিছুতেই মত দিচ্ছেন না।

ইন্দু বল্লে, ডাক্তারদের অই মত। যেন পরীক্ষাটা দিলেই সব উল্টে যাবে।

কাগজওয়ালা ছিল আশে পাশেই, গলা বাড়িয়ে সে বল্লে, পরীক্ষা না দিলে কি উল্টে যাচ্ছে, বলবে?

ইন্দু কিছু জবাব দিলে না। জ্ঞানানন্দ বুঝি বল্লে কিছু। ওদিকে টেব্‌লের উপর জিনিসপত্র সাজিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বঙ্কু ডেস্কের পাশ থেকে সরে দাঁড়াল। একজন ব্যায়ারার এসে জিনিসগুলি নিয়ে যাচ্ছে দুটি চারটি ক'রে। ডেমনষ্ট্রটর ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, দেশে যাচ্ছ কবে?

বঙ্কু বল্লে, আজ বোধ হয় আর হবে না। কাল যাব। তারপর আমার দিকে ঘুরে বল্লে, আমি তোমার মেসে যাচ্ছি। চাবিটা দাও তো।

চাবিটা হাতে দিতে দিতে বল্লাম, চলো, আমিও যাচ্ছি।

আমরা দু'জনে বেরিয়ে আসতে আসতে ওরা পথ ক'রে দিলে। কলেজের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম দুজনে। তারপর পথ চলা। গলি থেকে বড় রাস্তায় পা দিতে দিতে বন্ধু একবার দাঁড়াল। তারপর একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লো. এসো একটু চা খেয়ে নিই। ক'দিন ভেবেছি অই দোকানটায় তোমাদের মত ব'সে ব'সে চা খাব।

কথাটা শুনতে শুনতে মনের ভেতরটায় হঠাৎ যেন কি সব ঘটে গেলো, কি ঘটলো তা বুঝে দেখবার সময় বা মনোভাব তখন নেই। হাসি টেনে বল্লাম, বেশ ত চলো।

চায়ের দোকান। কলেজ স্কোয়ার। দোতালা বাসে চেপে কালিঘাট। তারপর ফিরে গেল বন্ধু তার আস্তানায়। পরদিন ভোর বেলায় দেখি একটা রিকসায় জিনিস পত্র চাপিয়ে বন্ধু এসে হাজির মেসের দরজায়। জিনিসপত্র মানে একটা বড় ট্রাংক, একটা আধভাঙা টিনের স্যুটকেশ আর একটা বিছানা। ট্রাংক ভরত্তি বই খাতাপত্র। সেটা রীতিমতো ভারি। ট্রাংক স্যুটকেশ আর বিছানা আমার কোঠায় রেখে দিয়ে জানিয়ে দিলে সেদিনটা সে ঘুরে বেড়াবে সারাটা শহর বিকেল পর্য্যন্ত। অমাকে সঙ্গে নেবে না। আমার কলেজ যাওয়া দরকার। সন্ধ্যের পর সেদিনই সে চলে যাচ্ছে। অতএব আমি যেন কলেজ ছুটির পর ফিরে আসি মেসে।

ছুটির পর ফিরে এলাম মেসে। ঠিক ছুটির পর নয়। ছুটির একটু আগেই। কলেজের সরকার একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন বন্ধু কি চলে গিয়েছে ? বল্লাম, আজই যাবে। আমার ওখানে জিনিসপত্র রেখে হাওড়ায় তার এক মামার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। সরকার কেমিক্যাল ঘেটে জীবন কাটিয়েছে, সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। প্রশ্ন ক'রলে, তোমার ওখানে কেন ? বল্লাম, আমার মেসটা শেয়ালদার কাছাকাছি, তাই।

মেসে ফিরে এসে সরকারের কথাই ভাবছিলাম। বঙ্কু ফিরে এসেও কি ওর হাত থেকে রেহাই পাবে? অথচ সরকার হচ্ছে বাঘিনীর মত। ওর কাছ থেকে বঙ্কুর দূরে থাকাই দরকার।

উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে বঙ্কু এল সন্ধ্যের একটু আগে। হাসি মুখে সে জানালো সারাটা দিনই ঘুরে বেড়িয়েছে। এবার বেরুবে দেশের দিকে।

শেয়ালদায় বঙ্কুকে সেদিনই তুলে দিয়ে এলাম। ইন্দু এসেছিল ষ্টেশনে। ঢাকা মেলের গাদাগাদি ঠাসাঠাসি ভিড়ের ভেতরে কোনরকমে ওকে তুলে দিযে ট্রেণ ছাড়বার অপেক্ষায দাঁড়িয়ে আমি আর ইন্দু। ইন্দু কেমিষ্ট্রির নানা সমস্যা নিযে সেই ভিড়েও নানা প্রশ্ন করছে। আমি ভাবছি অপেক্ষমান ট্রেণটার কথা। চলে যাওয়ার জন্য ট্রেণটা দাঁড়িয়ে। একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়েছিল সেদিন। অপেক্ষমান ট্রেণটি দাঁড়িয়ে আছে সত্যি দেশ এবং কালের বিচারে কিন্তু দেশ-কাল অতীত যদি কিছু থাকে সে বিচারে ট্রেণটি চলে গিয়েছে। খানিকটা বঙ্কুরই মত। চলে সে গিয়েছে এর আগেই, শুধু মাত্র চলে যাওয়ার রেশটাই থেকে গিয়েছে। খানিকটা যেন সন্ধ্যের আড়ালে দিনের আলো চলে গিয়েও যাচ্ছে না। বিদায়ী বঙ্কু, অপেক্ষমান ট্রেণ, কোলাহল মুখর জনতা, লিকলিকে চেহারার ইন্দু—সবকে নিয়েই এই বিচার—চলে গিয়েও যায়না একটা রেশ রেখেই যায়।

একসময় ট্রেণটা ছেড়ে দিলে। আমি আর ইন্দু বেরিয়ে এলাম ষ্টেশন থেকে। চলমান কলকাতার ট্রাম বাস জনতা তেমনি চলছে। ইন্দুর কাছে বিদায় নিতে নিতে ইন্দু বল্লে,

—বড় সারপ্রাইজিং ছাত্র ছিল।

বল্লাম, তাই বটে।

অবিশ্যি প্রশ্ন করতে পারতাম, ছিল কেন?

প্রশ্নটা করা হয়নি। করা হয়নি হয়তো তক্ষুণি একটা ট্রাম এসে যাওয়ায়, হয়তো বা অমনি হয়। মানুষের মন জানতে পারে এবং কদাচিত সে জানাকে অস্বীকার করে উঠতে পারে না।

ভেবেছিলাম যা লিখব সত্যি লিখবো। লিখেও গিয়েছি সরল ভাবে। কিন্তু বন্ধুর চলে যাওয়া পর্য্যন্ত এ কথকতা লিপিবদ্ধ ক'রে কি রকম খট্‌কা লাগলো। সত্যি লিখেছি বটে, কিন্তু সবটা সত্যি বোধ হয় লিখতে পারিনি। কি একটা ধারা যেন বাদ পড়ে গিয়েছে। হ'তে পারে সেটা লুপ্ত ধারা। তার প্রকাশই পরে ঘটলো। অন্ততঃ খেয়াল ক'রে দেখতে আমার দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

সেটা বন্ধু চলে যাওয়ার অনেক পরে। একদা ওরই একটা চিঠি পেয়ে যেন চমকে জেগে উঠলাম, তাইতো বন্ধুবিহারী আজ অনেককাল ক'লকাতায় নেই, তাতে দিনের চলায় কিছু ব্যাঘাত ঘটেনি। শুধু এই নয়। আরও একটা সীমা যেন চোখে পড়লো। সেটা মানুষে মানুষে সম্পর্কের সীমা।

অথচ বিজ্ঞানের ছাত্র আমি, আমার জানা ছিল প্রকৃতি শূন্যতাকে স্বীকার করেনা। ফাঁকা যা কিছু তা ভরিয়ে দিয়ে মিলিয়ে নিয়েই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা পায়। মানুষে মানুষে সম্পর্কেও এটা সত্যি। নিষ্ঠুর হ'লেও, এদিক সেদিক কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেও এটা সত্যি।

বন্ধু চলে যেতে এতটা জানিনি। প্রশ্ন করলাম অনেক পরে। আর মোটামুটি সঙ্গত উত্তর পেলাম আরও পরে। তাছাড়াও বুঝি আছে। সেটা ব্যক্তি স্বভাবের সীমা। কিন্তু ব্যক্তি স্বভাবের বিশ্লেষণ ব্যক্তি স্বভাবের বিরোধী। সামাজিক সম্পর্কটাই বড়জোর তুলে ধরা চলে, বিশ্লেষণও সম্ভব।

কি বলেছিল ইন্দু! নিজের অজ্ঞাতে কি ইঙ্গিত দিয়েছিল? সেটা

আচমকা উঠে আচমকাই ডুবে গিয়েছিল। সেটা তখন কিংবা তারপরে চিন্তায় কিংবা কর্মে কোন ব্যতিক্রম ঘটায় নি।

বন্ধু চলে যেতে স্বভাবতঃই খানিকটা ফাঁকা ঠেক্‌ল। কিন্তু সেটা খব একটা কিছু নয়। তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হ'লোনা, কিংবা পার্কে গিয়ে কি যেন হারিয়ে গেছে ভাব ক'রে বসে থাকার মতও কিছু নয়। যথারীতি বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেল।

পরীক্ষা মানেই খানিকটা শৈশব স্মৃতি বহনকারী। অভ্যাস আছে, অভিজ্ঞতাও আছে, তবুও কিরকম একটা চাঞ্চল্য যেন পেয়ে বসে। সেই খাতা কলম প্রশ্নপত্র। একটা অহেতুক খৃষ্টিয় গীর্জার অজাগতিক ভাব। মাথার উপর পাখা ঘুরছে সাঁই সাঁই ক'রে। পা টিপে টিপে গার্ড দুসারি বেঞ্চের ভেতর দিয়ে পায়চারি ক'রে পাহারা দিচ্ছে। এদিক সেদিক একটু আধটু গুঞ্জন উঠতে গার্ড ভারি গলায় সাবধান করছে। অতি দ্রুত প্রফেসর গোস্বামী ক্লাসে এসে প্রশ্নপত্রের সামান্য কিছু মুদ্রণ ত্রুটি সংশোধনের কথা বলে গেলেন। আমরা যেন সবাই মিলে একটা ভিন্ন জগতের যাত্রী। কলম রেখে সারাটা ক্লাসে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলাম। কি যেন আছে পরীক্ষায় আর প্রশ্নপত্রে। মুখের চেহারাই যেন বদলে গেছে। ইন্দুর মুখটা অতিরিক্ত রকমের গম্ভীর। গম্ভীর নয়, মধ্যযুগীয় কনফেসনের সময় অনর্থক একটা অপরাধী চেহারা নিয়ে গীর্জার পাদ্রির কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনার মুখচ্ছবি ইন্দুর চোখে মুখে। কাগজওয়ালাকেও খুজে বার করলাম। সে মুখে সেই ঈষৎ হাসি, কিন্তু কলম চলছে ঠিকই।

পরীক্ষা ছুটির পূর্বেই, কিন্তু তার ফল বেরুলো কবে? ছুটি ফুরিয়ে আসতে নাকি তার আগেই? আজ মনে পড়ে না।

গ্রীষ্মের ছুটির মাঝামাঝি বন্ধুর একটা চিঠি পেলাম। আর একটা পেলাম ছুটির একেবারে শেষে।

কি একটা উপলক্ষে চন্দননগর গিয়েছিলাম। ফিরে আসতে দিন দুই লাগলো। ফিরে এসে চিঠিটা পেলাম। সে চিঠিটা আমার মনে আছে।

গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে আসছে। প্রায় দুই মাস চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে পড়শুনা করছি। খুব বেশী নয়। তোমার খবর জানতে ইচ্ছা করি। ছুটির পর কলিকাতা যেতে পারবো ব'লে মনে হয়না। বিশ্রাম অনেক পেয়েছি। কিন্তু দিন কয় শরীরটা ভাল যাচ্ছেনা। আমাদের গাঁয়ের কবিরাজ মশায় চিকিৎসা ক'রছেন। ওষুধটা বিনি পয়সায়। ভিজিট লাগেনা।

আমার বিশ্বাস আমার কিছু হয় নি। বেশ ভালই আছি। একটু জ্বর হয় মাত্র। তুমি কেমন পড়াশুনা করেছ? ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি মন দিয়ে পড়বে। খুব শক্ত নয়। এখনও কি ফরাসী পড়ছ নাকি?

এই তো সেই পোস্টকার্ডের চিঠি। ওর বিশ্বাস ওর কিছু হয়নি। আর আমার ধারণা ওর সত্যি কিছু হয়নি, কিন্তু একটা শঙ্কা মনকে পেয়ে বসে। সেটা ট্রামে বাসে চলতে পথে হাটতে খবরের কাগজের পাতা উল্টোতে কারণে অকারণে আচমকা মনে পড়ে, তাইতো এটা কি হ'ল? কিছু হয়নি ব'লে সেটা সরিয়ে রেখে আবার চলতি কাজে চলতে থাকি।

সে আজ কত যুগ আগের কথা। আবার সেটা প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তেরও কথা।

ক'লকাতা। ক'লকাতার জীবন। চৌরঙ্গীর চৌমাথা। ছুটছে ছুটছে ছুটে চলেইছে। ক্যালেণ্ডারের পাতায় দিন বদলাচ্ছে মাস বদলাচ্ছে সন সরে যাচ্ছে। মুহূর্তে মুহূর্তে সরে যাচ্ছে সময়। তার মানে কি?

বন্ধুর দ্বিতীয় চিঠি। দ্বিতীয় নয় হয়তো তৃতীয় কিংবা চতুর্থ।

কিন্তু আমার মনে সেটা দ্বিতীয় হ'য়ে আছে।

এখানে সময় কাটেনা। তোমার মত নাটক নভেল যদি পড়তে পারতাম! সত্যি বলতো উপন্যাস পড়ে কি পাও তুমি? রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে জানিনা। কিন্তু এই সময় একটা কাজ আমার করার আছে। বিদেশী ভাষা কিছু শিখে নিতে পারি। তুমি তো ফরাসী ভাষা শিখছ। আমার ইচ্ছা করে ফরাসী শিখি। এই সময়ে যদি শিখে ফেলি পরে কাজে লাগবে। ভবিষ্যতের পড়ায় বিদেশী ভাষার প্রয়োজন হবে।

জ্বরের সঙ্গে মাঝে মাঝে কাসি হয়। খুব যে সর্দি লেগেছে তা নয়, কি রকম একটা শুকনো কাসি। কবিরাজ মশায়ের ওষুধ খাচ্ছি। দুর্ভাবনা ক'রোনা। হয়তো কলেজ খুলতে খুলতেই যেতে পারবো না। তাতে খুব মুস্কিল কিছু হবে না। পার্সেণ্টেজ আটকাবেনা। আর ক্লাসে যা পড়ান হবে তা আমার মোটামুটি জানা আছে। সম্ভবপর হ'লে মাঝে মাঝে লিখে জানাবে।

কবিরাজ মশায়কে যদি দুটো একটা টাকা দিতে পারতাম ভাল লাগতো। তা সম্ভব হয়না। তোমার অবস্থা জানি। তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়। আশা করি ভাল আছ।

(আশ্চর্য, বন্ধুর চিঠিগুলি মনে আছে। কিন্তু কি উত্তর দিয়েছিলাম তা মনে পড়ে না। সত্যি সত্যি কি উত্তর দিতে পেরেছিলাম? নাকি সত্যি উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়?

একটা কথা শুধু পরিষ্কার অনুভূতিতে আছে। বন্ধুকে যেন দূর থেকে দেখা শুরু হ'য়ে গেল তখন থেকে।

এইতো মোটামুটি সেবারের সেই গ্রীষ্মকালের ইতিহাস কিংবা সে ইতিহাসের ভূমিকা।)

প্রায় এই সঙ্গেই তার পরের চিঠিটা। ছোট চিঠি। একটা

পোস্টকার্ডের একদিকে গুটি কয়েক লাইন মাত্র।

বুঝিবা সত্যি কিছু অসুখই হয়েছে। কাসির সঙ্গে রক্ত পড়লো। কিন্তু থাইসিস নয়। চিকিৎসা চলছে। পড়াশুনা করছি। কলিকাতায় যেতে কিছু দেরি হবে। উত্তর দিও।

উত্তর দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই। কিন্তু কি উত্তর দিয়েছিলাম? কি উত্তর এর হ'তে পারে?

সেদিন অনেক আগের দিন। আজও যদি বন্ধু আবার অমনি চিঠি লেখে, কি উত্তর দেবো?

সত্যি বলতে কি এখানে দু'ছত্র উত্তরের পরিবর্তে অর্থের প্রয়োজন কিংবা আরও ভাল বলা চলে তড়িৎগতি কিছু কর্মের প্রয়োজন। সেদিকে ফাঁকা ঠেকলেই উত্তরটা বেসামাল হয়ে পড়ে এবং কাব্য কিংবা ঐ জাতীয় কিছু বিরচনের প্রয়োজন ঘটে।

কাব্য করার সাধ ছিল না, কর্মের সুযোগও খুব একটা ছিল ব'লে মনে হয়না; অতএব সেদিন উত্তর দিতে অসহায় বোধ ছিল, আজকেও খুব একটা ব্যতিক্রম ঘটবে কি?

ওটা প্রশ্নই থাক। অবশ্যই ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু অসহায় বোধটা সামাজিক। গাল পাড়ার জন্যে নয়, অবস্থার বাস্তবতা উপলব্ধির জন্যে।

বন্ধুর ছোট চিঠিটা পেতে পেতে কলেজ খুলে গেল। কিছু কাউকে বলবো কি বলবো না ঠিক করতে করতে দেখি খবরটা জানাজানি হ'য়ে গিয়েছে। স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমলাক্ষ বসু একটা সভার আবেদন জানিয়েছে।

হোল সভা, বাকবিতণ্ডা। চাঁদা তুলবার প্রস্তাব হ'ল। তারপর সভান্তে চায়ের দোকানে দীর্ঘকাল ধরে এই নিয়ে জল্পনা কল্পনা চল্লো। জল্পনাটা স্ববিরোধী, কল্পনাটা দেশে কালে সুবিস্তৃত। দুঃখ প্রকাশটাই সরল হ'য়ে উঠলো। তা নিয়ে সন্দেহ করার কিছু ছিলনা। এমন

ছেলের এমন পরিণতি এটা অভাবনীয়। এ সূত্রে কাগজওয়ালার দু'একটি কথাও মনে পড়ে।

এমন ছেলে না হ'লেই কি পরিণতিটা খুব সুখের ? প্রশ্ন ক'রলো কাগজওয়ালা।

উত্তর হ'লো, তা নয়। তা নয়। এমন ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল ক'রতো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার কাগজওয়ালার মৃদু ভাষণ, লাভ ক্ষতিটা মেপে দেখলেই ভাল, কিন্তু measureটা কি ?

বাইরে বেরিয়ে পথ চলতে চলতে কাগজওয়ালা বল্লে আমাকে, বিশ্বাস করুন, বঙ্কবাবু টাকা চান না।

টাকা চান না, কিন্তু তার প্রয়োজন আছে। উত্তর করলাম একটু দিশেহারা ভাবে।

কাগজওয়ালা সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল, পাদানি থেকে পা নামিয়ে বল্লো, কিন্তু কমলাক্ষের প্রয়োজন ভোট সংগ্রহ, আমার প্রয়োজন গ্রাহক সংগ্রহ, আপনার একটা ট্যুইশন,—আচ্ছা চলি, আর একদিন হবে।

চলে গেলো কাগজওয়ালা। মিটিং-এর কথাগুলি আমার মাথায় তখন নেচে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কাগজওয়ালার ভাষণে কি রকম যেন থমকে গেলাম। সশব্দে একটা ট্রাম চলে যেতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার পথ চলছি। একটু ক্লান্ত লাগছে, বোধ হয় বা একটু অবসন্নও লাগছে। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে দেখছি লোকজন ট্রাম বাসের চলা।

একই জীবনে একই প্রশ্ন কতরকম ভাবে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত কি ? এই প্রশ্নটাই সেদিনের সেই সন্ধ্যায় চলমান ক'লকাতার সামনে দাঁড়িয়ে মনে জেগেছিল। সরাসরি প্রশ্নটাই করলাম মনে মনে তা নয়, কিন্তু অস্বস্তিকর একটা সমস্যা যেন মনকে পেয়ে ব'সল। ব্যাপক জিজ্ঞাসার বয়স সেটা নয়। কোন কিছুরই

ভেতর পর্য্যন্ত তলিয়ে গিয়ে শেষটা খুঁজে দেখতে মন চায়না, পাশ কাটিয়ে কোনক্রমে একটা কিছু সমাধানে পৌছনর আগ্রহটাই বেশী। তাতে শেষ সমাধান কিছু না থাক চলাটা বজায় থাকে, নয়ত থেমে যাওয়ার ভয়টা পেয়ে বসে।

অথচ থেমে যাওয়া মিথ্যে নয়। জীবনের পথে চলতে গিয়ে এই সেদিন পূজোর ছুটিতে একজন থেমে গেল। আজ ভরা গ্রীষ্মে আর একজন থেমে গিয়েও পথ খুঁজে পেতে চায়। জীবনে থেমে যাওয়ার শেষ তো মৃত্যু। কিন্তু থমকে দেয় এমন প্রশ্নতো আছে। আছে কিন্তু তখন সে বয়সে সেটা মানতে চাইতাম না।

অসম্ভব নয়, সবই সম্ভবপর। কোন কিছুই অতলান্তিক নয়। ডুব দিলেই রত্নের আশা থাকে। সে রত্নের রূপ নিয়ে কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু বন্ধুর চিঠি আমার বুক পকেটে আর কাগজওয়ালার অনায়াস উক্তি আমার কানে, চলমান কলকাতা চোখের সামনে, তবু থেমে গিয়ে কি যেন হাতড়ে বেড়ালাম। কি যেন খুঁজে দেখলাম। সেটা বুঝি স্বীকৃতির চেষ্টা, সেটা বোধ হয় অসহায় মানুষের আত্ম উপলব্ধি।

চৌমাথার আলোয় বন্ধুর ছোট চিঠিটা আবার একবার পড়ে দেখলাম। খুব সরল কথা। অসুস্থ বন্ধুকে সুস্থতার পথে নিয়ে আসা। সেটা সম্ভব কি অসম্ভব তার চেয়েও বড় হ'য়ে দেখা দিলে এই কথাটাই, কেন এমন হ'ল?

তারপর অনেক দিন গিয়েছে, অনেক ভাঙাগড়ার খেলা ঘটে গিয়েছে, কিন্তু জীবনের সেই প্রথম নাড়া খাওয়া আজও যেন সজাগ চঞ্চল এবং স্পর্শকাতর।

সে দিনে ছুটোছুটির অন্ত ছিলনা। কাজে অকাজে ক্রমাগত ছুটোছুটি ক'রেছি। কিন্তু তাতে কাজও এগোয়নি অকাজের বোঝাও,

বাড়েনি। শুধু মাত্র আড়াল খুঁজে দিন গিয়েছে।

এদিকে গ্রীষ্ম গড়িয়ে বর্ষা আসে। ক'লকাতার ধূলিধূসর আকাশে মেঘ জমে। হঠাৎ বর্ষার জল দাঁড়ায় রাস্তায়। ট্রামগুলি স্থির দাঁড়িয়ে থাকে আর বাসগুলি ঢেউ তুলে চলে যায়। চটি পায়ে ছপ ছপ ক'রে ভেজা কাপড় জামা ভেজা গা নিয়ে পথ চলি।

কিন্তু সে যেন চলা নয় পথ পেরিয়ে যাওয়া। আগে চলতাম যেন সারা বিশ্বে সে পথটাই সত্যি, আর এখন আমার একটি মাত্র পথই শুধু নয়, সারা বিশ্বই আছে দূরে দুরান্তে নানাদিকে নানা পথে।

মেসে ফিরে গা মাথা মুছে শুকনো কাপড় জামা পরে একই সময়ে বহুর সম্ভাবনা নিয়ে মনে মনে জাল বুনি, কিন্তু ওদিকে থেমে নেই, বন্ধুর দিন থেমে নেই। সেও এগিয়েই চলেছে।

শুধু মাত্র একান্ত নিশ্চিন্ত চিঠির ফাঁকে ফাঁকে একটা কি যেন বহন ক'রে আনে, যা অচেনা এবং অজ্ঞাত। সে চিঠিতে হা হুতাশ নেই আবেদন নিবেদন নেই,—এতো একান্ত শান্ত। এক হিসেবে সেই পুরনো বন্ধু। কিন্তু সত্যি তা নয়। এ সময়ের একটা চিঠি আজও আমার কাছে আছে। আছে অর্থাৎ কি ক'রে থেকে গিয়েছে। চিঠিটা এই : কবিরাজ মশায় কি সব ব'লে গিয়েছেন, তাই নিয়ে বাবা মার খুব দুশ্চিন্তা হয়েছে। আমাকে কিছু বলেনি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। বাবাকে কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। মাকে নিয়েই মুস্কিল। মা কেঁদে ফেলে। অথচ আমি জানি আমার বিশেষ কিছু হয়নি। যদি বা কিছু হ'য়ে থাকে, তা সেরে যাবে। তুমি মাঝে মাঝে ক্লাসের পড়াশুনার খবর পাঠাবে। বি, এস সির পড়া নিয়ে খুব দুশ্চিন্ত নই। কিন্তু জানতে ইচ্ছে হয়। তোমার কথা তুমি বিশেষ লেখনা। তাও জানতে ইচ্ছে হয়। আবার কবে কলিকাতা যাওয়া হবে তাই ভাবি। ফরাসী ভাষাটা শিখবার ইচ্ছা হয়। যদি পার কিছু বই পাঠিয়ে দেবে।

আমার সময় প্রচুর। শিখে নিতে পারব।

প্রায় শুয়েই থাকি। বই খাতা সাধ্যমত নাড়াচাড়া করি। খাতাপত্রগুলি হাতের কাছেই থাকে। সেগুলি দেখি। এখানে এখন খুব বর্ষা নেমেছে। আশা করি ভাল আছ।

সত্যি তাই। ভালই ছিলাম। এত যে অন্ধকার তবু মন্দই বা বলি কেন?

গায়ে হাত পড়লো। একটু দ্রুত বেগে পথ দিয়ে চলছি, কে যেন পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে আমাকে থামাল। একটু চমকে গিয়ে তাকালাম। কাগজওয়ালা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ পড়তে বল্লে, কি ইচ্ছেটা আপনার?

বন্ধুর শোকে—বাকি কথাটা বল্লে একটি মেয়ে,—আমাদের কাঁদাতে চান?

মুহূর্তের ভেতরে মেয়েটিকে দেখলাম চিনলাম, কিন্তু কথাটার উত্তর দিতে পারলাম না। একটু ঘুরে দুজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আকস্মিক চমক্‌টা সামলে নিচ্ছি, কাগজওয়ালা বল্লে, কান্নাটা সামলানো যাবে, আমার ওটা ঠিক আসেনা, কিন্তু কি মতলব……

আবার বাঁধা পড়লো।—আমার কথাই বলা হয়েছে। কান্নাটা আমার আসে। যেখানে সেখানে যখন তখন, কিন্তু যা কিছু নিয়ে নয়।

থমকে গিয়ে কাগজওয়ালা মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনলে, তারপর কথা থামতে থামতে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বল্লে, আধুনিক জুলিয়েট। কি প্রমাণ হয় জানেন? সেক্সপীয়র সত্যিই চিরজীবী নন।

আমি বল্লাম, অর্থাৎ বলবার লোভ সামলাতে পারলাম না, বোধ হয় বা সত্যি ইটারন্যাল। জুলিয়েট একা নয়, রোমিও এবং জুলিয়েট এক সঙ্গে……

মালতীর সইলো না। খানিকটা মুখ ফিরিয়ে রইলো, মুহূর্তেই মুখ ঘুরিয়ে বল্লো, সিলি এণ্ড্ চিপ! মাপ ক'রবেন, ইংরেজীতে বল্লাম। কিন্তু এর বাংলা হয়না।

কাগজওয়ালা আচমকা আমার একটা হাত ধরে বল্লে, Excuse her, she is just a child. রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আপনাকে ধমকে দেবার ইচ্ছে ছিল না।

মালতী একপা সামনে এসে আমার আর একটা হাত ধরে বল্লে, বিশ্বাস করুন, আপনাকে বলিনি। বিশ্বাস করুন, নইলে কেঁদে ফেলবো।

এ মেয়ের কেঁদে ফেলার কথা শুনে আমার হাসি পেল। বোধ হয় অনেকদিন পরে সত্যি হাসলাম।

আরও দু'চারটে ভালমন্দ কথাবার্তার পর ওরা চলে গেল। আমি উল্টো দিকে চলতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে খানিকক্ষণ দেখলাম ওদের। মালতীর কথাটা আবার মনে পড়তে এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। দূর থেকে দেখছি একটি ছেলে আর একটি মেয়ে পাশাপাশি যাচ্ছে। এরকম কত ছেলে মেয়েকেই ত দেখেছি কত সময়। বেশ লাগতো দেখতে।

ভবানীপুরের কাজ সেরে ট্রামে ফিরতে ওদের কথাই ভাবছি। এতকাল শুধু বেশ লাগাটাই ছিল সম্বল, এবারে যেন আর একটু গভীরে দৃষ্টি পড়লো। যত সহজে ওরা পথ দিয়ে চলে, ওদের চলাটা ঠিক অত সহজ নয়।

মনে আমার কৌতূহল আর নানা প্রশ্ন। একটু মোহভাবও যে না আছে তা নয়। একটি যুবক মনের মত একটি যুবতীর সঙ্গ পেয়েছে, কিন্তু, অনেক কিন্তুর ধাক্কা সামলে তবেই পেয়েছে। বেশ, এই এদের পরস্পরকে পাওয়া, এ বেশ। কিন্তু,—উঁহু সেদিন আর কিন্তুকে

মনে ঠাঁই দিতে আমার মন চাইছেনা। খানিকটা রবি-ঠাকুরীয় দর্শনের মৌতাত লেগেছে মনে। কবিতার দু'চার কলি মনে মনে আওড়াচ্ছি। পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে সবুজ ঘাসে ঢাকা গড়ের মাঠ। দ্রুতবেগ ট্রামের একটানা সোঁ সো শব্দে কানে এসে পৌছয়।

কিন্তু, আর কিন্তুকে ঠেকিয়ে রাখা গেলনা। বাড়ী ফিরে বন্ধুর চিঠির উত্তর লিখতে হবে। ক'দিন থেকে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার চিঠি। উত্তর লিখব লিখব ক'রে লিখতে পারছিনা। দেরি হয়ে গেছে,—এ দেরি হওয়ার কৈফিয়ৎ কি? শুধু বন্ধুর কাছে নয় নিজের কাছেই বা এর কৈফিয়ৎ কি?

স্বীকার করতেই হয় জীবনের জন্যই জীবন বড় স্বার্থপর। জীবন্ত থাকার দাবিতে সে মৃত্যুর চেয়েও অনুদার।

কিন্তু এই স্বীকৃতীটাই স্বীকার করতে পেরে উঠি না। বন্ধুত্বের দাবি অমনি মাথা তুলে চেপে বসবে। হতাশ হয়ে সেদিন বর্ষার সেই শেষ বেলায় মনে মনে মেনে নিলাম বন্ধুর কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। চট্ করে আজ বলা শক্ত সুদূর গ্রামের একটি কুটিরে বন্ধুবিহারী নামে সেই ছেলেটি কি ভাবছে?

বাড়ী এসে সেদিন চিঠি লিখলাম। কি তুমি ভাবো লিখে জানাবে? আমাদের যেমন তুমি দেখে গিয়েছ তেমনি আছি, পরেও তাই থাকবে', কিন্তু তোমার কথাই লিখে জানালে সুখী হব।

বলা বাহুল্য সে কথা বন্ধু লিখে জানায়নি। আমি আর, কেন জানিনা, এ নিয়ে বেশী প্রশ্ন করিনি। বন্ধুর এর পরের চিঠি আসতে আসতে এও যেন খুঁজে পেলাম হয়তো সেও জেনেছে সে সরেই যাচ্ছে। কিন্তু অবাক লাগে সরে যাচ্ছে জেনেও কই কোন কাড়াকাড়ি তো নেই।

এ হচ্ছে পরের কথা। তার আগে এদিকের আকাশে নানা পরিবর্তনের ঘন ঘটা।

সেবারে বর্ষাশেষে দিন কয় খুব ঝড় জল হ'য়ে গেল। প্রায়ই বিকেলের দিকে কলেজ ছুটি হ'তে হ'তে কিংবা কিছু পরে ঝড়ের ঝাপ্টায় ধূলিধূসরিত হয়ে জল আসতে আসতে দোকান বাড়ী বা গাড়ী বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করি। এ সব সময়ে বন্ধুর কথাটা থেকে থেকে মনে আসে। আকাশ ভেঙে জল পড়ে। ক্রমে রাস্তায় জল দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। গম্ভীর গর্জনে বাজ পড়ে। একটা আলো আঁধারি আবহাওয়া চারদিকে চেপে আসে। হাতের বই খাতা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সিগারেট টানি কিংবা বিড়ি। সঙ্গী সাথী থাকলে দুচারটে কথাবার্তা হয়। কখনও বা চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকি।

একদিন কাগজওয়ালা তার সাইকেল নিয়ে এসে দাঁড়ালো। সাইকেলটা আমার হাতে দিয়ে মাথা মুখ মুছে নিয়ে বল্লে, একটা বিড়ি হবে না কি ?

বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দিতে দিতে বল্লাম, কংগ্রাচুলেশন্ !

বিড়িটা ধরাতে গিয়ে থমকে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বল্লে, কি ব্যাপার ?

মুখ টিপে হাসলাম, বল্লাম, আনন্দের ব্যাপার, সুখের ব্যাপার, অনিন্দ্য সুন্দর সঙ্গিনী পেয়েছেন।

হাতের কাঠিটা ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে টান কয়েক বিড়িটা খেলে, কিন্তু কিছু বল্লেনা। আমি আবার কথাটা পাড়লাম, অবিশ্যি দুঃখের ধাক্কা সইতে হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত—কাগজওয়ালা আমার কথাটা পূর্ণ ক'রলে, মিলনান্তক।

একটু হেসে হাতের বিড়িটা একবার টোকা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে, হালে বাংলা ফিল্ম টিল্ম দেখে এসেছেন বুঝি ?

আমি কিছু বলতে বলতে নিজেই বলে উঠলো, বাংলা না হ'য়ে

বোম্বাইও হতে পারে। কি বলেন, বেশ জম জমাট প্লট! গরীব নায়ক আর বিদুষী অনিন্দ্য সুন্দরী প্রচুর বিত্তশালী নায়িকা।

থতমত খেয়ে গেলাম। ওর মনের গতি ঠিক আন্দাজ করতে না পেরে সরল ভাবে বল্লাম, খুশী হয়েই কংগ্রাচুলেশ্যন জানিয়েছি, আপনি আঘাত পাবেন জানলে ···

আঘাত! আমার কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, আঘাত কেন? আমি সত্যি বলছি। আমার নিজের কাছেই ব্যাপারটা বেশ ফিল্মি ধাঁচের লাগছে।

অন্য কেউ এ রকম বল্লে হয়তো জবাব দিতাম, লাগছে নাকি, বেশ বেশ! বা এই রকম কিছু বলে ঠাট্টা ক'রে কথাটার সমাপ্তি করতাম, কিন্তু কাগজওয়ালাকে সে কথাটা বলে উঠতে পারলামনা। হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলাম।

একটু পরে, কলেজে একটা জলসার ব্যবস্থা হচ্ছিল কাগজওয়ালা সেই কথা পাড়লে। বল্লে, জলসা না ক'রে একেবারে একটা কোন নাটক নামিয়ে দিলে পারতেন। দেখতে ভাল শুনতে ভাল।

ভাবলাম বলি ব্যবস্থার ভার আমার উপর নয়, কিন্তু সে কথা না বলে বল্লাম, জলসায় খরচ কম, তাতে কিছু উদবৃত্ত থাকবে।

মৃদু হাসলে কগজওয়ালা, বল্লে, উদবৃত্ত থাকবে বলে আপনি আশা করছেন?

জলসার ব্যবস্থা ক'রেছিল কমলাক্ষ। যথাসম্ভব কম ব্যয়ে গান আবৃত্তি আর বাজনার ব্যবস্থায় সে আর দু'চারটি ছেলে খুব লেগে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য উদবৃত্ত চাঁদার টাকাটা বন্ধুকে পাঠিয়ে দেবে। সে টাকায় কাজ খুব হয়তো এগোবে না, তবু একটু কিছু হবে ভেবে একরকম স্বস্তি মনে মনে পোষণ করছিলাম। কাগজওয়ালাকে প্রতি প্রশ্ন করলাম, আপনার কি মনে হয়? খরচ খরচাতো খুব নেই।

বিড়িটা নিভে গিয়েছিলো সেটা ধরিয়ে নিয়ে বল্লে, কি জানি হয়তো নেই। প্রতি বারই বর্ষার আগে মনে হয় এবারে বুঝি কিছু কম হবে।—তারপর একটু সশব্দ হাসির সঙ্গে বল্লে, বুঝতেই পারছেন বর্ষার জলে কাগজ যোগান কি হাঙ্গাম!

একটু চুপ থেকে সামান্য চিন্তিত ভাবে আবার বল্লে, যুগিয়ে দিয়েও কিছু কম নয়, ল্যাজ ছাড়া জন্তু নেই, লেজুর ছাড়া কাজ নেই।

হাসি পেল ওর কথার ভঙ্গীতে। বল্লাম নিচু গলায়, শ্রীমতী উপস্থিত থাকলে বলতো সিলি এণ্ড্ চিপ।

উঁ, এ্যা, যেন চমক লাগলো কাগজওয়ালার। বল্লে, তা হয়তো বলতো।

তারপর হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে বল্লে, ঠিক যে কি বলতো তা জানিনে। কুতো মনুষ্যাঃ নয়, বাঙ্গালী বলেই আমার পক্ষে বলা শক্ত।

চট্ ক'রে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে এক ঝটকায় বলে উঠলো, শেকস্পীয়রের বেনামীতে ঘোষনা করছিনা হে স্ত্রীলোক তুমি বড় পল্কা! কথাটা কি জানেন, কথাটা হচ্ছে, কি যে বলি···মুস্কিল কি জানেন এক মাকে ছাড়া আর তো কাউকে চিনিনা। বলা উচিত, জানিনা, তাও আবার মাকে শুধু মায়ের মতই জানি, তার বেশী জানার কথাও ভাবা শক্ত।···একটু চুপ থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে জুড়ে দিলে, অতএব স্ত্রীলোকতো শুধু নেশা, তার বেশী আর ক'জনের কাছে।

নিজের অজ্ঞাতেই কখন থেকে বড় গভীর ভাবে দেখছিলাম কাগজওয়ালাকে। ওর চোখের দৃষ্টি মুখের ভাব কপালের কুঞ্চন হাত কাটা জামা মাথার ঈষৎ অবিন্যস্ত চুল দেখছিলাম আমার মনের কোন গভীর থেকে স্থির ভাবে। দেখছিলামই শুনছিলাম কম। কিন্তু দেখা আর শোনায় বড় একটা তফাৎ বোধ হয় ছিলনা। সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাগজওয়ালা মৃদু হাসলে তারপর বল্লে, বাঙ্গালী, কি বলেন বাঙ্গালী নয়?

আমি প্রশ্ন করলাম, কে ?

কে নয় ?—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলে কাগজওয়ালা, আমরা সবাই। কে নয় ? আমি, আপনি, বঙ্কুবাবু, কমলাক্ষ, আশে পাশের সবাই। রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েন না। সত্যি বলছি রবীন্দ্রনাথও বাঙ্গালী। অত প্রচণ্ড তবু দেশকে ছেড়ে·· ···

আমি যেন সেদিন অপরাহ্ণে দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলাম, তাই রবীন্দ্রনাথে মন না দিয়ে প্রশ্ন করলাম, মালতী দেবী ?

উত্তর দিতে গিয়ে কাগজওয়ালা একটু চুপ থেকে বল্লে, বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, চলুন একটু চা খেয়ে নি।

ঝড় জল তখন সত্যি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাছাকাছি কোথাও চায়ের দোকান চোখে পড়লোনা। চল্লাম দুজনে জনবিরল ফুটপাত বেয়ে। কি রকম যেন নেশা লেগেছিল। তাকে নেশাই বলবো নাকি অন্য কিছু ? তাতে কৌতূহল আছে, মাদকতা আছে, উৎসাহ উদ্দীপনাও আছে। পাশে পাশে চলছি কিন্তু ভাবতে পারছি না, শুধু কি একটা উত্তেজনা যেন আমাকে পেয়ে বসেছে। তাই গভীর গম্ভীর ভাব ক'রে নীরবে কাগজওয়ালার সঙ্গে এসে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম। দু'পেয়ালা চা নিয়ে একটা টেবলে বসা গেল। কিন্তু কথাবার্তা বিশেষ নেই।

আজ প্রশ্ন করি সেটা কেন ? বুঝিবা দায়িত্ববোধ হয়েছিল জ্ঞানে, দায়িত্বজ্ঞান হয়নি কর্মে। দায়িত্বের বোঝা যেন নাগালে এসে গিয়েছে, মন তাই গুছিয়ে নিতে চায়। জ্ঞানে কর্মে অভিজ্ঞতায় যতটা পরিচয় পেয়েছি আমার আর বাইরের পৃথিবীর তা সব কিছু নিয়ে এবার বুঝি এমন একটা আরম্ভ যেখানে প্রতিটি কর্ম অর্থপূর্ণ, প্রতিটি কর্ম সম্ভাবনাময়, তাতে আগামী সময়ে স্বাক্ষর পড়ে।

অথচ সে আমার নয়। আমার নয় সেটা আজ সত্যি। সেদিন

কি ক'রে কি ভাবে না বুঝে না জেনে একটা সর্বময় একাত্মতা যেন পেয়ে বসলো,—বোধ হয় বা কাগজওয়ালাকে পেরিয়ে মালতী নামের কোন একটা মেয়েকেও পেরিয়ে সেদিন সেই চায়ের দোকানে একটা অভূতপূর্ব অনুভূতির সন্ধান পেলাম।

সে অনুভূতির নাম জানিনা। শুধু বস্তুবাদী মন বলে হিমালয়টা কার? তাওতো আমার। দেশে কালে পরিব্যপ্ত চিরচলমান আর পরিবর্তন মুখিন মানবিক সত্তা সেও তো আমার। আমার সেই আমিকে যেন একটুখানি জানলাম। আর আমার মুখোমুখি বসে কাগজওয়ালা চুপ চাপ খানিক চা খেয়ে কাপড়ের খুটে চশমাটা মুছে নিয়ে বল্লে, অভাব থেকে স্বভাবকে চিনি, তাই চিনলাম আমিও বাঙ্গালী।

আমি উত্তর দিলাম না, বুঝিবা কাগজওয়ালাকে তফাতে ঠেলে দিলাম। সমুদ্রের যে জল বরফ হয়ে ওঠে সেও জল আর যে জল পাশ কাটিয়ে বয়ে চলে সেও জল। বুঝিবা সেই অবিরাম চলার বেগে বাধা পড়লো। বেশ খানিকক্ষণ পরে বল্লাম, কিসের অভাব?

আগের কথাটা বলে ফেলে কাগজওয়ালা অন্য কিছু ভাবছিল, তাই আমার প্রশ্নের চট ক'রে কোন উত্তর না দিয়ে বল্লে, কোন্‌টা বলি? অভাব অনেক, এক নয় তাই অনেক।

আমি একটু হাসলাম, বল্লাম, ভাব নেই তাও অভাব, তাওতো হয়। হয় না?

কাগজওয়ালা মাথা নাড়লে, অ-ভাব নিয়ে তো কথাই চলেনা। যা নেই তা নেই, তা নিয়ে আর কথা কি। তারপর দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে থেকে ভ্রূ কুঁচকে কি যেন দেখলে। আমিও দেখলাম। একটি স্ত্রীলোক হরিণকে গাছের পাতা খাওয়াচ্ছে। তলায় কি একটা তেলের বিজ্ঞাপন। ক্যালেণ্ডার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চায়ের বাটিতে মুখ দিয়েছি কাগজওয়ালা বল্লে, আজ নয় একদিন

আপনাকে বলবো। কি যে বলবো তা জানিনা, শুধু আন্দাজ করি কি বলবো। বোধ হয় আমার কথা কিংবা আমার আর মালতীর কথা। Not that she is on angel, she is not,......একটু চুপ থেকে আবার বল্লে, তবু কাউকে বলতে ইচ্ছে হয়। এই, আর কিছু নয়।

আমার কানে কথাটা বাজলো। আর কিছু নয়, আর কিছু নয়। একটু হাসিও পেল, আরও যেন অনেক কিছু থাকবে। নাকি অনেক কিছু থাকতে পারে? আড়চোখে তাকালাম কাগজওয়ালার দিকে, ইচ্ছে হ'ল বলি আর কিছু নয়টা যে অনেক কিছু প্রায় সব কিছু সে খবরটা আজও জানতে পারেননি? কাগজওয়ালা মাথা ঈষৎ নিচু ক'রে আছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে খানিকটা, আলো পড়েছে তেরছা হয়ে। মুখের উপর ক্লান্তির একটা ছাপ আর আছে সাবলীল একটা দৃঢ়তা। কি রকম মায়া হ'ল। মুখটাই দেখলাম কিছু বলা হ'লনা। কাগজওয়ালা ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ তুলে বল্লো, আজ নয়, অন্য কোন দিন। চলুন ওঠা যাক।

বাইরে বেরিয়ে এসে কাগজওয়ালা চলে গেল। আমি হাঁটাপথে বাড়ী ফিরছি। কখনো বা পথের দিকে চোখ পড়ে। সে পথে পায়ের ছাপ থাকে না। সামনে তাকাই। অবিরাম জনস্রোত। সে স্রোতের কোন দিক নেই, যেন এলোমেলো ঘূর্ণি। তাকালাম আকাশের দিকে। আশ্চর্য্য, সে আকাশে আকাশবাণী নেই!

আকাশবাণী! কি জানি কি হ'ল, হঠাৎ বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম। চোখের জল বুঝি এসে পড়ে! সে যে বড় লজ্জার। একটা দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। তারপর পথ চলি। বর্ষার ভিজে পথ। আবার সেই পথ। শেষ বেলার বাতাস বইছে গলি পথে। আমি চলছি ত চলছি। কোথা দিয়ে কি ভাবে কত পথ পেরিয়ে কত ইমারত দালান বাড়ী পিছনে ফেলে কত

গাড়ী কত লোক জনের পাশ কাটিয়ে যখন রাত গভীর হয় আমি গঙ্গার ঘাটে পৌছই। ওপারে ঝাপ্‌সা আলো। এপারে জাহাজ ঘাটে নৌকোর ভিড়। মিটি মিটি আলো জ্বলে। দু হাঁটুতে মুখ রেখে আঁধারের দিকে তাকিয়ে থাকি। ওপরের আকাশে চাপ চাপ মেঘ। সে আকাশ বুঝি বেদনায় ভরা। রাত গভীর হয়। বুকটা দু' কনুইয়ের জোরে চেপে ধরি। ক্রমে চেতনার স্তরে যেন ঢেউ জাগে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। আকাশ বাতাস পরিব্যপ্ত এই ধরণীর দিকে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠি, বন্ধু, এ পৃথিবী আজও তোমার নয়!

দিন দুই জ্বরে ভুগে কলেজে আসতে খবরটা প্রথমে দিলে ইন্দু। কাগজওয়ালা আমাকে যেতে বলেছে কাগজের অফিসে। কাগজের অফিসের ভেতরে নয় বাইরে। ইন্দু বলতে বলতে রমেনও এসে বল্লো, আপনার মেসেই যেতাম আজ খবর দিতে।

ইন্দু বল্লো, আমিও যেতাম কলেজের পরে।

আমি এদের উত্তেজনাটা বুঝলাম কিন্তু কথাটা বুঝলাম না। প্রশ্ন করতে রমেন বল্লো, আশ্চর্য্য, জানেন না কাল থেকে ষ্ট্রাইক চলছে?

ষ্ট্রাইক চলছে মানে? বুঝিয়ে বলুন।—বল্লাম আমি। রমেন বল্লো, ষ্ট্রাইক মানে ষ্ট্রাইক। আমরা তো মানে আমাদের বাড়ীতেও কাগজ নেয়া বন্ধ ক'রেই দিয়েছে।

ইন্দু বল্লো, তুমি যেও কিন্তু। গলিতে ঢুকলেই দেখবে কাগজের অফিসের গেটের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। তাতে আমাদের শ্রীমানও আছে।

রমেন বল্লো, আমার কিন্তু মনে হয় ওর যোগ দেওয়া ঠিক হয় নি। কাগজের অফিসের লোকেরা ষ্ট্রাইক করেছে তাদের grievance

আছে। ও তো হকার ওর তাতে কি?

ইন্দু চশমার ভেতরে চোখ বড় বড় ক'রে বল্লো, ওর তাতে কি! এ আপনি কি বলছেন? ও কাগজ নিয়ে বেরুলেই তো মার খাবে।

রমেন হাত উল্টে বল্লো, এ কাগজ নিয়ে না বেরুলেই হয়। আর মারের কথা, মার তো এখনও খেতে পারে।

আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা এখন গেলে দেখা হবে মনে হয়?

রমেন বল্লো, নিশ্চয়। ওখানে সর্বক্ষণই আছেন। দুঃখু হয়। গরীব মানুষ। দু'পয়সা করছিল······

বাকি কথাটা শোনা গেল না। ইন্দুর কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কলেজের গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে বাসের অপেক্ষা করছি পেছন থেকে ডাকতে ডাকতে ইন্দু এসে হাজির। বল্লো, চলো আমিও যাচ্ছি।

আমি বল্লাম, আচ্ছা একটা কথা বুঝতে পারছি না। তোমাকে দিয়ে খবর পাঠালো কেন?

ইন্দু হাত দেখিয়ে বাস থামাতে থামাতে বল্লো, আমাদের বাড়ীটা ও গলিতেই। কাল সকালে বাজারে যাচ্ছি··· উঠলাম দুজনে বাসে। ফাঁকা একটা সিটে বসতে বসতে ইন্দু বল্লে, কদিন থেকেই গোলমাল চলছিল। আর আগেও কি নিয়ে খুব হৈ রৈ গেল ক'দিন। এবারেই একেবারে ষ্ট্রাইক, কাগজ অবিশ্যি বেরুচ্ছে। তবে খুব কম।

ব'লে ইন্দু চুপ হয়ে গেল। একটু পরে চমকে উঠে বল্লো, ও হ্যা, তোমাকে যা বলছিলাম। যাচ্ছি বাজারে দেখি গেটের সামনে খুব ভিড় আর হট্টগোল। বুঝতেই পারছ একদল হ'কার কাগজ নেবেই আর ওদিকে আমাদের বাঙ্গালী বাবুরা মিহি গলায় অনুনয় অনুরোধ

করছে। ওরই মধ্যে কিছু অবিশ্যি গায়ের জোরেই পথ আগলাচ্ছে। দাঁড়িয়ে গেলাম। ছোট গলি। ঐ ভিড়। এক যায়গায় দাঁড়াতেও পারি না। ধাক্কা খেয়ে সরে এসে আবার দাঁড়াই। আবার দেখি। আর এক ধাক্কা। দূর ছাই বলে সরে পড়বো অম্‌নি শুনি চেনা গলা। একটা টুল না বেঞ্চ কিসের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের শ্রীমান বক্তৃতা দিচ্ছে। স্রেফ্‌ হিন্দি ছাড়ছে। কিছু বুঝলাম, অনেকটাই বুঝলাম না। বোকার মত তাকিয়ে আছি। এ ছেলে এ সব বলে কি? কি বলছে জানো? বলছে আমি ভাই তোমাদের মত কাগজ বেচে খাই। দিনের রুটি হামভি মাংতা লেকিন ইন লোগোকো অর্থাৎ সাবএডিটর বাবুদের মেশিনম্যান কম্পোজিটর এদের সবাই আমাদের সঙ্গে ভাই ভাই। মোট কথা কেউ কাগজ নিও না। কে কার কথা শোনে? আবার লাগাও ধাক্কা। এবার সত্যি কেটে পড়ছিলাম। শ্রীমানের দিকে চোখ পড়তে দেখি দুহাত দিয়ে আমাকে ডাকছে। দু' মিনিটে বক্তৃতা শেষ করে ভিড় ঠেলে দৌড়ে এল আমার কাছে। তারপর বুঝলে ইঞ্জিনের ষ্টিমের মত বেরিয়ে এল একটা গালাগাল। বল্লাম, কি অপরাধ করেছি? কি যে সব বলে গেল ঝড়ের মত মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই। এ যেন একেবারে সে ছেলেই নয়। ঝপাং করে গলা নামিয়ে বল্লো, 'আসিস ভাই খবর নিতে।' তারপর তোমার কথা···

টার্মিনাসে বাস এসে দাঁড়িয়েছে। নেমে পড়লাম দুজনে। আমি বল্লাম্‌, কি নিয়ে ষ্ট্রাইক জানো?

ইন্দু বল্লো, প্রথমতো শুনেছিলাম মাইনে বৃদ্ধি, ছুটি ছাটা চাই, এইসব। পরে অবিশ্যি শুনলাম অন্য কথা। আচ্ছা বলো দেখি কাগজের মালিকগুলো কি চামার? শুনবে তাহ'লে? এরা যারা কাজ করে তারা নাকি দু'কাপ ক'রে চা চেয়েছিল। কে একজন উঁচুদরের সাবএডিটর সবার পক্ষ নিয়ে খোদ মালিককে অনুরোধ জানিয়েছিল

এক কাপের বদলে দু'কাপ চা দিতে। ব্যস্ মালিক তো ক্ষেপে লাল। সে ভদ্রলোক না কি এখানো সসপেণ্ড হয়ে আছেন। এই থেকেই শুরু হোল এবারের গোলমালের। শেষ পর্য্যন্ত সবাই মিলে উঠে পড়ে ষ্ট্রাইক কল দিয়ে বসেছে। আর সেই সঙ্গে এতদিনের যত কিছু অভিযোগ সব মীমাংসা চাই। আচ্ছা, কি হবে বলতো ?

কি যে বলবো ভেবে পেলামনা। তখনও এ ধরণের ষ্ট্রাইকের কথা খুব জানতাম না। জানতাম স্কুলের ছেলেরা কলেজের ছেলেরা কদাচিৎ কখনও রাজনৈতিক কারণে ষ্ট্রাইক ক'রে। কিন্তু মাইনে বাড়াও বলে ষ্ট্রাইকের কথাটা হয়তো শুনে থাকবো বিদেশের কোন সংবাদে এদেশে ও ব্যাপার একেবারে টাট্‌কা। বল্লাম, কি হবে কি করে বলবো ? তুমি বরং আমার চেয়ে অনেক বেশী জানো। কি হবে তুমিই বলো।

ইন্দু বল্লো, বড়দা বলে পুলিশ এলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কি জানি হবে হয়তো। আমার কি ইচ্ছে হয় জানো ইচ্ছে হয় ধরে ধরে শালাদের চাবকাই। এক কাপ চা দিতেও তোদের, কি বলে গিয়ে, না ও কাগজ আর ছোবোইনা।

বড় রাস্তা ছেড়ে ঢুকলাম গলিতে। খুব যে কিছু একটা ভাবছি তা নয়। ভাবছি কখনো এ কথা কখনো সে কথা। কাগজওয়ালা তো ষ্ট্রাইকে যোগ দিয়েছে। কিন্তু ওর কাজের কি হবে ? তাছাড়া যদি ষ্ট্রাইক ক'রে কাগজ কোম্পানির লোকেরা কিছুটা জিতেই যায় তাহ'লেই ওর কি সুবিধে ? তাছাড়া যদি মারধর হয় ? পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায় ? কত কিছুইতো হ'তে পারে,—কিন্তু এসব বাস্তব প্রশ্নের তলে তলে আমার মনে একটা বিস্মিত ভাবের বেশ টের পাচ্ছিলাম। পুরু লেন্সের চশমা চোখে এই যে ছেলেটিকে দেখে এসেছি এতদিন, জেনে এসেছি একরকম, সেও বক্তৃতা দেয়, ষ্ট্রাইকের ব্যাপারে রুখে

দাঁড়ায়,—এত দিন এ ছেলের এ পরিচয় তো পাইনি! একেবারেই কি পাই নি? মনে পড়লো এই কাগজওয়ালাই একদিন রমেশের কাকাকে চড় মেরেছিল। তবু বিস্ময়ের ভাবটা সত্যি।

গলির মোড় ঘুরে ছায়াঢাকা আরও ছোট আর একটা গলিতে পা দিতেই দূরের ভিড়টা চোখে পড়লো। বেলা প্রায় এগারোটা হবে। ভিড় আছে তবে হৈ হট্টগোল নেই। ভিড়ও দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল কাছে এসে দেখলাম অনেকটাই ছাড়া ছাড়া। শুধু কোলাপসিবল গেটের সঙ্গে যারা দাঁড়িয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে গায় গায়। ওরই একধারে কাগজওয়ালা দাঁড়িয়ে হাতের কি একটা ছাপানো কাগজ পড়ে দেখছে।

আমি আর ইন্দু কাছে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালাম। যায়গাটার আবহাওয়া বর্ণনা করা শক্ত। চারদিকে দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চাইছি রণক্ষেত্রের সঙ্গে এর মিলটা কোথায়। ইন্দু আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিলে। ওর দিক থেকে তাকালাম কাগজওয়ালার দিকে। দেখলাম সে এগিয়ে আসছে। সামনে এসে হাসিমুখে বল্লো, খবর পেলেন কখন?

ইন্দু বল্লে, খবর পেয়েই চলে এসেছে। কাল খবরটা দিতে পারিনি। ক্লাসে ওর মেসের ঠিকানা কেউ জানেনা। এক জানে রমেন বাবু। তাও আজ জানলাম। আজকে কলেজে আসতেই......। তারপর এখানে কি ব্যাপার? মারধর হয়নি তো?

কাগজওয়ালা বল্লো, হ'তে কতক্ষণ। আমার দিকে তাকিয়ে বল্লো, আপনাকে একবার আমাদের বাড়ী গিয়ে ব'লে আসতে হবে। একটু বুঝিয়ে বলবেন। বলবেন মাকে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

একটু থেমে আবার বল্লো, দু' একদিনের মধ্যেই যাহোক্ কিছু হবেই।

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে যেন কি একটা শুনলো কাগজওয়ালা এদিক ওদিক তাকিয়ে কি দেখলো। তারপর ওদের বাড়ীর নম্বর দিয়ে

হদি্শটা বুঝিয়ে দিলো। আমি মাথা নেড়ে জানালাম বুঝেছি। কিন্তু, গলা সাফ্ ক'রে বল্লাম, কিন্তু হঠাৎ এদের ট্রাইকে আপনি জুটলেন কেন?

কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে কাগজওয়ালা যেন কথাটা চেপে গিয়ে বল্লো, জুটে গেলাম। মন্দ কি, এওতো একটা Experience!

ইন্দু বলে উঠলো, হুঁ। এম্নি কিছু অভাব আছে নাকি? সাধ ক'রে আবার কে এসব ঘাড়ে নেয়। আমি তো জানি না বাবা!

কাগজওয়ালা বল্লো, সাধ ক'রে নিই বলেই কাগজ বেচি। তা নইলে নিশ্চয়ই ছাত্র মানুষ করতাম। সাধও আছে সাধ্যও আছে। তাই ঘাড়ে নি।

মৃদু হেসে বল্লাম, কত সাধতো আমাদেরও আছে। কিন্তু সাধ্য তো নেই।

কাগজওয়ালা কথা শেষ ক'রে দিলো, বল্লো, তর্ক আর একদিন হবে। আজ কিন্তু আপনাদের যেতে বলবো।

ইন্দু আমার হাতে টান দিয়ে বল্লো, চলো যাই। ওর সাধ মিটুক। আমরা বাধা দেবো না।

কাগজওয়ালা পকেট থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে আমার হাতে দিলে। আর একটা বার ক'রে নিজেও ধরালে। তারপর বিড়ি টানতে টানতে লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে আমরা ফিরে চল্লাম।

ইন্দু একবার পেছন ফিরে দেখে বল্লো, ওর কথা কোনদিন বুঝিনি আজও বুঝলাম না। একটা একনম্বর গোঁয়ার। বুঝলে গোঁয়ারতমি ছাড়া ও চলতে পারে না।

ইন্দু কাগজওয়ালাকে চেনে আমার আগে থেকে তাই চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে মীমাংসা করার অধিকার তার আছে। আমি তখনও সবেমাত্র চিনছি, পুরোনো মানুষ নূতন ক'রে গুছিয়ে নিচ্ছি, উত্তর দেওয়া হল না। ইন্দুই আবার বল্লো, খবরটা এবেলায়ই দিয়ে এসো।

বাড়ীতে মা রয়েছে ভাইবোন রয়েছে আর বাবু এখানে রাত ভোর ষ্ট্রাইক করছেন! বল দেখি বাড়ীতে এখন কি ব্যাপার? কি ভাবছে তারা? ষ্ট্রাইক করবে তা একটা খবর দিয়ে আয়। না বলা না কিছু! এলাম আর দাঁড়িয়ে গেলাম।

আমি বল্লাম, খবর হয়তো দিয়ে এসেছে। ষ্ট্রাইকে আসবার আগে নিশ্চয়ই কিছু বলে এসেছে। একেবারে হঠাৎ এসে হঠাৎই দাঁড়িয়ে গেছে এ হ'তে পারে না।

ইন্দু আমার কথা শুনতে শুনতেই আমাকে দেখে নিয়ে বল্লো, ওকে তো চেনো না, ঐ রকম। যাক্‌গে মরুকগে! পরীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত দেবে কিনা, কি মনে হয় দেবে?

বল্লাম, পরীক্ষা সম্ভব হ'লে নিশ্চয়ই দেবে। না দিলে কষ্ট ক'রে মাস মাস মাইনে দিচ্ছে কেন?

ইন্দু ফোঁস ক'রে শ্বাস ফেলে বল্লো, 'দিলেই ভাল।' তার পর যেন বড় একটা গম্ভীর মুখ ক'রে পথ চলতে লাগলো। কথা বাড়াতে আমারও ইচ্ছে হোল না। চুপচাপ এসে বাসে উঠলাম দু'জনে।

বাসেও বিশেষ কথাবার্তা হোলনা। কলেজের গলিতে ইন্দু নেমে গেলো। আমি নামলাম মেসের কাছে। বই খাতা মেসে রেখে কাগজওয়ালার বাড়ী যাব। কাগজওয়ালার বাড়ী গিয়ে কি বলবো, কি ভাবে বলবো, এই সব ভাবতে ভাবতে মেসে এসে দরজায় তালা খুলে ঢুকলাম ঘরে। বই খাতা রেখে সুটকেশ খুলছি দরজায় চটির শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি মালতী। মুখটা একটু শুক্‌নো, একটু দুশ্চিন্ত। আমি কিছু বলার আগেই তক্তপোষের উপর বিছানায় বসে পড়ে বল্লো, একগ্লাস জল খাওয়াতে পারেন।

কুজো থেকে জল গড়িয়ে দিয়ে বল্লাম, এই মাত্র এলেন, খুব ভাগ্যি আমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।

এক ঢোক জল খেয়ে মালতী বল্লো, এসেছি অনেকক্ষণ। পাশের ঘরে বসেছিলাম। আপনি আসতে দরজা খোলা পেয়ে এসে পড়লাম।

আবার খানিকটা জল খেয়ে গ্লাশটা নামিয়ে রেখে মালতী বল্লো, খবর জানেন? ওর খবর জানতেই এলাম।

বল্লাম, জানতাম না। এই মাত্র জেনে এলাম।

একটু চুপ থেকে বল্লাম, ষ্ট্রাইক হয়েছে। ষ্ট্রাইকে যোগ দিয়েছে। আমি কিছুই জানতাম না। আজই কলেজ থেকে জানলাম। তারপর এইমাত্র দেখা করে আসছি।

মালতী মাথা নেড়ে বল্লো, তাহ'লে এখনো পুলিশে ধরেনি মারধর হাঙ্গামাও হয়নি। ভাল। আপনি যাচ্ছিলেন কোথায়?

বল্লাম, যাচ্ছিলাম খবরটা পৌঁছে দিতে। মালতী উঠে পড়লো, বল্লো, চলুন। আমিও যাচ্ছি।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লাম, যাবেন ওর সঙ্গে দেখা করতে? মালতী একমুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বল্লো, বয়ে গেছে।

স্যুটকেশ থেকে গোটা কয় টাকা পকেটে পুরে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। একেবারে চুপচাপ যাওয়ার থেকে কিছু বলতে বলতে গেলে যেন অস্বস্তির ভারটা কম লাগে। মালতী অবিশ্যি বলছেনা কিছুই, কিছু যেন বলবার নেই। আমি বল্লাম, ওর বাড়ীতে বোধ হয় জানতোই।

মালতী মাথা নেড়ে বল্লো, হ্যাঁ, জানতো বাড়ী না ফিরলেও ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু……

কিন্তু ব'লে চুপ করে রইলো। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, আপনিও জানতেন?

চোখ দুটো কুঁচ্‌কিয়ে আমার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বল্লো, কি জানবো? বাড়ীঘর ফেলে কাজকর্ম ছেড়ে ষ্ট্রাইক করছে? কিসের

ষ্ট্রাইক? তা জানি না। কেন ষ্ট্রাইক, তাও জানি না। কি হবে এতে,—আচ্ছা বলতে পারেন কি হবে এতে?

. মাথা নেড়ে জানালাম বলতে পারি না। আমি অন্যকথা পাড়লাম, আপনি কি ওদের বাড়ী হ'য়ে আসছেন?

তার মানে? প্রশ্ন করলো মালতী। ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। শুনলাম দুদিন বাড়ীমুখো হয়নি।

চুপ হয়ে গেল মালতী। কথা বলার মত খুঁজে পেলাম অনেক কিছু, কিন্তু মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হোল যা-ই বলিনা কেন সবই বুঝি ফাঁকা লাগবে। যেন ধোঁকা দেওয়া হবে। সমাজের রীতি বোধ হয় সুসময়ে দুঃসময়ে কিছু বলা। সে রীতি যেন চাপ দিয়ে আমাকে কথা বলাবে, সান্ত্বনার কথা—নিশ্চিন্ত করার কথা। কিন্তু কি যেন ছিল মেয়েটার মুখে যেটা বুঝতে পারলাম না, শুধু অনুভব করলাম। মনে মনে যখন এমনি একটা দ্বন্দ্ব চলছে মালতী বল্লো, জানেন? শুনে অবধি ভয়ে ভয়ে আছি।

এ কথার উত্তর নেই। মাথা নেড়ে বোধ হয় কিছু একটা জানিয়েছিলাম। . বড় রাস্তায় পা দিয়ে সহজ কথা পাড়লাম, বাড়ী ফিরবেন?

মালতী বল্লো, ওর বাড়ী? আপনি তো যাচ্ছেন। চলুন আমিও যাবো।

দক্ষিণ মুখো বাসে উঠে পড়লাম দুজনে। একটা লেডিজ সিটে বসলো মালতী আমি বসলাম দূরে। টিকিট কিনে নিয়ে আচমকা খেয়াল হলো কাগজওয়ালার বাড়ী এই প্রথম যাচ্ছি। ওর মা ভাই বোনের সঙ্গে পরিচয় আমার নেই। ওদের চোখে আমি লোকটা কেমন ঠেকবো স্বভাবতই সে কথা মনে আসে কিন্তু তার চেয়ে আর একটা কথা জানবার কৌতুহলটা যেন বেশী হয়ে পড়লো। ওদের চোখে কাগজওয়ালার

পরিচয়টা কি ? এক কাগজওয়ালাকে চিনি আমি। তাকেই আবার মালতীও চেনে অন্য দৃষ্টিতে। আর আছে এরা যারা তাকে দেখে আসছে শৈশব থেকে। বোধ হয় ইন্দুর মত ওরাও কাগজওযালার স্ত্রাইকে যোগ দেওয়াটা অবাক বিস্ময়ে দেখবেনা, দেখবেনা মালতীর মত ভয়ে ভয়ে। কাগজ বেচে অন্ন সংগ্রহ করে এওতো আমার ক'ছে যেন কি রকম লাগে। সরল ভাবে স্বীকার করলাম ছেলে পড়ানোর কাজটা যেন দূরের নয়। কিন্তু এই বাড়ী বাড়ী কাগজ যোগান যেন স্বজাতীয় কাজ নয়।

পিঠের উপর মৃদু চাপ পড়তেই মালতীর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলাম বাস্ থেকে। বড়রাস্তা ছেড়ে অলিগুলি ঘুরে বস্তি অঞ্চলে এসে বাঁক ঘুরে খোলার চালের মেটে একটা বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল মালতী। পেছনে দাঁড়িয়ে বল্লাম আমি, আপনি সঙ্গে না এলে এ ঠিকানা খুঁজে পাওয়া শক্ত হোত।

কড়ায় হাত দিযে মালতী বল্লো, শক্ত নয়, খুঁজে পেতেন না।

দরজা খুলে দিলেন একজন বিধবা মহিলা। মহিলাকে অনুসরণ ক'রে আমরা বাঁদিকের একটা দরজা দিযে ঘরে ঢুকলাম। ঘরের দুদিকে দুটো তক্তপোশ। দেয়াল ঘেঁযে একটা টেবিল। ওদিকে একটা কোণের দিকে আর একটা দরজা। খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরটার খানিকটা চোখে পড়লো। ও ঘরটা গলির ওপরে। আন্দাজ করলাম ওটাই কাগজ-ওয়ালার ঘর। তক্তপোশের উপর বসলাম আমি। মহিলা বসলেন বিপরীত দিকের তক্তপোশের উপর। তার পাশে বসলো মালতী।

বাড়ীটা, পাড়াটা আশ্চর্য নীরব। বেলা ক'টা হবে বুঝলাম না। দূরের রাস্তা থেকে কদাচিৎ গাড়ীর আওয়াজ ভেসে আসছে। এখানে ঘরে বসে মহিলা আমাকে লক্ষ্য করছেন। সে মুখে হাসিও নেই গাম্ভীর্যও নেই। সে এক সাধারণ মুখ। সে দৃষ্টিতে ঔৎসুক্য নেই আছে একটা

উজ্জ্বল ভাব। আচম্‌কা একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে তিনি মালতীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, খবর কিছু পেলি ?

মালতী মাথা নেড়ে আমার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বল্লো, ওর কাছে।

আমি বল্লাম, আজকেই কলেজে গিয়ে আমি জানতে পারলাম। দিন দুই কলেজে যাইনি। আজকে গিয়ে দেখা ক'রে এসেছি। বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে আমাকে দেখা ক'রতে বল্লো। ভালই আছে।

বলে চুপ করলাম। আর কিছু বলার আছে বলে মনে হলনা। অথচ এ দুটি নারী এমন একাগ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে যে আমাকে যেন নীরবে খুঁজে দেখতে হোলো এ আমি কোথায়। এরা দুজনেই জানতে চায় শুনতে চায় আমাকে দিয়ে দূরের কাগজওয়ালাকে বুঝতে চায়। কিন্তু কি জানতে চায় ? আর কতটাই বা আমি জানি ?

এইটুকু নীরব থেকে আবার বল্লাম, ভালই আছে। সঙ্গে আরও অনেকেই আছে। আমার তো মনে হয় ভয়ের কিছু নেই।

কাগজওয়ালার মা বল্লেন, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ও বাড়ী ফিরবে কখন ?

মালতী বল্লো, দুদিন হয়ে গেল বাড়ী ফেরেনি। একটু চুপ থেকে আবার বল্লো, আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞেস ক'রবেন বাড়ী ফিরতে বাধা কোথায় ? তারপর মায়ের দিকে ঘুরে, না কি আমি একবার যাবো ? এ আমার ভাল লাগে না।

কাগজওয়ালার মা মালতীর দিকে একটু ঘুরে বসে বললেন, যেতে হোলে আমি যেতাম। শুধু রেগে যাবে। আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বল্লেন, তুমি তো ওর বন্ধু জিজ্ঞেস করো কি চায় ও ? কিসে ওর শান্তি ?

চকিতে মালতীর দিকে চোখ পড়তে দেখলাম সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে যেন উত্তরটা আমার মুখেই লেখা রয়েছে যেন আমার গোপনে আমার ভেতরে এর কোন ইঙ্গিত সে খুঁজে পাবে কিংবা

পেতে পারে। আমি মহিলার দিকে তাকিয়ে বল্লাম, জিজ্ঞেস করবো।

মালতী ঠোঁট উল্টে বল্লো, জবাবটা এখানে জানিয়ে যাবেন। দামী কথা বলবে নিশ্চয়। বাঁধিয়ে তুলে রাখা যাবে।

কাগজওয়ালার মা সামান্য হেসে বল্লেন, রেগে গিয়েছিস্। রেগে যাওয়ারই কথা। আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, আমার কিন্তু রাগ হয়নি। আমি তো ওকে চিনি। একটু চুপ থেকে বল্লেন, দেখা হলে বলো রাগ আমার এতটুকুও হয় নি। ভয় একটু পেয়েছিলাম। তা ভয় পেলেই বা কি হবে? ওকে বুঝতে বুঝতেই আমার দিন গেল।

বলতে বলতে যেন চুপ হয়ে গেলেন। মনে মনে বড় বিস্ময় বোধ করলাম। চোখ খুলে দেখলাম মালতী মহিলার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে নিয়ে হঠাৎ উঠে পড়লো। আমার দিকে তাকিয়ে বল্লো, চা খাবেন?

সেদিনের কাথাবার্তা সেখানেই শেষ। চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মালতী থেকে গেল। বেরুবার মুখে বল্লো, পথ চিনে যেতে পারবেন?

বল্লাম, যেতে পারবো। আবার আসতেও পারবো। আচ্ছা চলি।

পথে বেরিয়ে মনে হলো আমার কাঁধে যেন বোঝা চেপে গেছে। দায়িত্বের বোঝা বয়ে নেবার মত মনের বয়স তখন নয়, অন্ততঃ সে বয়সে ওটা এড়িয়ে যাবার দিকে দৃষ্টি থাকে প্রখর, কিন্তু এক্ষেত্রে অতি অনায়াসে দায় এসে জুটলো। এড়াবার দিকে নজর ছিলনা প্রাণপণে স্বীকার করার দিকেও নয়। বোঝা গেল বিশেষ কিছু করায় নয় বিশেষ কিছু বলায়ও নয় শুধু খেয়াল রেখে এই দুই নারীর যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজনে সাধ্যমত সাহায্য করতে পারলে মনটা আমার খুশী হবে। অথচ এরই মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাবও ছিল। অনেক পরে একদা অন্য কোন একটা ঘটনার মাধ্যমে বুঝেছিলাম এ অস্বস্তির মূলে ছিল একটা দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্ব আমার নয়। দ্বন্দ্ব এই দুই নারীর,উদ্দেশ্যে বরং বলবো এদের দুই জনের জল্পনা কল্পনার ধারায়। এরা দু'জনে মিলে যেন ষড়যন্ত্র করছিল অথচ ধারা তাদের ভিন্নমুখি। দুজনেই চায় ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তারপর কোন পথে গতি হবে কগেজওযালার ? বুঝিবা এই নিয়ে তাদের মতের মিল ছিলনা।

ফেরার পথে বাসে বসে অবিশ্যি এসব ভাবছিলাম না ভাবছিলাম মহিলার কথা। যেন বেশ ক'রে দেখছিলাম মুখের চেহারা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ চিকন মুখের গড়ন। একদা সুন্দর প্রৌঢ়া বিধবার স্বাস্থ্য প্রশংসনীয়। ঝক্ ঝকে দুপাটি দাঁত। চুলে সামান্য পাক ধরেছে আর কাল চোখ। নাক আর চিবুকের গড়নে কি যেন একটা দুর্বল ভাব। কর্মপটু এবং কর্মঠ হাত দুটোয় একটা স্তিমিত গতি, কিন্তু ক্লান্তি প্রায় নেই। এই তো মোটামুটি দেখলাম। অথচ যা দেখতে গিয়েছিলাম কাগজওয়ালার পরিচয় সেটা তো খুব খেয়াল করিনি কিংবা হয়তো খেয়াল ক'রেও স্বীকার করছিলাম না! 'কি চায় ও? কিসে ওর শান্তি?' এ প্রশ্ন তো করে সবাই ক্ষুব্ধ মনে। উত্তর কেউ দিয়ে দেয়না আর উত্তর পেলেই বা কি সুবিধে? সেদিন ও প্রশ্নের উত্তর আমি ভেবেছিলাম সাধারণ ভাবে বাক্চাতুরির ছোঁয়াচ রেখে। ও যাতে শান্তি পাবে তাতেই ও মন দেবে। কোনদিনই কারও চাওয়া কি এত স্পষ্ট যে অপর কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় নাকি কোনদিন কোন মানুষ নিজেই খুব বুঝতে পারে? যারা পারে—অনেকে হয়তো পারে—তাদের বুঝতে প্রশ্ন ক'রতেও হয়না উত্তরের অপেক্ষাও করতে হয় না। কাগজওয়ালা কি চায়, কি পেলে তার শান্তি, এমন ব্যাপক কোন প্রশ্ন আমার মনে আসতোনা কোনদিনই। সেদিন ওর মায়ের কাছে আমি এইটে নূতন ক'রে পেলাম। এই যে কাগজওয়ালা সেও কিছু চায় বোধ হয় বা সমগ্র জীবন দিয়েই চায়।

পরদিন সকালে ছাত্রকে চট্‌পট্ ছুটি দিয়ে ছুটলাম সেই কাগজের

অফিসে। ভিড় প্রায় নেই। গলির মোড়ে এখানে ওখানে কিছু জটলা চলছে। তাই থেকে শুনলাম শেষ রাত্তিরে ছোটখাট মারামারি হয়ে গিয়েছে। দু' চারজন সামান্য আহত হয়েছে। এখন অবস্থা শান্ত বটে কিন্তু কি রকম একটা কি হয় কি হয় ভাব। একটু পা চালিয়ে গেটের কাছাকাছি আসতে চোখে পড়লো কাগজওয়ালা প্রায় কালকের যায়গাতেই দাঁড়িয়ে। মনে মনে শেষবারের মত বলার কথাগুলি গুছিয়ে নিয়ে কাছাকাছি যেতেই কাগজওয়ালা এগিয়ে এলো, বল্লো, চলুন।

উল্টোদিকে খানিকটা এগিয়ে একটা চায়ের দোকানে এসে বসলাম দুজনে। এইবার আমার গুছনো কথাগুলি বলবো। কিন্তু বলতে গিয়ে আর ভাষা খুঁজে পাইনা। একটু ইতস্ততঃ ক'রে সহজ প্রশ্ন করলাম, কাল রাত্তিরটা কি রকম কাটলো ?

কাগজওয়ালা মৃদু হেসে বল্লো, আপনাকে ধন্যবাদ। কাল রাত্তিরে বাড়ী গিয়েছিলাম। বাড়ীতেই ছিলাম। অতএব ভালই কেটেছে রাতটা।

প্রশ্ন করলাম একটু খুশী মনে, আমাকে ধন্যবাদ কেন ?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বল্লো, বাড়ীতে খবরটা পৌঁছে দিয়েছেন। তার জন্যে ত বটেই। তাছাড়া মা তো খুব খুশী। আপনার মত ছেলে না কি হয় না।

হেসে বল্লাম, সে তো বটেই আমি তো ষ্ট্রাইক করিনি।

কাগজওয়ালা ভ্রূ কুঁচকে বল্লো, ষ্ট্রাইক কি আমিই করেছি নাকি ?

আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বল্লো, ষ্ট্রাইক আমিও করিনি। খোঁজ ক'রে দেখুনগে আমার যারা খদ্দের তাদের বাড়ী বাড়ী কাগজ ঠিক পৌঁছে গেছে। না না এটা নয়, এতো প্রায় ছাপাই হচ্ছে না।

আবার চায়ে চুমুক দিয়ে বল্লো কাগজওয়ালা, ষ্ট্রাইক যারা করেছে

এখন মনে হচ্ছে তারাও বুঝি শেষ পর্যন্ত টিকছে না। এ শুধু হুমকি।" হঠাৎ যেন নাড়া খেয়ে বলে উঠলো কাগজওয়ালা, আমার কি মনে হয় জানেন? এও একেবারে ফেলে দেওয়ার মত নয়।

আমি চাপা গলায় বল্লাম, মারামারি না কি হয়ে গিয়েছে?

কাগজওয়ালা মাথা নেড়ে বল্লো, তার পরেই আমি এসেছি। এখন সরকারি রোষের অপেক্ষা। সেটাতো আর বাদ দেওয়া চলেনা।

আমি বল্লাম, সরকারি রোষ মানে তো পুলিশের অত্যাচার? তাকে বাদ দিতে পারলে আর সাধ করে গলায় ঝুলিয়ে কি এগোবে?

কাগজওয়ালা বেশ খানিকক্ষণ আমার প্রশ্নটা যেন তলিয়ে দেখে নিল। তারপর বিড়ি ধরিয়ে বল্লো, যুক্তির বিচারে বুঝিয়ে বলা যায় এগোবে অনেকটা। আবার এও দেখানো চলে এগোবেনা কিছুই। উপস্থিত যে উদ্দেশ্যে ষ্ট্রাইক তা হয় তো কিছুই এগোবেনা। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে লড়াইটা একটা অতি অবশ্য ব্যাপার। সেটা এড়িয়ে না গিয়ে মুখো-মুখি হ'লে অন্ততঃ ভয়টা কমে, তাতে পরের দিকে কাজ সহজ হয়। এই হোল আমার বিচার। ভেবে দেখবেন ব্যাপারটা জটিল। আর এও ভেবে দেখবেন পুলিশের সঙ্গে লড়াইটা অনেক ক্ষেত্রেই অতি ভয়ের সীমায় ছড়িয়ে পড়ে। ভয় থেকে মানুষ বুদ্ধির বিচারে কাজের পথ খুঁজে দেখে কিন্তু অতি ভয় মানুষকে বোকা বানিয়ে ফেলে। আমার তো মনে হয় পুলিশকে ভয় পাওয়ার চেয়ে অতি ভয়টাই অনেক বেশী সত্যি এবং সেটাই বিপদের।

বিড়ি নিভে গিয়েছিল সেটা ধরিয়ে নিয়ে আবার বল্লো, কিন্তু পুলিশের কথাটাই ভাবছেন আর আমরা যারা রুখে দাঁড়িয়েছি তাদের কথাটাও ভাবুন। পুলিশ একজোট, আমরাও কি তাই? পুলিশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকাশ। আমরা বলি আমরা লাঞ্ছিত বঞ্চিত জনগণের প্রতীক তাদেরই প্রকাশ। কথাটা মুখে বলি আর কাজেও তাই করি বা করার

চেষ্টা করি। এ পর্যন্ত ভাবনাটা সরল। এ সব কথা বলতে ভাল শুনতে ভাল। বলা আর শোনা প্রায় এ দু'য়েতেই ছিলাম এতদিন। কাজে নেমে দেখি একেবারে আলাদা। যা শুনেছি তার সঙ্গে এর জাত আলাদা। আমরা মনে করুন হাজার লোক না হোক শ পাঁচেক ত' বটেই। পাঁচশ জন লোক বঞ্চনার ঠেলায় একসঙ্গে ষ্ট্রাইক করলাম। ভাবলাম আমরা একজোট। বক্তৃতা দিলাম, চাঁদা তুললাম, কমিটি করলাম। মন আমাদের বাঁধা রইলো মাইনে বাড়ানোয়। এ এক শক্তির পরীক্ষা। নেমে পড়লাম কোমর বেঁধে। কি বলে গিয়ে জনতার জঙ্গী আওয়াজ তুললাম, তারপর দেখি গোড়ায় একটা ভুল হয়েছে। আমরা পাঁচশ জন পাঁচশটা জন। সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে একত্রিত হয়েছি বটে, কিন্তু ছিট্‌কিয়ে বেরিয়ে যেতে কতক্ষণ।

আরও যেন কি সব বলেছিল কাগজওয়ালা সেদিন সেই চায়ের দোকানে। কথাগুলি এমন কি শব্দগুলি পর্যন্ত আমার মনে চমক তুলেছিল। কি যে বলছে সে সেটা বুঝি না বুঝি এমন নূতন কথা তখন পর্যন্ত বড় একটা শুনিনি। কোথায় যেন এরই মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে সব আমরা পেয়েছি প্রায হাতের মুঠোয় কিন্তু মুঠো করতে গিয়ে হাত আর মুঠো হয় না। এ যেন কি এক মহৎ বাণী বহন করছে প্রায় আকাশ-বাণীর মত। সেদিন ওর সব কথাই যে বুঝতে পেরেছিলাম এমন নয়। কিন্তু পরবর্তী দীর্ঘকালে অনেক কিছু ঘনিষ্ঠভাবে বুঝবার দেখবার জানবার ইঙ্গিত দিয়েছিল।

আমি হলাম মাটির পৃথিবীর সাধারণ মানুষ। কাগজওয়ালার মত অত উঁচুতে উড়ে বেড়াবার সাধ ছিল না। তাই তার সমস্ত কথার পর আমি বোধ হয় একটা সাধারণ প্রশ্নই করেছিলাম, কিন্তু পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেলে তখন কর্তব্যটা কি?

কাগজওয়ালা প্রশ্নটাকে বিশেষ কোন আমলই দিলে না, বল্লো, ও।

সে তখন দেখা যাবে।

ইতস্ততঃ করে উঠবার মুখে আর একটা প্রশ্ন ক'রে বসলাম, এবার তাহ'লে পরীক্ষাটা দিচ্ছেন তো ?

দোকান থেকে বাইরে বেরুতে বেরুতে কাগজওয়ালা ঠাট্টাও করলো না বক্রোক্তিও করলো, সরলভাবে বল্লো, প্রাণপণ চেষ্টা করবো।

ঐটুক সম্বল নিয়ে ফিরে এলাম মেসে। সম্বলটা আমার নয়। সম্বলটা নিয়ে এলাম মালতীর জন্যেই সবটা আর কিছুটা ওর মায়ের জন্যে। বিশ্বাস আমার ছিল কাগজওয়ালা পরীক্ষা দেবে। কিন্তু ভয় ছিল ঐ পুলিশের ব্যাপারটা নিয়ে। যে দিনের কথা লিখছি তখন দেশ স্বাধীন হয়নি। তবে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখাটা বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে পুলিশের অদম্য ধ্বংসপ্রবৃত্তির জন্য একটা আধি-ভৌতিক ভয় ছিল সর্বত্র সব ব্যাপারে। এ যেন এক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা। এযে কোথা দিয়ে কি ভাবে কাজ করবে তার কোন হদিশ করা মানুষের চিন্তার বাইরের ব্যাপার। অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাও বটে আবার প্রাগৈতিহাসিক যুগের বর্বরতাও বটে। গল্পে আছে অন্যায় অধিকার বজায় রাখতে যাদুকর সৃষ্টি করে অতি ক্ষমতাবান এক দৈত্য। ইংরেজ সেই দৈত্য সৃষ্টি করেছিল পুষ্টি দিয়েছিল। তারপর ইংরেজ চলে গেল, কিন্তু তার সৃষ্ট সেই দৈত্যটিকে রেখে গেল। ভয় আজও আছে, তবে হয়তো আজকের মানুষের সেই সঙ্গে একটা আশাও আছে হয় তো একদিন ভয় দূর হবে।

সেদিন সেরকম আশা করার কোন পথ ছিল না। কিন্তু কাগজওয়ালাকে নিয়ে পুলিশের ভয়টা ছিল নূতন ধরণের। আশৈশব জানতাম আমরা পরাধীন এবং জাতীয় চিন্তার সীমান্ত ছিল দেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত। অর্থাৎ কোন রকমে লড়াই ক'রে কষ্ট দুঃখ ক'রে ইংরেজকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই এ জীবনের দেশের জন্য চরম কর্তব্য

করা হ'য়ে যাবে। এ লড়াইয়ে যে সরাসরি যোগ দিতে পারলোনা সে পারলোনা ব'লেই লজ্জিত যেন পরমকর্তব্য থেকে বিচ্যুত, আর যে পারলো সে তার ঐ এক কর্তব্য পালনের দোহাই দিয়ে আর সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত। দেশের স্বাধীনতার যে সীমান্ত কাগজওয়ালা তার চেয়েও দূরে নূতন এক সীমান্ত আমাকে নির্দেশ ক'রে দেখালে। হঠাৎ যেন চিন্তার জগৎটা বড় দূর ছড়িয়ে পড়লো, এ একেবারে নূতন আলো। সে আলোকে দেখতে গিয়ে অনেক কিছু নূতন দেখলাম। কিন্তু এক্ষেত্রে যে পুলিশের তাণ্ডব কি রূপ নেবে সেটা বুঝে উঠলাম না। তবু পুলিশ আসতে পারে এটাই যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ ঘটালো।

বেশ একটু দুশ্চিন্তা নিয়েই গেলাম কলেজে। দেখলাম কলেজ বেশ চলছে। আমি যেন ভেবেছিলাম কলেজে গিয়ে দেখবো কলেজটা চলছেনা। হয়তো এটা ছেলেমানুষি, হয়তো এমনি হয়। যার যার জগৎটাকে সর্বত্র দেখতে পাওয়ার আশাটাই মানুষের স্বভাব। কলেজ চলছে। ক্লাশ হচ্ছে। শুধু ইন্দু এক ফাঁকে একবার জানতে চাইলো, কি হোল ? অনেক কথা বলার অবকাশ ছিলনা। বল্লাম, মন্দ কিছু ঘটেনি।

একটা ক্লাশ শেষ হয়ে আর একটা আরম্ভ হওয়ার ফাঁকে রমেন একটু হেলতে দুলতে এসে আমাকে বল্লো, কি হোল, গিযেছিলেন ষ্ট্রাইক দেখতে ?

বল্লাম, হু , গিযেছিলাম।

রমেন ফিক ক'রে হেসে বল্লে, শুনলাম সব। কর্তৃপক্ষেরও যথেষ্ট বলার আছে। একটু থেমে বল্লো, এ ষ্ট্রাইক টিকবেনা।

চটি বাজাতে বাজাতে উঠে আসছিল রমাপতি। হাঁক দিয়ে সে বল্লো, কি টিকবেনা ? গুজ্ গুজ্ করছো কি ? ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র সব। কোন sense of responsibility নেই, শুধু গল্প আর কথা।

বলতে বলতে প্রফেসর এসে যেতে রমাপতি জিভ্ কেটে একটা

সিটে বসে পড়লো। শুরু হোল ক্লাশ। ভাল লাগছিলনা ক্লাশ। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখছিলাম। চোখে পড়লো গ্যালারির শেষ সারিতে বসে আছে রমেশ। কবে এসেছে, কখন এসেছে জানতাম না। চেহারাটা বেশ বাগিয়ে এনেছে। রমেশকে দেখছি আর মনে মনে একটা ভাবনা ঢেউ তুলে যাচ্ছে। রমেশ হচ্ছে মালতীর ভাই। মালতী তার পথ নিয়েছে। এখন রমেশ কি করবে,—এই ভাবনাটা, বলা ভাল আশঙ্কাটা মনে দুর্ভাবনার সৃষ্টি করলো।

সেদিনের ক্লাশটা মনে রয়েছে আমার আর একটি কারণে। সেই ক্লাশেই বোধ হয় আমার ছাত্র বন্ধুরা নূতন ক'রে আবিষ্কার করলো বঙ্কুবিহারী ক্লাশে অনুপস্থিত। অনুপস্থিত সে অনেকদিন। কিন্তু সে যে অনুপস্থিত একটা বিশেষ কারণে এবং এ অবস্থায় আমাদের যে অনেক কিছু করার আছে এই কর্তব্য বোধটা যেন হঠাৎ জেগে উঠলো। এর পূর্বেও এ নিয়ে প্রস্তাব উঠেছে। প্রস্তাব অনুসারে কিছু একটা করার চেষ্টাও হয়েছে। তারপর কি কারণে জানিনা সে চেষ্টা খুব একটা এগোয় নি। তখন ছিল কমলাক্ষ। আজও সে আছে। কিন্তু সেদিনের কমলাক্ষের যে তাগিদ ছিল আজ সেটা নেই।

আজ যখন নূতন ক'রে প্রস্তাব করা হ'লো তখন বোধ হয় সেদিনের ব্যর্থতার কথাটা গোপনে উৎসাহের সঞ্চার করলো। আজকে আর ব্যর্থ হলে চলবেনা। এম্‌নি একটা জোর নিয়ে প্রস্তাব উঠলো ডক্টর ঘোষের ক্লাশে। কে করেছিলো প্রথম প্রস্তাব, প্রস্তাবটা ঠিক কি ছিল আজ মনে পড়েনা। কিন্তু সৌম্য শান্ত ডক্টর ঘোষের অভিমতটা মোটামুটি মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, গোড়ার কারণ খুঁজতে যেওনা, সেটা উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন কাজে আসবে না। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও আমি বলছি অনেক সময় উপস্থিত কর্তব্যটাই বড় কথা। বঙ্কু কি ক'রে অসুস্থ হ'য়ে

পড়লো, কি ক'রে কি হ'লে সে সুস্থ থাকতো সে বড় জটিল। রাদারকোর্ডের গবেষণার চেয়েও জটিল। মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষা চালিয়ে এ সব সমস্যার মোট চিত্রটা পাওয়া যায় না, কারণ এখানে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ মিশে আছে। ব্যক্তিকে আলাদা ক'রে নিয়ে পরীক্ষা ক'রলেও ভুল আবার সমাজের অংশমাত্র সেদিক থেকেও ভুল। অতএব সে রকম চেষ্টা তোমরা ক'রোনা। যদি পার তাহ'লে বন্ধুকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করো। সেটা একটা কাজের মত কাজ হবে। কিভাবে ওকে ফিরিয়ে আনবে সেটা তোমাদের বিচারের বিষয়। প্রযোজনে আমার সাহায্য পেতে পার। কিন্তু মূলতঃ কাজটা তোমাদের।

ডক্টর ঘোষ আমাদের জেনারেল ফিজিক্স পড়াতেন। সে পড়ানোয় থাকতো অনেক কিছু। তিনি যা পড়াতেন সেটা বুঝি বা না বুঝি তিনি যা বলতেন সেটা বেশ সরল আর স্পষ্ট ছাপ রাখতো আমাদের উপর। বন্ধুকে নিয়ে তিনি যা বল্লেন তার ফলে ক্লাশময় আমরা গুম হ'য়ে বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ রমাপতি উঠে দাঁড়িয়ে ছোট খাট একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেল্লো। ঠিক হ'লো একটা কমিটি হবে। এবং এই কমিটিতে কে থাকবে আর না থাকবে কি করবে এবং কি ভাবে করবে ইত্যাদি গুরুতর প্রশ্নের সমাধানের জন্য পরদিন আর একটা মিটিং ডাকা হোল। ডক্টর ঘোষ বেশ খুশী হলেন। Organised হ'য়ে কিছু করার চেষ্টাকে তিনি প্রশংসা করলেন, কিন্তু পরদিন মিটিংয়ে তিনি থাকতে পারবেন না সে কথাও জানিয়ে দিলেন।

এইভাবে বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য যে চেষ্টার সূত্রপাত একদিক থেকে সে ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, আবার অন্যদিক থেকে সে ইতিহাস অন্য সব ইতিহাসের মতই অতি দীর্ঘ এবং জট পাকানো।

সে ইতিহাসের সবটা আমার জানা নেই। অনেক কিছু ভুলে গিয়েছি আর যতটা মনে আছে তার সবটা আমার এ লিপিতে দেওয়ার খুব প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ধৈর্যের সঙ্গে এই সূত্রে অনেক ছোট খাট ঘটনা অনেক বৈচিত্রময় চরিত্রের উত্থান এবং পতন এক সময় লিখেছিলাম, কিন্তু তাতে বন্ধুর কথা সামান্য। সে ইতিহাস থেকে পাওয়া চলে শুধুমাত্র সেদিনের কলেজ জীবন এবং সে জীবনের নানা প্রয়াস আর ব্যর্থতা।

ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত দিকটা এখানে লিখে রাখি। কমিটি হোল। সভা হোল। চাঁদা তুলবার নানারকম চেষ্টাও কিছু কম হোলনা। কিন্তু বঙ্কবিহারীর সাহায্যার্থে এক পয়সাও গেল না। এই সঙ্গে এও লেখা দরকার সেদিনের সেই কমিটি শেষ পর্যন্ত একটা চিরস্থায়ী না হোক দীর্ঘকাল স্থায়ী কমিটিতে পরিবর্তীত হোয়েছিল।

হোয়েছিল আরও অনেক কিছু কিন্তু কাজের দিক থেকে অন্ততঃ আমার কলেজ জীবনে বড় একটু ফলপ্রসূ হয়নি। অবিশ্যি বিচার করলে হয়তো বলা চলে আর কিছু হোক বা না হোক আমরা এই পাচ দিকের পাচজন ভদ্রসন্তান মিলে মিশে একটা কিছু করবার সামান্য ট্রেণিং ত' পেয়েছিলাম বটেই।

ট্রেণিং নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিলনা, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। অথচ এটা আমার বেশ মনে আছে বন্ধুর কাছে চিঠি পত্রে কোনদিন এই সৎ সংকল্পের উল্লেখ করতেও পারিনি। বন্ধুর চিঠি পেতাম। উত্তরও লিখতাম। সে উত্তর লেখা ক্রমেই বেশ শক্ত হয়েও উঠছিল। কলেজ জীবনের না হোক ছাত্র জীবনের দু'চার কথা জানতে বন্ধু চাইতো। উত্তরে এ ও তা লিখতাম, কিন্তু তার জন্য যে গানের জলসা বসলো, ছোটখাট থিয়েটার অভিনয়ও হোল—সে সব কথা আমার লেখা হোল না।

প্রথম যেদিন কমিটি হোল আর তারপর যেদিন বিশেষভাবে সভা ডাকা হোল এ দু'দিনই আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। উপস্থিত থাকার ইচ্ছে ছিল চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু ওদিকে তখন কাগজ-ওয়ালাকে নিয়ে বিপদ বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। তাকে নিয়ে অর্থাৎ তার জন্যেই ছুটোছুটি করতে হোল দিন কয়।

কলেজ থেকে ডক্টর ঘোষের বক্তৃতা শুনে বিকেলের দিকে কাগজের অফিসে গিয়েছি খবর নিতে। গিয়েছিলাম আমি আর ইন্দু। গিযে দেখি সেই কোলাপসিব্‌ল গেটের কাছে, ইন্দুর ভাষায়, 'আমাদের শ্রীমান' অনুপস্থিত। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি কাকে জিজ্ঞেস করে কি বিপদে পড়বো ভাবছি এমন সময় গেটের কাছ থেকে একজন পাঞ্জাবি আর চশমা পরা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা পাড়লেন। তিনি দু'চার কথার পর জানালেন কাগজ-ওয়ালার ডিউটি পড়েছে রাত্তিরে। কথাটা আমাদের জানাবার জন্যে কাগজওয়ালা তাকে বলে গিযেছে।

খবরটা সু না কু এটা বুঝলাম না। বুঝলাম শুধু এইটুকু যে ভোর রাত্তিরেই হকারদের দৌরাত্ম্য হয় এবং কাগজওয়ালা সে সময় উপস্থিত থাকলে উপযুক্ত কাজ হয়।

কাগজের অফিস থেকে ইন্দুকে বাড়ী পৌছে দিযে মেসে ফিরে এলাম। ভোর রাত্তির পর্যন্ত মনটা নিশ্চিন্ত। চড়াও হবে হকারের দল। তারা বলতে গেলে কাগজওয়ালার সগোত্র। অতএব দুর্ভাবনার কথা ছিলনা। তবু সেই ভদ্রলোকের কথায় কি রকম যেন ভয়ের ইঙ্গিত ছিল। একটা চাপা ইঙ্গিত, যেন ঝড় আসবে তারই আভাস তিনি দিয়ে গেলেন।

অথচ করবার কিছু ছিলনা। কাগজওয়ালা তার উপযুক্ত কাজে যাবে। বিপদ যদি কিছু ঘটে সে জন্যেও সে প্রস্তুত। এতে আর করার

কি থাকতে পারে? তবু ব্যাপারটা নূতন। এতো দেশের কাজ নয় দশের কাজ। দেশের কাজে যদি বিপদ থাকে দশের কাজেও বিপদ থাকাটা আশ্চর্য নয়। প্রশ্ন অবিশ্যি অনায়াসেই ওঠে দশের কাজে বিপদ কেন? বিপদটা ঘটায় কে? এতদূর পর্যন্ত সেদিন ভেবে দেখেছিলাম ব'লে মনে হয় না। ভাবনাটা তখনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

পরদিন বেশ ভোরেই ঘুম ভেঙে গেলো। হাতমুখ ধুয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে ছুটলাম কাগজের অফিসে। বড় গলি থেকে ঘুরে ছোট গলিতে পা দিতেই বড্ড ফাঁকা ঠেকলো। ভিড় নেই লোকজন নেই ফাঁকা গেটে জনচারেক কনষ্টেবল। কোলাপসিব্‌ল গেট্‌টাও খোলা। গলি দিয়ে যেন লোকজন বড় একটা যাচ্ছে আসছে না। ভোর বেলায় ক'লকাতার গলি নিঃশব্দ থাকলেও কতগুলো শব্দ আছে যেগুলি ভোরবেলার। ছোট গলিতে মানুষের পায়ের শব্দটাও খুবই স্বাভাবিক, সেটা না হ'লেই ফাঁকা ঠেকে। বেশ ধীরপদে এগুচ্ছি। কাগজের অফিসের সামনে এসে গেলাম, তারপর পার হ'য়ে চলে গেলাম সামনে। বিপর্যয় কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। ষ্ট্রাইক যারা করেছে তাদের চিহ্ন মাত্র নেই। পিকেট যারা করেছিল তাদের যে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে এও মোটামুটি নিশ্চয়। কিন্তু আমার এখন কর্তব্য কি? পায়ে পায়ে চায়ের দোকানের সামনে এসে গেলাম। সেখানে জন দুই কনেষ্টবল দাঁড়িয়ে আর সাদা পোষাক একজন পুলিশের বড়বাবু চেয়ারে বসে টুপি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ওখানেও গেলাম না। আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকে মোড় ফিরে একটু ঘুরে ইন্দুর খোঁজে ওদের বাড়ী এলাম। ইন্দুকে বাড়ী পাওয়া গেল এবং খবরও জানলাম। পুলিশ শুধু গ্রেপ্তার করেনি শেষ রাত্তিরে এ পাড়ায়, ইন্দুর ভাষায়, 'যেন ডাকাত পড়েছিল। ওরে বাপ. সে কি দৌড়ঝাপ চেঁচামেচি আর মারধর!'

অর্থাৎ এপাড়ায় রীতিমত ঝড় বয়ে গিয়েছে। সে ঝড়ের দাপটে কাগজওয়ালা এখন কোথায় বিরাজ করছে বলা শক্ত। পুলিশের হাজতে চলে যাওয়াটা কিছু আশ্চর্য নয়। আবার ছিটকে পালিয়ে যাওয়াটাও অসম্ভব নয়। ইন্দুর কাছ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলাম ভবানীপুরে। তখন বেলা বেড়েছে। ভেজা রাস্তায় সকালের রোদ্দুর পড়েছে। থলি হাতে গৃহস্থ চলেছে বাজারে। আমি সেই বস্তির ঘরে এসে কড়া নাড়লাম। কাগজওয়ালার মা দরজা খুলে দিলেন। সাড়া পেয়ে একটি বছর বারচৌদ্দর ছেলে আর বছর দশেকের একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। মহিলা বল্লেন, 'এসো। ভেতরে বসবে চলো।' মুখে আমার দুশ্চিন্তার ছাপটা ছিল নিশ্চয়ই তবু হাসি টেনে বল্লাম, বসবার সময় নেই। বড্ড তাড়া। আমি শুধু খবর নিতে এলাম কেমন আছেন ?

মহিলা হঠাৎ কি উত্তর দেবেন যেন ভেবে পেলেন না। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লেন, ওর এই ষ্ট্রাইকটা মিটলেই নিশ্চিন্ত হ'তাম। তা তুমি একটু চা খেয়ে যাও ?

মাথা নেড়ে বল্লাম, আজ থাক। ও কি এখনও ফেরেনি ! মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন তারপর আচমকা জবাব দিলেন, এইবার ফিরবে।

বছর দশেকের মেয়েটি মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। আর একটু দূরে ঘরের দরজায় কাগজওয়ালার ছোট ভাই। আমি এদের একবার দেখে নিয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে বল্লাম, ফিরতে যদি দেরি হয় দুর্ভাবনা করবেন না। আমি আবার একবার আসবো।

কথাটা শেষ ক'রেই চলে এলাম। বেরিয়ে এলাম বড় রাস্তায়। এখান থেকে শুরু একেবারে অনভিজ্ঞ পথ চলা। পুলিশ যদি কাগজওয়ালাকে ধরে নিয়ে হাজতে পুরে থাকে আমি কি করবো ?

পুলিশে ধরে এ পর্যন্ত জানতাম কিন্তু তারপরের ব্যাপারগুলি কিছুই জানতাম না। অথচ একেবারে কিছু না করাও যেন বড় অস্বস্তিকর। সে দিনটা নিয়ে এই অস্বস্তির ভাবটাই আমার আজও মনে আছে। আর পাঁচটা দিনের মত সেদিনটা নয় অথচ একটা পঙ্গু ব্যর্থতা ছাড়া সেদিনের অভিজ্ঞতায় আর কিছু বড় ছিল না। মেসে ফিরলাম কলেজে গেলাম দু'চারটি ক্লাশও করলাম। বেলা শেষে কলেজ থেকে বেরিয়ে ফিরে এলাম মেসে।

মেসে নিজের ঘরে এসে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। ভবানীপুরে যাবো বলে এসেছি সকাল বেলায়। কিন্তু যেতে মন সরছেনা। চিত্ হ'য়ে শুয়ে ভাবছি পুলিশের কাছেই সোজা চলে যাই, কিন্তু তাতেই বা কি এগোবে? দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে দেখি অপরিচিত একটি ভদ্রলোক। বল্লাম, কাকে চান? আমার নাম ক'রে ভদ্রলোক দেখা ক'রতে চাইলেন। পরিচয় দিলাম। ভদ্রলোক এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে মুখে বল্লেন, আমি মেডিক্যাল কলেজে পড়ি।

কাগজের ভাঁজ খুলে পড়লাম। কাগজওয়ালা লিখছে, আপনার ঘরে আশ্রয় নেবো হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই। রাত্তিরটা থাকতে পারি। দেখা হ'লে সব বলবো।

লাইন কটা পড়ে মুখ তুলতেই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রটি বল্লেন, হাসপাতালে থাকাটা খুব নিরাপদ নয়। পুলিশ হঠাৎ টের পেলে arrest করবেই। আপনার মেস তো বেশ কাছে। সন্ধ্যে নাগাদ আমি পৌঁছে দিয়ে যাব।

ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন আমি ডেকে বল্লাম, কিন্তু হাসপাতালে কেন? কি হয়েছে ওর?

ভদ্রলোক সামনে এগিয়ে এসে বল্লেন, লাঠির ঘা খেয়ে মাথাটা

ফেটে গিয়েছে। তেমন serious নয়। তবে খুব দুর্বল।

একটু চুপ থেকে আরও যেন কি বলতে গিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন না। আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, In about on hour ধরুন প্রায় ছ'টা নাগাদ আমি নিয়ে আসবো। আচ্ছা চলি।

চলে গেলেন অপরিচিত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। এ খবর শুনে আমার স্বস্তি পাওয়ার কথা। পুলিশ ধরতে পারেনি এতে মনটা হাল্কা হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু তেমন সহজ হ'তে পারলাম না। কি যেন একটা আশংকা মনে চেপে রইল। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়ন্ত বেলার পরম নিশ্চিন্ত আলগোছ ভাবটা মনে মনে ছুয়ে দেখছি। বেলা পড়ে গেছে। নিচে চৌবাচ্চায় জল পড়ছে তারই একটানা শব্দ। দূরে বড় রাস্তা থেকে কদাচিৎ দু-একটা গাড়ীর ভেপুর শব্দ আসছে আর মাঝে মাঝে গলি থেকে ফেরিওয়ালার ঈষৎ ক্লান্ত ডাক। জানালা দিয়ে পাশের বাড়ীর দেয়ালের গায় ম্লান আলোর একটা চৌকো প্যাটার্ণ দেখতে দেখতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

গায়ে ঠেলা খেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। মালতী হাতের ব্যাগ বগলে চেপে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। চোখ মুখে হাত রগড়ে বল্লাম, খুব সময়ে এসেছেন! যার জন্য এসেছেন সে এখনই এসে যাবে। বসুন।

উল্টোদিকের তক্তপোশটায় মালতী বসতে আমি বাইরে গিয়ে চোখ মুখে জল দিয়ে এলাম। কতটা সময় আর ঘুমিয়েছি – বোধহয় আধঘণ্টা, কিন্তু ঐটুকু ঘুমেই পৃথিবীর ধরণটা যেন পাল্টে গিয়েছে অর্থাৎ আমার মনটা বদলে গিয়েছে। সেই যে কি একটা চেপে আসছিল সেটা নেই। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে বল্লাম, চা খাবেন।

মালতী বল্লো, খাবো!

মেসের চাকরকে দু'কাপ চায়ের কথা বলে এসে বসলাম ঘরে।

মালতী বল্লো, সকালে গিয়েছিলেন। আজই আবার যাবেন বলেছিলেন······

আমি মাথা নেড়ে জানালাম তাই বটে। তারপর চা আসতে কথায় কথায় সবই বল্লাম। বলার কথাটা তখনও সামান্য, সমস্ত দিনের কথাটা বলতে গিয়ে অনেক কিছুই যেন বলে ফেল্লাম। মাথা ফেটেছে, পুলিশ ধরতে পারেনি, আজ রাতটা এখানেই থাকবে,—এই সব বল্লাম, কিন্তু মালতী বল্লো অন্য কথা। সে বল্লো, 'আজকেই ধরে নি। না হয় কালও পালিয়ে বাঁচবে। তারপর একদিন ধরা পড়বেই। হয়তো ছাড়া পাবে। কিন্তু আবার ধরা পড়বে। এর কি কোন শেষ আছে? এ যে অসুখ!

একটু চুপ থেকে চায়ের পেয়ালা দুটো মেজেতে নামিয়ে রেখে আবার বল্লো মালতী, আমার কথা ছেড়ে দিলাম। ওদিকে ভাইবোন সর্বোপরি রয়েছে মা। আমি মাসি বলি। মাসির কথাটা ভেবে দেখুন। এই এক ছেলের উপর নির্ভর, এই এক ছেলেকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন······

কিন্তু মালতীর আর বলা হ'লনা। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে আমি চকিত হ'য়ে উঠলাম। দরজায় এসে দাঁড়ালো সেই ভদ্রলোক, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। মালতীকে বসতে বলে আমি নিচে নেমে গেলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে। ট্যাক্সির দরজাটা খোলাই ছিল। কাগজওয়ালা খানিকটা ট্যাক্সিতে ভর দিয়ে খানিকটা আমার কাঁধে ভর দিয়ে নেমে এল। তারপর আমার আর ভদ্রলোকটির কাঁধ জড়িয়ে ধরে খানিকটা ঝুলে খানিকটা পা ফেলে সিঁড়ি পর্যন্ত এসে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে হ'ল মুস্কিল। ছোট সরু সিঁড়ি, কলকাতার মেসের সিঁড়ি। দু'জনে দুদিক থেকে ধরা যায় না। আমি ধরলাম একপাশে। ভদ্রলোক পেছন টাল সামলে নিয়ে উঠলেন পিছনে

পিছনে। সিঁড়ির ধাপ ক'টা পার হ'তে হ'তে মালতী এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির মাথায়। সিঁড়ির পর একটু বারান্দা। তারপরেই আমার রুম। ধীরে ধীরে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিতে মালতী একটা হাত পাখা দিয়ে হাওয়া দিতে লাগলো। ডাক্তার ছাত্রটি আমাকে বল্লো, খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দিন। ভয়ের কিছু নেই। আর একটা কথা···

বলতে বলতে কে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে বল্লো, 'বাবুজি' ? চমকে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম ট্যাক্সি ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছে। আমি বল্লাম, 'ও তোমার ভাড়া ? কত হয়েছে ?'

কথাটা বলতে বলতে মালতী চট্ ক'রে উঠে গিয়ে হাতব্যাগ খুলে ফেলেছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার বল্লো ভাড়া উঠেছে একটাকা দু'আনা। ডাক্তার ছাত্রটি বাধা দিল আমিও আপত্তি করলাম, কিন্তু মালতী ততক্ষণে ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়েছে।

ড্রাইভার চলে গেল। ডাক্তার ছাত্রটিও সামান্য কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেল। আমি গেলাম দুধ আনতে। দুধ আনতে গিয়ে কাগজওয়ালার নূতন চেহারাটা চোখে ভেসে উঠলো। সে চেহারায় বিপ্লবীর দুর্বার কোন ভাব তো নেই। মুখটা হলদে। আর মাথা বেড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তারই ফাঁক দিয়ে দুচার গোছা শুক্‌নো চুল বেরিয়ে আছে অত্যন্ত বেমানান ভাবে। গায়ের সার্টটা ছেঁড়া ফাড়া আর শুক্‌নো রক্তের ছাপ। চোখের দৃষ্টিও যেন নিস্প্রভ। কোথায় যেন একটা চমকপ্রদ কিছু আশা করেছিলাম সেটা তো কোথাও নেই। কেত্‌লিতে গরম দুধ নিয়ে ফিরে-এলাম মেসের রুমে। ঘরের আলোটা জেলে দিয়েছে মালতী। কাগজওয়ালা চোখ বুজে শুয়ে আছে। চশমাটা রয়েছে টেবিলের উপরে ভাঁজ করা। মালতী ধীরে ধীরে হাওয়া দিচ্ছে। পাশের ঘরের ভদ্রলোক দরজায় দাঁড়িয়ে সিগ্‌রেট টানছিলেন। আমাকে

দেখে পাশ দিয়ে দাঁড়ালেন। চায়ের পেয়ালা একটা ধুয়ে দুধটা তাতেই ঢেলে দিলাম। মালতী পেয়ালা নিয়ে বল্লো, একটা চামচ দিন।

চামচ একটা সংগ্রহ ক'রে এনে দিলাম। চামচ দিয়ে দুধটা মালতী ধীরে ধীরে খাইয়ে দিল। আমি বাইরে গিয়ে পাশের ঘরের ভদ্রলোককে কিছুটা বানিয়ে কিছুটা সত্যি বলে এলাম। কিন্তু ঘরে ফিরে আসতে কেমন যেন নিজের ঘরটা আর নিজের বলে মনে হ'লনা। ঘরটা এদের দুজনের। আমি বাইরে থেকে এসেছি। এখনি না হোক খানিক পরে চলে যেতে হবে। মালতী দুধ খাইয়ে কুজো থেকে জল গড়িয়ে জল খাইয়ে দিল। পেয়ালা নামিয়ে রেখে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে আবার পাখা নিয়ে বসলো একটা চেয়ারে। আমি গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। কাগজওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে। এতক্ষণে যেন চোখের দৃষ্টিটা ফিরে এসেছে। বল্লাম, কেমন আছেন এখন ?

কাগজওয়ালা আমাকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করলো। বসলাম পাশে। মৃদুস্বরে বল্লো, 'আমার চশমাটা ?' মালতী চশমাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে চোখে পরিয়ে দিল ব্যাণ্ডেজের পাশ দিয়ে। ঠিক পরানো গেলনা। কাগজওয়ালা বল্লো, ঠিক আছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

আমার দিকে মৃদু হাসির সঙ্গে তাকিয়ে বল্লো, এবার একবার মাকে খবর দিতে হয়।

আমি বল্লাম, এখানে নিয়ে আসতে বলেন ?

কাগজওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলো, 'না না তার প্রয়োজন নেই। শুধু একবার জানিয়ে আসবেন ভাল আছি। কাল সকালে যাচ্ছি। মালতীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বল্লো, 'আজকেও তো যেতে পারি।'

মালতী মাথা নেড়ে বল্লো, 'আজকে নয়। কালও যেতে পারবে

বলে মনে হয় না। তা মাকে খবর দিতে ওকে পাঠাচ্ছো কেন ? আমি ফেরার পথে জানিয়ে যাব।

আমার দিকে তাকিয়ে মালতী বল্লো, কাছাকাছি ডাক্তার পাওয়া যায় না ? একবার নিয়ে এলে দেখে যেতো।

আমি বল্লাম, ডাক্তার পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

কাগজওয়ালা বল্লে, 'ডাক্তার দরকার হবে না। শুনলে তো বলে গেলেন ভদ্রলোক ব্যস্ত হবার কিছু নেই। In due course সেরে উঠবো। আমার ভাবনা হচ্ছে ট্যাক্সি ড্রাইভার দেখে গেলো। ও ব্যাটা যদি খবর দিয়ে আসে ?'

মালতী কথাটা আমল দিলে না। বল্লো, খেয়ে দিয়ে কাজ নেই ও ব্যাটা যাবে খবর দিতে। মোট কথা এখান থেকে আজকে তোমাকে remove করা ঠিক নয়।

আমার দিকে তাকিয়ে বল্লো, আপনি একজন ডাক্তারই নিয়ে আসুন। গা গরম। এটা আমার ভাল লাগছেনা।

মোট কথা আমাকে বাইরে যেতেই হয়। বাইরে যেতে আমি চাইছিলাম আবার ঘরে থাকতেও ইচ্ছে করছিল। ঘরে থাকার একটু প্রয়োজনও ছিল। আমার রুমমেট এসে পড়বে এখনই। সে এলে তাকেও কিছুটা বুঝিয়ে বলা দরকার। ভাবলাম বাইরে রাস্তায় গিয়ে অপেক্ষা করি। সে ছেলেকে যা বলবার রাস্তায় দাঁড়িয়েই বলবো। এ দুজনকে ছেড়ে যাওয়াটাই আমার আপাততঃ প্রথম প্রয়োজন।

ডাক্তার ডাকবার কথা বলে বেরিয়ে এলাম। বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নেমে এলাম নিচে। তারপর মেসের দরজায় দাঁড়িয়ে কাটলো কিছুক্ষণ। একটু এদিক একটু সেদিক পায়চারি করতে করতে মেসের পাশে চায়ের দোকানের কাছে এসে দেখি আমার রুম-.

মেট চায়ের দোকানে চা নিয়ে উদাস মনে কাগজ পড়ছে। দ্বিধা কাটিয়ে এক কাপ চা নিয়ে আমিও বসলাম পাশে। কথা কয়টা গুছিয়ে নিয়ে বল্লাম, 'তোমাকে একটা অনুরোধ করবো।'

রুমমেট আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লো, 'করতে হবে না। আমি বলতে গেলে তোমার অপেক্ষাই করছিলাম। সৌমেন বাবুর কাছে সব শুনেছি। কিন্তু ক'দিন ভদ্রলোক থাকবেন এখানে? দিন দুইয়ের বেশী হবে?' বল্লাম, 'বোধ হয় কাল সকাল পর্যন্ত। কিন্তু সৌমেন বাবুর কাছে তুমি কি শুনলে সেটা জানা দরকার।'

আমার রুমমেট বল্লো, সে সব রাখো। আপাততঃ টাকার দরকার যদি থাকে তো বলো।

একটি পাঁচ টাকার নোট নিয়ে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ডাক্তারের খোঁজে। রুমমেটও বেরুলো সঙ্গে। সে যাবে হাওড়া ষ্টেশনে। সেখান থেকে কোন্নগরে পিশেমশায়ের বাড়ীতে। রাস্তায় যেতে যেতেই কাগজওয়ালার কথাটা কিছুটা বলে দিলাম। রুমমেট কিন্তু সরাসরি প্রশ্ন ক'রে বসলো, সে সব বুঝলাম। কিন্তু মেয়েটি কে?

হাওড়াগামী একটা বাসে ওকে তুলে দিতে দিতে বল্লাম, মেয়েটি ওর আত্মীয় হবে। আমিও ঠিক জানিনা। সামান্য একটু হাসি হেসে রুমমেট বাসে উঠে পড়লো।

সে রাত্তিরে ডাক্তার নিয়ে মেসে ফিরেছিলাম। ডাক্তারের বোধ হয় বিশেষ কিছু করবার ছিল না। তবুও একটা Prescription লিখে দিয়ে তিনি প্রাপ্য পাওনা নিয়ে চলে গেলেন। ওষুধও এনেছিলাম। ওষুধ আনার পর মালতী চলে গিয়েছিল।

কি ক'রে কাগজওয়ালার মাথা ফেটেছিল। কি ক'রে পুলিশ তাকে ধরতে পারলো না, মেডিক্যাল কলেজেই বা গেল কি ভাবে —এসব তথ্য জেনেছিলাম অনেক পরে। জানবার ইচ্ছেটা ছিল।

বরং বলা চলে তারপর যতদিন পিছিয়ে সে রাত্রিটা দূরে সরে যেতে লাগলো ক্রমে আবার ছাত্র জীবনের স্বাভাবিক তালটা ফিরে এলো তখন ঐ কথাগুলো জানবার ইচ্ছেটাই ক্রমে সেদিনের স্মৃতির বাহক হয়ে উঠলো।

পরদিন সকালে কাগজওয়ালাকে অনেকটা সুস্থ দেখে তারই ইচ্ছা অনুসারে ট্যাক্সি ক'রে ভবানীপুর পৌছে দিয়ে এসেছিলাম। পৌছে দিয়ে ফিরে এসে অবিশ্যি মনে হয়েছিল অনেক কিছু ত্রুটি যেন থেকে গেল আমার ব্যবহারে। সর্বোপরি এই সাত তাড়াতাড়ি ওকে দিয়ে আসাটায়। এখানে রাখলে কি ভাল হোত জানিনা কিন্তু বড় রকমের একটা নাটক হঠাৎ থমকে থেমে গেলে যেমন ফাঁকা লাগে তেমনি ফাঁকা ভাব নিয়ে কলেজে এলাম।

এই যে কোথায় যেন আমার ব্যবহারে ত্রুটি থেকে গেল আর ফাঁকা মন নিয়ে কলেজে আসা এ নিয়ে আমি ভেবে দেখেছি কিন্তু এর কারণ খুঁজে পাইনি। খুঁজে পেয়েছি অন্য কিছু। ঐ যে আমার ঘরে যেন আমি বাইরের লোক এর গোড়ায় রয়েছে মালতী আর কাগজওয়ালার সে সন্ধ্যায় অনায়াস আলগোছ সম্পর্কটি। আহত কাগজওয়ালাকে বহন ক'রে নিয়ে এলাম কিন্তু তার পরেই যেন মালতী ঘিরে ফেল্ল সরিয়ে নিল আলাদা ক'রে আর কাগজওয়ালাও যেন তারই মধ্যে ডুবে গেল ঠেকে রইল, এটা বাস্তব সত্যি কিন্তু কৈশোর উত্তীর্ণ যৌবনের প্রথম ধাপে এরকম ব্যাপারটা একবারে নূতন। চট্ ক'রে মেনে নিতে মন চায় না। এই তো গেল ওদের দ্বৈত সম্পর্কের ধাক্কা। আরও একটা দিক এরই মধ্যে বোধ হয় ছিল সেটা শুধু কাগজওয়ালাকে নিয়েই। কাগজ-ওয়ালা আর আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এ নিয়ে সেদিনও সন্দেহ ছিলনা আজও নেই। কিন্তু সেদিনের মনটা তফাৎ দেখতোনা দেখতো একত্ব এবং পেতে চাইতো একাত্ম। কাগজওয়ালা আলাদা এ কথাটা

বেশ জানতাম তবু রাজনীতিজ্ঞ কাগজওয়ালা শুধু আলাদা নয় প্রায় বিদেশীর মত এমনি একটা ইঙ্গিতে যেন স্ট্রাইকের গোড়া থেকেই মনে বাসা বেঁধেছিল। তবে সেটা সজ্ঞান মনে পুরোপুরি স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছিল নিঃসন্দেহে। কাগজওয়ালার শুধু ভাবনা নয় তার ভাবধারার পেছনে যুক্তির গতিবিধি আমার আন্দাজেরও বাইরে এটা বুঝতে বুঝতে ফোর্থ ইয়ার ক্লাশটাই প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। বুঝতে সময় লেগেছিল বটে মনে ইঙ্গিতে পেতে সময় লাগেনি। অর্থাৎ বন্ধুত্বের কোন বন্ধনই যেন কাগজওয়ালার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছি না,—আজ মনে হয় আমার ফাঁকা লাগবার গোড়ায় এটাও ছিল।

অবিশ্যি সামাজিক দিক থেকেই শুধু নয়, শুধুমাত্র কর্তব্য জ্ঞানের দিক থেকেও নয়, কাগজওয়ালাকে যে নূতন চমক লাগা দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলাম যে বিস্ময়ের ভাব নিয়ে আমি কাগজওয়ালার গতিবিধি কার্যকলাপের গ্রাহক হ'য়ে পড়লাম এই নূতন সম্পর্কের টানে উত্তর থেকে দক্ষিণে ভবানীপুর পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াতে খবর নেয়া দেয়ায় কোন বাধা পড়লো না। সেদিন বিকেলে তো বটেই প্রায় দিন সাতেক পর্যন্ত কাগজওয়ালার বাড়ী যেতাম বিকেলের দিকে। যেতাম বসতাম এ ও তা কথা হোত তারপর চা পানান্তে ফিরে আসতাম। কথা জমতোনা। কদাচিৎ কখনো অজানা দু'একটি মুখ থাকতো কাগজওয়ালার পাশে সেদিনটা আমার বেশ লাগতো। ওদের কথাবার্তা শুনতাম কিছু বুঝতাম, কিছুবা মানতাম, কিন্তু সময়টা কাটতো। আরও একটা কাজ হ'য়েছিল বেশ কিছু বিশেষ অর্থবাচক সুষ্ঠু শব্দ প্রয়োগ এবং বাক্যবিন্যাসের ধাঁচ ধরণটা শিখতে পেরেছিলাম ঐ দিন আটদশের মধ্যে। অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ ব'লে যে একটা মস্ত বড় পঠন পাঠনের জগৎ আছে সে খবরের হদিস ওদের কথাবার্তা থেকেই বোধ হয় প্রথম পেয়েছিলাম। অবিশ্যি আমি নীরব শ্রোতা

ব'লেই ঐ যারা আসতেন কাগজওয়ালার কাছে শুধু তাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগই আমার ঘটেছিল তা নয়, তাদের বেশ একান্তে লক্ষ্য করতেও পেরেছিলাম। ওরা যারা আসতেন বিদ্যায়—বিশেষ ধরণের বিদ্যায় তারা আমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোক কিন্তু তাদের কি একটা ছেলেমানুষি উত্তেজনা যেন আশ্রয় ক'রেছিল। তাদের বলবার ধরণে, তাদের বিষয় নির্বাচনে কেমন যেন একটা অতিপ্রাকৃত দৃষ্টি ক্ষমতা ছিল যার কোন মূল খুঁজে পাইনি। কাগজওয়ালাও বলতো কথা ঐ সেই বিশেষ ভাষায় এবং বিশেষ ধরণের আর আমি মনে মনে চাইতাম কাগজওয়ালা একটু আলাদা থাক। আর কোন অভিন্নতা না থাকলেও অতিপ্রাকৃত দৃষ্টি ক্ষমতার অভাব কাগজওয়ালার ছিল, অন্ততঃ এটা বুঝতে পারতাম এবং বোধ হয় মনে মনে খুশীও হতাম।

আর একটা দিক থেকে অভাব বোধ করতাম। এই আট দশ দিনের মধ্যে মালতীর দেখা পেলাম না একদিনও। আমি যেতাম বিকেলের দিকে। মালতী অবিশ্যি সকালে দুপুরে যে কোন সময় আসতে পারে। আমার আন্দাজ মালতী থাকে এই ভবানীপুরেই কাছাকাছি কোন রাস্তায়। একদিন একটু ফাঁকা পেয়ে কাগজওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম মালতীর কথা। কাগজওয়ালাও যেন অভাবটা বিশেষভাবে অনুভব করছিল, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'কি জানি কি হোল মেয়েটার! দিন পাঁচেক আসেনি।' একটু চুপ থেকে বল্লো, 'উপায় কি বলুন?'

মাথা নেড়ে চুপ ক'রে রইলাম। উপায় সত্যি ছিলনা। মালতী আসেনি অতএব একটা অভাব বোধ। সেটা নিয়ে কথা বলতেই মনে হোল এমনও তো হোতে পারে আসতে পারে নি। মনে মনে শঙ্কা হোল। বলা যায়না কি হোতে কি হয়। সে মেয়েকে যতদূর চিনেছি তাতে জানি অল্প কিছু হ'লে সে এমন অদৃশ্য হ'য়ে যেতনা;

হয় অসুখ করেছে আর নয় তো,—নয়তোটা একটা অজানা ভয়ের জগৎ। তা নিয়ে কথাবার্তা বলা চলে কিন্তু না জানতে পারা পর্যন্ত দৃষ্টি চলেনা। শঙ্কার কথাটা কাগজওয়ালাকে কিছু বল্লাম না। নিজের মনে মনে শঙ্কাটা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে চোখ তুলে তাকাতে দেখলাম কাগজওয়ালা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তে বল্লো, 'কি ভাবছেন? মালতীর কথা?' বল্লাম, 'ভাবনা হয়না? আমার তো হয়।'

কাগজওয়ালা পাশ ফিরে শুয়ে বল্লো, ভাবনাটা অবস্থার দাস। ভাবনা হবেই, কিন্তু তারপর?

উত্তর দিলাম না। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বল্লাম, এবার কলেজে এলে নূতন কিছু দেখতে পাবেন।

মাথাটা ঘুরিয়ে বল্লো কাগজওয়ালা, নূতন কোনো প্রফেসর এসেছেন বুঝি?

বল্লাম, না। সেদিক দিয়ে নয়। কলেজে আমরা একটা কমিটি করেছি। সভা-সমিতি ক'রে এবারে একটা কাজের মত কাজ করছি। হয় একটা নাটক আর নয়তো গানের জলসা বসবে। উদ্দেশ্যটা আন্দাজ ক'রতে পারেন?

কাগজওয়ালা সাদা গলায় বল্লো, উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ। আন্দাজ চলেনা।

হাতের কাছ থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে একটু চোখ বুলিয়ে কাগজওয়ালা বল্লো, কৈ বল্লেন না?

মৃদু হেসে বল্লাম, মহৎ নিশ্চয়ই তবে চমকপ্রদ নয়। উদ্দেশ্য বন্ধুকে কিছু সাহায্য করা।

কাগজওয়ালাও একটু হেসে বল্লো, এতো খুব ভাল কথা। চমকপ্রদ নয় কেন বলছেন? যদি সত্যি সাহায্য করতে পারেন আমি

তো নিশ্চয়ই খুব চমকে যাবো।

মনে মনে আশঙ্কা করছিলাম বুঝিবা কাগজওয়ালা হঠাৎ বিদ্রুপাত্মক কিছু বলে ফেলবে অতীতের চেষ্টার জের টেনে। মাথায় চোট খাওয়ার জন্যেই হোক কিংবা আর যে কারণেই হোক কাগজওয়ালা নূতন সুরে বল্লে কথাগুলি। খানিকটা অবাক হ'য়েছিলাম বৈ কি!

ঘরে আলো কমে আসছিল। উঠে গিয়ে আলোর সুইচটা টিপে দিয়ে ফিরে এসে বসলাম। সন্ধ্যার মুখোমুখি হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হোল। খোলার চালে বৃষ্টির টিপি টিপি শব্দ শুনছি। কাগজওয়ালার মা এক পেয়ালা চা দিয়ে গেলেন। কাগজওয়ালাকে বল্লেন, 'তোকে আর দিলাম না।' কাগজওয়ালা বল্লো, 'ওর থেকে একটু খেয়ে নেবো'খন।'

স'সারে খানিকটা চা ঢেলে দিয়ে এগিয়ে দিলাম, তারপর পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বল্লাম, আচ্ছা শেষ পর্যন্ত আপনাদের স্ট্রাইক থেকে পেলেন কি?

স'সারটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে কাগজওয়ালা বল্লো, 'হিসেব ক'রে দেখলে পেয়েছি জন চারেকের শ্রীঘর বাস আর জন দুই বরখাস্ত। আর জমার অঙ্কে এক পেয়ালা করে চা নাকি বেশী দিচ্ছে কাগজের অফিসে আর একটা প্রতিশ্রুতি ছুটি-ছাটার ব্যাপারে একটা কিছু নিয়মকানুনের কথা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবে।

কাগজওয়ালার গলায় একটু বিদ্রূপের সুর হয়তো ছিল। সেদিকে কান না দিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'যাদের জেল হয়েছে তারা ফিরে এলে কি চাকরী পাবে?

নির্লিপ্ত জবাব দিলে কাগজওয়ালা, তাও কি হয়! এ কাগজে তো নয়ই কোন কাগজেই নয়। তবে চারজনের ভেতরে তিন জনেই প্রেসের কাজ করতো। ওদের যাহোক একটা কিছু জুটতেও পারে।

বাকি জন হচ্ছেন একজন সাব-এডিটর, তার যে কোন উপায় হবে মনে হয়না।

আমি চুপ ক'রেই রইলাম। কাগজওয়ালা আমার মনভাবটা আঁচ ক'রে বল্লো, কি একেবারে থ বনে গেলেন দেখছি। ভাবছেন এত ক'রে এক পেয়ালা ক'রে চা বেশী জুটলে লাভটা কি হোল? লাভ লোকসানের হিসেব নানা রকমের হয়। থিয়োরি পড়লে দেখবেন এই হচ্ছে একমাত্র পথ। নান্য পন্থা। আর এরা হচ্ছে বলিদান। ব্যক্তিগত ভাবে দামটা বড্ড লাগে কিন্তু সামাজিকভাবে এমন কিছু ভয়ানক নয়। ভেবে দেখুন বেকারের সংখ্যা আজ কত! তাতে চার আর দুইয়ে ছ'জন যদি বেশী হয় মোট সংখ্যার প্রায় কোন পরিবর্তনই ঘটে না। থিয়োরি বলছে এমনিভাবেই এর আরম্ভ আর চায়ের পেয়ালা কিংবা কিছু বেশী মাইনে বা এ ও তা সুযোগ সেটা কিছু নয়। আসল কথাটা সজাগ হ'য়ে ওঠা। একজোট হওয়া। সংহতির শক্তি ইত্যাদি। থিয়োরি বলছে ··

আমার বোধ হয় রাগ হ'য়ে গিয়েছিল। চাপা গলায় বল্লাম, আপনাদের থিয়োরি দেখছি গীতার ভগবানোক্তির মত। গীতা বলেছেন, ব্যস্ তারপর আর কথা নেই। চোখের সামনে একটা নয় দুটো নয় গোটা ছয়েক পরিবার পথে বসে গেল আর আপনি থিয়োরি আউড়ে সামাজিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন এমন কিছু ভয়ানক নয়!

কাগজওয়ালা বল্লো, না আপনার সঙ্গে তর্ক করা মুস্কিল। ভিক্ষুক দেখলেই কি আপনি ফিট হ'য়ে পড়েন? বেকার দেখলেই কি চোখের জল ফেলতে শুরু করেন?

নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লাম, বেকার অসংখ্য, কিন্তু বেকারের সংখ্যা বাড়াবার উদ্দেশ্য তো আপনাদের নয়। এযে দেখছি উল্টো পথ।

এ কথার কোন জবাব কাগজওয়ালা দিলেনা। সামান্য হাসির সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করলাম।

কোথায় যেন আমি কথার প্যাঁচে পড়ে গিয়েছি অথচ আমার মনে হচ্ছিল এমন কিছু ভুল তো বলিনি।

সরলভাবে তাই বল্লাম, আপনার কি সত্যি ভয়ানক মনে হয় না? এতগুলো লোক একসঙ্গে বিপদে পড়ে গেল। অঙ্ক শাস্ত্রের দোহাই দিলে কি ফাঁকিটা চাপা দিতে পারেন?

কাগজওয়ালা হাসির সঙ্গেই বল্লো, অঙ্ক শাস্ত্রটা তো ফাঁকি নয়। অত কথায় কি হবে, একটা ওষুধ বার ক'রতেও কত সময় ডাক্তাররা কত লোক নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। বলুন খেলে না? ওষুধটা বের হ'লে লোকের ভালই হয়। আর এক্ষেত্রে আমরা চাইছি সামাজিক পরিবর্তন। কিছু লোকের বিপদ ঘটলেও আর পথ কি হ'তে পারে?

আর যে কি পথ হ'তে পারে সেটা ভেবে দেখবার বয়স তখন নয়। সবে 'সামাজিক-পরিবর্তন' কথাটা রপ্ত করছি তখনও এ নিয়ে গুছিয়ে বলার মত বুদ্ধি পাকেনি অতএব খুব যে যুক্তি-সঙ্গত জবাব দিতে পেরেছিলাম মনে হয় না। আরও খানিকটা কথাবার্তা হ'য়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু গোটা কয়েক পরিবার আচমকা মাঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং তা নিয়ে আর কিছু করবার নেই এটা যেন মেনে নিতে পারলামনা।

সে রাত্রে মেসে ফিরলাম দুর্ভাবনার বোঝা মাথায় নিয়ে। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র আর গণিতের ছাত্র আমি। পদার্থের আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে বুঝে দেখতে হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পদার্থের পরিবর্তনের ধাঁচ ধরণের কথাই জানতাম। সেক্ষেত্রে নিয়মকানুন বাঁধা পথে চলে। কিন্তু এই সামাজিক পরিবর্তনের ধাঁচ ধরণ যেন বড়ই গোলমেলে। বঙ্কুবিহারী অসুস্থ, সুস্থ ক'রতে সামাজিক পরিবর্তন চাই। মালতী পরাধীন ব'লেই নির্যাতন ভোগ করছে, সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া স্বাধীনতার আর কোন পথ নেই। ছ'টা পরিবারের গোটা

ত্রিশেক লোক না খেয়ে মরবে। দু'শো লোক না খেয়ে আছে তাদের স্মরণ ক'রে এরাও বসে থাক। আর বসে থাকি আমরা। সামাজিক পরিবর্তন না ঘটলে এরা কেউ খাবেনা। কাগজওয়ালা বলবে বসে কেন থাকবেন, কাজে লাগান। আর কাগজওয়ালার বিশেষ বন্ধুরা বলবে, চট্‌পট বিপ্লবকে আগিয়ে আনুন, সব সমস্যা চুকে যাবে। বিপ্লব এলেই যে সব চুকে যাবে এমন ধন্বন্তরিতে বিশ্বাস করার মত বিশেষ কোন শিক্ষাও পাইনি। যা জানিনা তার উপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা শক্ত কথা। আবার আমার সেই গীতার ভগবানের কথাই মনে গেল। ত্বয়া হৃষিকেশেন হৃদিস্থিতেন, অতএব আর ভাবনা কি?

ভাবনা কাগজওয়ালাকে নিয়েও হয়েছিল। কাগজওয়ালার জমিদারি নেই। (এইখানে মালতীর একটা কথা মনে পড়েঃ এরা যেরকম সবত্যাগী বিপ্লববাদী, এদের হয় আত্মহত্যা করতে হবে আর নয়তো পিতার জমিদারি ভেঙে খেতে হবে।) অথচ পরিবারে ওরা চারজন লোক। এদের খেতেও হবে বেঁচেবর্তে থাকতেও হবে। আজ বাদে কাল যদি শ্রীমান শ্রীঘরে চলে যান তখন উপায় কি হবে?

এই সব দুর্ভাবনার জাল বুনে সে রাত্রে বোধ হয় অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হয়নি। ভোর বেলায় রুমমেট ডাকাডাকি ক'রে চলে গিয়েছে ছাত্র পড়াতে। আমি তখনও ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ গায়ে ঠেলা খেয়ে জেগে উঠলাম। জেগে উঠলাম মানে পাশ ফিরে শুলাম। কিন্তু গলার স্বর শুনে একেবারে উঠে বসলাম। মালতীর গলা! উঠে বসে হাই তুলতে গিয়ে চেপে গেলাম, বল্লাম, 'আপনি!'

মালতী ঘরের একটি মাত্র চোয়ারটা টেনে বল্লে, 'চট্‌পট বলুন খবর কি?

বলছি, ব'লে বাইরে বাইরে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে মেসের সরকারি চাকরকে চা আনতে বলে এলাম ঘরে। মালতী শুক্‌নো

মুখেই বসে আছে। বল্লাম, এই সকাল বেলায়? হঠাৎ আমার এখানে?

মালতী বল্লো, যেখানে যেতে চাই সেখানে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। দাদা কলকাতায় এসেই স্পাই বসিয়েছে। সে অনেক কথা। এখন বলুন, কেমন আছে?

বল্লাম, আছে ভালই। এই কালকেই আপনার কথা হচ্ছিল।

চট্ ক'রে প্রশ্ন করে বসলো মালতী, কি কথা?

কি আর কথা! এই আপনি আসছেন না, কেন আসছেন না, এই সব। অসুখ বিসুখ হয়েছে হয় তো···

মালতী খুব মন দিয়ে শুনলো কথাগুলি, জবাবে বল্লো, হুঁ।

চা আসতে চা এগিয়ে দিলাম। এক চুমুক চা খেয়ে বল্লাম, কিন্তু দাদা কি সব করেছে বলছিলেন··· ?

চাপা দিয়ে বল্লে, সে সব থাক। আচ্ছা কলেজে যেতে আর কতদিন দেরি হবে ওর? মাথার ঘা শুকিয়েছে?

বল্লাম, ঘা প্রায় শুকিয়েছে। আর হয়তো সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই যেতে পারবে।

জর?

জর নেই। ওর স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনা করবেন না। বেশ সুস্থই আছে।

মালতী মাথা নেড়ে বল্লো, কিন্তু কলেজের পড়াটা নিয়েই ভাবনা হয়। পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত দেবে কি? কি যে করবে··· ?

চুপ হ'য়ে গেল মালতী। কথা দিয়ে সহায়তা ক'রতে আমারও ইচ্ছে হ'লনা। চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসে রইলাম দুজনে। পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে বল্লাম, কিন্তু আপনার কথা ওকে যখন বলবো তখনই তো জানতে চাইবে···।

হাত নেড়ে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লো মালতী, আমার কথা ওকে কিছু বলবেন না, কোন দরকার নেই। দু'দিন একটু ভাবুক, ভেবে দেখুক কেমন লাগে। তারপর কথার তোড়টা কমিয়ে বল্লো, আর তাছাড়া রোগা শরীর। শুনেই বা কি করবে? সেই শুয়ে শুয়ে অনর্থক ভাবনা। আমি যে এসেছিলাম খবর জেনে গিয়েছি কিছু বলবেন না কিন্তু।

মুখে বল্লাম, 'আচ্ছা বলবো না।' মনে মনে জানতাম এ এক শক্ত প্যাচে পড়লাম। মালতী আমাকে দেখে বোধ হয় আন্দাজ করলো আমি সত্যি বলবো না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বল্লো, আচ্ছা চলি। সকালে কলেজ, সেই ফাঁকে পালিয়ে এসেছিলাম। পারিতো কাল পরশু আবার এসে জেনে যাবো।

বাসে তুলে দিয়ে এলাম মালতীকে। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছি কাগজওয়ালাকে আপাততঃ বলবোনা কিছু। দু'চারদিন ওর কাছে যাওয়া বন্ধ রাখবো। কিন্তু বস্তিতে রমেশ স্পাই বসিয়েছে এটা বড় থাপছাড়া লাগলো। রমেশ মালতীর ভাই। স্পাই বসিয়ে বোনের গতিবিধি তদারক ক'রে শেষ পর্যন্ত কি চায় সে? আর স্পাই-ইবা এলো কোত্থেকে? সকালবেলায় দিব্যি রোদ্দুর পড়েছে রাস্তায়। চটি পায়ে মন খারাপ ক'রে আমি ফিরে এলাম মেসের ঘরে।

এর পর দিন কয় কাগজওয়ালার কাছে সত্যি গেলাম না। কলেজে যাই মেসে ফিরে আসি আর ছাত্র তাড়না করি। কলেজে গানের জলসার আয়োজন চলছে তাই নিয়ে নানা রকম উত্তেজনা। আর এদিকে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী শেষ হ'য়ে আসছে, দ্রুততালে চলছে পড়াশুনো—সব মিলিয়ে যেন বেশ রুটিন মাফিক চলছি।

এরই মধ্যে একদিন ইন্দু আমাকে ডেকে নিয়ে গোপনে বল্লো, কাগজওয়ালা কম্যুনিষ্ট হ'য়ে গেছে। তখনকার দিনে কম্যুনিজম কথাটার

তত চল হয়নি আর কম্যুনিষ্টত নয়ই। আমি সরলভাবে ইন্দুকে প্রশ্ন করলাম, কম্যুনিষ্ট হ'য়ে গেছে এর মানে কি ?

ইন্দু চোখ বড় বড় ক'রে এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিস ফিস ক'রে বল্লো, জানোনা ? সে বড় ভয়ানক !

আমি বল্লাম, ভয়ানক বললে বাঘ ভালুকও তাই, কাগজওয়ালা ভয়ানক কেন ?

ইন্দু আমার অজ্ঞতায় অবাক হ'যে বল্লো, সব কথা তোমায় বলতে পারবো না। এইটুকু জেনে রাখো ওরা চায় সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে সমান ক'রে দিতে। একটা ভাল জামা যদি গায় দাও তাও কেড়ে নেবে। ঘরে যদি পাখা ঝুলিয়ে রাখো তাও।

আমি বল্লাম, বেশ না হয় নিলো কিন্তু দেবে কাকে ?

এ প্রশ্নটা ইন্দুর বোধ হয় খেযাল হয়নি। একটু আমতা আমতা ক'রে বল্লো, অত জানিনা বাপু। দেবে ওদের যাদের খুশী। তোমাকে আমাকে দেবেনা। দেবে যাদের নেই। এই ধরো না মজতুরদের যারা মেহনত ক'রে খেটে খায়।

একটু চুপ থেকে বল্লো, ওদের যত রাগ এই মধ্যবিত্তদের ওপর। আমাদের পাড়ায় একটি ছেলে কম্যুনিষ্ট হ'য়ে গেছে। তার সঙ্গে একদিন কথা কইতে গিয়েছিলাম। সে যা গালটা পাড়লে ! কাদের জানো ? এই আমাদের যাদের ব্যাংকে মজুদ টাকা নেই আবার যারা মেহনতি জনতাও নই।

আমি বল্লাম, দেখ ইন্দু, কাগজওয়ালাকে আমার চেয়ে তুমি বেশী চেন। তোমার কি মনে হয় কাগজওয়ালা আমার তোমার সব কেড়েকুড়ে নিয়ে রাস্তার একটা কুলিকে দিয়ে দেবে ?

ইন্দু উত্তরে একটা দামী কথা বলেছিল। একটু ভেবে নিয়ে বল্লো, এটা ব্যক্তিগত কোন কথা নয়। কাগজওয়ালা লোক ভাল

হোক আর মন্দ হোক তাতে কিছু এসে যায়না। এটা দলের প্রশ্ন। কম্যুনিষ্টরা দল বেঁধে যা খুশী তাই করবে কাগজওয়ালা আমার বন্ধু বলে রেহাই দেবে না।

প্রশ্ন কর'তে পারতাম দলটা কি? সেদিন সে প্রশ্ন করিনি। পরবর্তী কালে প্রশ্নটা বহুবার বহুদিক দিয়ে ভেবে দেখেছি। কি দিয়ে দলের চরিত্র ঠিক হয়, কি তাকে চালনা ক'রে, কিভাবে দলটা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে একটা উন্নত ব্যাপার—এসব সমস্যার সত্যি বলতে কি কাগজ-ওয়ালার কাছেও সদুত্তর পাইনি, নিজের কাছেত নয়ই।

কাগজওয়ালা কলেজে আসবার আগেই বোধ হয় রমেশের সঙ্গে আমার কি একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে খুব একচোট ঝগড়া হ'য়ে গেল। ঝগড়াটা থামিয়ে দিল ফোর্থ ইয়ারের বহুদিনের পুরনো ছাত্র রমাপতি। আমি ঝগড়া করেছিলাম রমেশের উপর চাপা রাগ থেকে। আর রমেশ করেছিল আমি কাগজওয়ালার বন্ধু বলে। কিন্তু রমেশ দেখলাম বেশ চালাক ছেলে। আমার সঙ্গে ঝগড়া করলো বটে আবার ঝগড়া মিটিয়েও ফেল্লো। সেদিনই বিকেলে কলেজ থেকে ফেরবার পথে জোর ক'রে চায়ের দোকানে নিয়ে গেলো। পকেটের পয়সা খরচ ক'রে চা কিনে খাওয়ালে। সিগারেটের একটা পুরো প্যাকেট এগিয়ে দিলে। এবং চা খাওয়ার শেষে বন্ধুকে নিয়ে কথা পাড়লে। গানের জলসা ওর পছন্দ নয়। এ থেকে কোন লাভ হওয়ার আশা নেই। উচিত ছিল একটা যুৎসই নাটক খেটেখুটে নাবিয়ে দেওয়া। তাতে লোক পয়সা দিত খুশী হ'য়ে। বন্ধুকে বেশ কিছু মোটা রকমের টাকা পাঠিয়ে দেওয়া যেতো—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল কথা রমেশ শোনালো। কিন্তু আমার অস্বস্তি লাগছিল মনে মনে। আমি দেখলাম মালতীর ভাই রমেশ স্পাই বসিয়েছে আর এদিকে পরোপকারের জন্য মেতে উঠেছে। মেসে ফিরে কাজ আছে অজুহাত দিয়ে সেদিন পালিয়ে গেলাম।

এরই মধ্যে আর একদিন মালতী এল মেসের ঘরে। বোধ হয় প্রথম বারের দিন আট দশ পরে এসেছিল। এ কয়দিন যাই যাই ক'রেও কাগজওয়ালার কাছে আমার যাওয়া হয়নি। মালতী আসতে একটু বিব্রত বোধ করলাম। সে এসেছে খবর জানতে, কিন্তু কি এখন বলি আমি ?

বল্লাম, বসুন। চা খাবেন ?

মালতী বল্লো, চা খেতে পারি, কিন্তু আমার বড্ড তাড়া। কলেজ পালিয়ে এসেছি। কথাটা আগে সেরে নি। আমাদের ওদিকে যাওযা বন্ধ করলেন কেন ?

বল্লাম, কেন কিছু নেই। অমনি যাওয়া হয়নি। যাইনি আপনি জানলেন কি ক'রে ?

মালতী চোখ নাচিয়ে হাত নেড়ে বল্লো, জানলাম হাত গুনে। এখন শুনুন ও বেশ সেরে উঠেছে। কাল পরশু হয়তো কলেজে যাবে। আপনাকে শুধু একটা অনুরোধ। দেখবেন যেন ক্লাশ টুাশগুলো করে। আর ঐ যে সব ছাই পাঁশ কি সব জুটিয়েছে, বুঝলেন আমার হয়েছে জ্বালা ! একগাদা ষণ্ডামার্কা বাঁদর জুটিয়েছে। নিজেরাও জাহান্নামে গেছে ওকেও নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। একটু দেখবেন ওদের সঙ্গে পড়ে পরীক্ষাটা না যায়।

এর যা সরল উত্তর হ'তে পারে সেটা দিলাম না, আর এর যে যুৎসই সামাজিক উত্তর হ'তে পারে সেটা বলতে ইচ্ছে হোলনা, বল্লাম, দেখুন ছাই পাঁশ যাই জুটুক আমার বিশ্বাস ওর বুদ্ধি আছে বিবেচনা আছে, কাঁধের ওপর মাথা আছে। একেবারে জাহান্নামে যাবার রাস্তাটা বোধ হয় বেছে নেবে না।

মালতী আশ্বস্ত হোল কিনা জানিনা। আর সত্যি সত্যি মালতী আমাকে যা বলেছিল তা কি ঠিক আমাকেই বলেছিল, নাকি কথাটা

বলে দেখছিল বাস্তবিক ব্যাপারটা গড়িয়েছে কতদূর,—আমার মনে হয় শেষেরটাই সত্যি। আর আমিও উত্তর মালতীকে দিইনি দিয়েছিলাম নিজেকে। নিজের সুস্থ বিশ্বাসকে প্রচার ক'রে একটা আশ্বাস টানবার চেষ্টা করেছিলাম।

কথাটা ব'লে উঠে গেলাম চা আনতে। চা খেতে খেতে সহজভাবে প্রশ্ন করলাম, তাহলে আপনি দেখা করেছেন শেষ পর্যন্ত! স্পাই-টাই পেছনে লাগেনি?

ঠোঁট উল্টে বল্লো মালতী, বয়ে গেছে। আমি কেন দেখা ক'রতে যাবো। দেখা করার গরজ কি আমার একার?

বলতে বলতে হেসে ফেলে বল্লো, সে চেহারা দেখলে হেসে ফেলতেন। কোত্থেকে একটা গান্ধী ক্যাপ জুটিয়ে তাই মাথায় দিয়ে কলেজের গেটে এসে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখেছি চিনেওছি। তবু চিনি নি। আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি আর আড়চোখে দেখছি মুখ গোমড়া ক'রে ছেলে পায়ে পায়ে আসছে। তখন যদি দেখতেন…!

আবার একদমক হাসি হেসে মালতী বল্লো, কি ব'লে গিয়ে বিপ্লবীর সে এক নূতন চেহারা।

নূতন চেহারার জন্যে নয় মালতীর খুশীতে আমি যেন হালকা হ'য়ে গেলাম। হেসে বল্লাম, আজকে বোধ হয় তাড়া ক'রে যেতে হবে না?

আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল মালতী। আমিও উঠলাম। ছোট খাট কথাবার্তা বলতে বলতে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে মালতী আমাকে বাধা দিয়ে বল্লো, আজকে আর বাস্ অবধি আসবেন না। এইটুকু রাস্তা ও আমি যেতে পারবো। কিন্তু ওর সম্বন্ধে যা বলে গেলাম ভুলবেন না যেন।

বল্লাম, ভুলবোনা বটে, তবে কাজ কতটা হবে সে ভরসা কম। তবু খেয়াল রাখবো।

আমাকে কি একটু দেখে মালতী চলে গেল। আমি এই নূতন দায়িত্বের কথাটা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লাম উল্টো দিকে। অলি গলি ঘুরে বড় রাস্তায় পা দিয়েছি ঠিক মোড়ের মুখে দেখা হ'য়ে গেল রমেশের সঙ্গে। মনে মনে চমকে গেলাম। মুখে সাধারণ হাসির ভাব নিয়ে বল্লাম, সকাল বেলায় এতদূর! কাজ ছিল বুঝি?

রমেশ ঠিক হাসলো না, কিংবা বলা চলে সে হাসির জাত আলাদা। আবার সেই রমেশের সঙ্গে চায়ের দোকান। এবারেও রমেশ সেই পুরনো কথা অর্থাৎ বন্ধুর কথায় পাক খেয়ে ফিরলো খানিকক্ষণ। আমি ভাবছি রমেশ কি চায় আমার কাছে। দু'একবার যেন রমেশও কিছু একটা বলতে বলতে চেপে গেল, তারপর রমেশই কাজের অজুহাতে চলে গেল।

এরই দিনকত পরে কাগজওয়ালা এল কলেজে। মাথার ঘা শুকিয়েছে। ব্যাণ্ডেজও নেই। চেহারাটা একটু চিমশিয়ে গেছে। আর আছে পুরু লেন্সের চশমাজোড়া আর সেই পুরনো সাইকেলটা। শুধু চোখের দৃষ্টিটাই দেখলাম বদলে গেছে। আজ বলতে পারি সে দৃষ্টির স্থির নিশ্চিত ভাবটা তখন ছিলনা। কেমন যেন একটু উদাসীন একটু আলগোছ একটু বা বিভ্রান্ত—অথচ দৃষ্টি-প্রখরতা বেড়েই গেছে।

কলেজে সেই জলসার আয়োজন তখন সম্পূর্ণ। চাঁদা সংগ্রহ হয়েছে মোটামুটি, আরও সংগ্রহ চলছে। ঠিক ঠিক জানতামনা কত হয়েছে আর কত হবে। কিন্তু জানতাম দল হয়েছে দুটো। একদল রমাপতির পরিচালনায় জলসার ব্যবস্থা করছে আর একদলের তেমন নেতৃস্থানীয় কেউ ছিলনা, তবুও সংখ্যার আধিক্যে এই দ্বিতীয় দলটাই বড়। দ্বিতীয় দলের পুরোভাগে ছিল রমেশ। ওরা চায় স্টেজ বেঁধে নাটক দেখাতে। ঠিক কোথায় যে এই দুই দলের মতানৈক্য আজও বুঝতে পারিনা। কি ক'রে রাতারাতি দুটো দল গড়ে উঠলো

তাও জানতামনা। জানতাম এ ছ'দল পরস্পরকে চরম শত্রুতার দৃষ্টিতে না দেখলেও পরস্পরকে এড়িয়ে যেতো। এবং সুযোগ সুবিধে পেলেই এই আমার মত যারা কোন দলেই নয় তাদের কাছে পরস্পরের নিন্দাও করতো।

এক হিসেবে আমরা যারা কোন দলেই নয় তারা হলাম তৃতীয় দল, কিন্তু পরিষ্কারভাবে বুঝে দেখলে মানতে হয় তৃতীয় দলেও নয় এমনও ছিল জন কয়েক। যেমন রমেন। সে জলসাও চায় আবার থিয়েটারও চায়। জলসায় খেয়াল ঠুংরি টপ্পা কি হবে বা কে গাইবে তাও বুঝিয়ে বলে তর্ক ক'রে মতামত দেয় আবার নাটক নিয়েও তার বক্তব্য কিছু কম নয়। আবার কাগজওয়ালা কোন পক্ষেই নয়। এসব ব্যাপারে কোন মতামত নেই তার। সে যেন একান্তভাবে নিরপেক্ষ।

একদিন কলেজ থেকে ফিরতি পথে কাগজওয়ালার সঙ্গে ফিরছি। কথায় কথায় কথাটা পাড়লাম: এবারে দেখছি খুব মন দিয়েছেন ক্লাশের পড়ায়। এদিকে কলেজ যে গরম সে খবর রাখেন কি?

কাগজওয়ালা বল্লো অন্যমনস্ক ভাবে, রাখি। চাঁদা দিয়ে দিলাম সেদিন।

আমি আবার বল্লাম, কিন্তু চাঁদা যে দুবার দিতে হবে। একবার গান শুনতে আর একবার নাটক দেখতে। দু'পক্ষই সমান জোরে কাজ করছে।

কাগজওয়ালা বল্লো, তা হবে।

অতএব আমাকে চুপ ক'রতেই হলো। কাগজওয়ালাকে দেখলাম সে অন্যমনস্কভাবেই চলছে। এক হাতে সাইকেলের হাতল ধ'রে লোক জনের পাশ কাটিয়ে একটু বা দূরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলছে আমার পাশে পাশে। হঠাৎ চলা থামিয়ে বল্লো, আমাকে একটু যেতে হচ্ছে।

বল্লাম, কাজ আছে বুঝি? বেশতো উঠে পড়ুন।

সাইকেলের পাদানিতে পা দিয়েও কাগজওয়ালা পা নামিয়ে বল্লো, আসুন না! একটা মিটিংয়ে যাচ্ছি। চলুন আপনিও যাবেন!

সারাদিন কলেজ ক'রে মিটিং শোনার কোন ইচ্ছাই ছিলনা। কিন্তু একটা কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসলো। বল্লাম, বেশ চলুন। কিন্তু আপনি তো যাবেন সাইকেল চেপে আর আমি?

কাগজওয়ালা হাসি মুখে বল্লো, আপত্তি না থাকলে, I can carry you.

সেই নড়বড়ে সাইকেলের পেছনে বসে কাগজওয়ালা কর্তৃক বাহিত হ'য়ে প্রায় সন্ধ্যার মুখোমুখি কোথা দিয়ে কোন দিক ঘুরে অবশেষে একটা গলির শেষ মাথায় এসে নেমে পড়লাম। তারপরেও পায়ে হেঁটে চলতে হোল এঁদো পচা প্যাঁচপ্যাচে বস্তি পথে। সে পথে সাইকেল চলেনা। ঐ বস্তিরই একটা ঘরে ছেঁড়া মাদুর আর চট বিছিয়ে হ্যারিক্যানের আলোয় জন কুড়ি পঁচিশ লোকের সভা।

এই সভাটার একটা কথা আমার আরও অনেককাল মনে থাকবে। সেটা হচ্ছে সভার আবহাওয়া। কে যে কি বল্লো আমার মনে নেই। কি সব প্রস্তাব পাশ হ'য়েছিল তাও লিখে রাখিনি। কিন্তু আলো আঁধারি সভা ঘরে ধোঁয়ার আধিক্য ভুলবার নয়। এত প্রচুর সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়া কোনদিন কোথাও দেখিনি। প্রায় বদ্ধঘর। ভাদ্রমাসের ভ্যাপসা গরম আর ঐ ধোঁয়ার রাশি। এরই সঙ্গে এক অতি প্রচণ্ড উত্তেজনা। প্রত্যেক সরব এবং নীরব ব্যক্তি যেন উত্তেজনার ডিপো। বোধ হয় সভার উদ্দেশ্য ছিল কি একটা স্ট্রাইক হ'তে হ'তে হয়নি তাই নিয়ে আলোচনা এবং ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয় তার সংবিধান করা। যারা বল্লেন তারা বল্লেন ভাল। ভাষার জোর আছে। সামান্য কথাও তীব্রভাবে বলবার মত ভাষা তাদের ছিল। যারা দাঁড়িয়ে কিছু বল্লেন না

বসে বসে মন্তব্য করলেন, তাদেরও স্বল্প কথায় ব্যাঙ্গোক্তি করার কিংবা প্রশস্তি গাইবার ক্ষমতা কিছু কম ছিলনা। একটা চরম অবস্থার মিটিং বটে। আমি খানিক শুনলাম খানিক বা ভয় পেলাম আর অনেকটা ভাবলাম কাগজওয়ালাকে নিয়ে। একেবারে গুপ্ত সভা না হ'লেও খোলাখুলি সভা এ নয়। এখানে আমাকে নিয়ে আসা আমাকে শুধু বিব্রত করা। তবু কাগজওয়ালা আমাকে নিয়ে এল কেন ?

অনেক রাত্রে সভা ভাঙলো। আমি কাগজওয়ালা আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। সভা ভাঙলেও একেবারে ভাঙেনি। এখানে ওখানে তখনও জটলা চলছে। পথে বেরিয়ে আসতে কাগজওয়ালা প্রশ্ন করলো, কেমন লাগলো ?

বল্লাম, মন্দ নয়। তবে বড্ড সিগ্রেটের ধোঁয়া।

পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক বলে উঠলেন, তাতে হয়েছে কি ? বিড়ি সিগারেট খেলেই ধোঁয়া হয়। এর চেয়ে অনেক বেশী ধোঁয়াতে কাজ করতে হয় মজুরদের, তা জানেন না ?

একটু রেগে গিয়েছিলাম, বল্লাম, না জানিনা, কিন্তু সভা ডেকে সিগ্রেট বিড়ি না ফুকলেও চলে।

ভদ্রলোক একটি চমৎকার উত্তর দিলেন, বল্লেন, এটা আপনার পাতি বুর্জোয়া মেণ্টালিটি।

যতদূর স্মরণ করতে পারি গোষ্ঠি পরিচয়ে ব্যক্তি চরিত্র ব্যাখ্যা সেই আমি প্রথম শুনলাম। সেদিন অমন বিচিত্র অপরিচিত কথাটা শুনে হক্‌চকিয়ে গেলাম। কি উত্তর দেবো বুঝলাম না। উত্তর দিলে কাগজওয়ালা, তা হ'তে পারে। কিন্তু মেণ্টালিটিটা খারাপ নয়।

ওদের তর্ক শুরু হ'য়ে গেল। দ্বিতীয় ভদ্রলোক কাগজওয়ালার এবম্বিধ উত্তরের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু মুহূর্তেই

প্রস্তুত হ'য়ে বল্লেন, মেণ্টালিটিটা আলাদা ক'রে দেখলে আমিও আপনার সঙ্গে একমত, কিন্তু ব্যাকগ্রাউণ্ডটা ভুললে চলবেনা। আপনি যদি বলতেন আমি প্রতিবাদ করতাম না। উনি যখন বল্লেন তখন···।

কাগজওয়ালা বাধা দিয়ে বল্লো, উনি যে ব্যাকগ্রাউণ্ড নিয়ে চলেন, আমিও তাই।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক, তাকে এখানে কমরেড বলাই ভাল, কমরেড হাত নেড়ে বলে উঠলো, তা কোনমতেই নয়। আপনি হচ্ছেন Conscious, তাতে তফাৎ অনেকটা। কমরেড, ডায়ালেকটিক্যাল দৃষ্টিতে দেখতে শিখুন।

কাগজওয়ালা বুঝি ঐ বিশেষ দৃষ্টিতে দেখবে না, সে বল্লে, সমাজের যে স্তর থেকে আমি উঠে এসেছি তা সমাজের কুপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার দেখবার দৃষ্টি দিয়েছে। যদি তা দিযে থাকে তাহ'লে আমার দৃষ্টির সামনে মস্ত দেয়াল খাড়া হ'য়ে আছে আর আপনার সামনে নেই মানা শক্ত। আপনার ঐ conscious কথাটা বড় ঢিলেঢালা। কখন যে কোন লোক conscious বোঝা শক্ত। এই যে এই মাত্র সভা হ'য়ে গেল ভেবে দেখুন থিয়োরি বলবে এরা প্রায় সবাই conscious, তবু মতদ্বৈধতার সীমা নেই। আমার তো মনে হয় consciousness-এর অভাব ব'লেই মত জাহিরটা বড় ঠাই নিয়ে নিচ্ছে।

কমরেড আর কাগজওয়ালা তাদের বাকি তর্কটা সমাপ্ত করল, ঠিক সমাপ্ত করলো না মুলতবী রাখলো দীর্ঘ বাক্‌বিতণ্ডার পর, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে। রাত তখন অনেক। দুটি একটি পানের দোকান খোলা রয়েছে দূরে দূরে। কদাচিৎ দু'একটা ফাঁকা ট্রাম.বাস্ সশব্দে চলে যাচ্ছে। ওরই একটায় উঠে চলে গেলে কমরেড।

কাগজওয়ালা আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বল্লো, কেমন লাগলো আমাদের মিটিং ?

বল্লাম, কেমন লাগলো ভেবে বল্‌বো। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় ছাত্র পড়াতে যেতে পারলামনা এতে না বিপদ ঘটে।

কাগজওয়ালা বল্লো, মন্দ বলেন নি। আমিও ছাত্র আশ্রয় করেছি। সন্ধ্যেবেলায় আমারও যাওয়ার কথা। এই নিয়ে দিন পাঁচেক পড়াচ্ছি, তাতে দুদিন কামাই।

ধীরে ধীরে পথ চলতে শুরু করলাম। সাইকেল সহ কাগজ-ওয়ালাও চল্লো আমারই সঙ্গে। কি যেন ভাবতে ভাবতে খানিকটা স্বগতোক্তির মত বল্লো, কি যে করি ! এটাও প্রয়োজন ওটাও প্রয়োজন। এরপর ভোর রাত্তিরে বেরুবো কাগজ নিয়ে। কোনটাই কামাই দিলে চলে না।

চুপচাপ চলছি। গভীর রাত্রির ক'লকাতাকে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। বিরাট স্টেজের নাটকের বিরাম চলছে। দর্শকও নেই, যারা নাটক করবে তারাও নেই। আছে মস্ত স্টেজটা আর আলো। আবার ভোর রাত্তির থেকে নূতন ক'রে নাটক শুরু। অবিশ্যি আছে সবাই এখানে ওখানে গ্রীনরুমে। অথচ ভাবতে গেলে আমরাও নাটকেরই অংশ। এখানে যে দেখে তাকেও দেখে।

গায়ে হাত পড়লো।

এবার চলি। আপনার বোধ হয় ঘুম পেয়েছে ?

বল্লাম, ঘুম নয় স্বপ্ন দেখছিলাম।

তা বেশ। কিন্তু আজকের সভা নিয়ে আপনার কথা শোনার ইচ্ছাটা আমার রইল। ভেবেই বলবেন।

বল্লাম, আমারও একটা কথা শোনার ইচ্ছা। ছাত্র পড়িয়ে কাগজ বেচে তারপর মিটিং ক'রে পরীক্ষার কি হবে ? সেও তো একটা দায়িত্ব।

তা তো বটে। আপাততঃ পরীক্ষাটা দূরে। দায়িত্বটা চোখ এড়ানো চলে। হাতের কাছে যেগুলি তার বিহিত আগে করি।

বলতে বলতে সাইকেলের তেলের আলো জেলে কাগজওয়ালা বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

বল্লো পরীক্ষাটা দূরে। যারা পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত তাদের কথা ছেড়েই দিলাম এমন যে আমি আমিও জানি পরীক্ষা দূরে নয়। এটা ভাদ্র মাস। দু'দিন পরে পূজো আসছে। পূজোর ছুটির পর মাস দেড়েক সময় নিমেষে চলে যাবে। তারপরেই টেস্ট। আর টেস্ট পরীক্ষার পর আসল পরীক্ষার ক'টা দিনইবা বাকি থাকে। একেবারে গায়ে গায়ে লাগা দিনগুলি।

আকাশে চোখ তুলে দেখলাম ঝক্‌ঝকে তারা। বর্ষণ শেষ আকাশটা বেশ পরিষ্কার চক্‌চকে। পূবের আকাশে কি একটা তারা যেন চিনি বলে মনে হয়। অনেক দিন পর কলেজ স্কোয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে চেনা চেনা তারাটার দিকে তাকিয়ে মনে পড়লো বন্ধুর কথা। ঐ পূবের দিকে দূরে অনেক দূরে বেগবতী পদ্মার পাড়ে পূর্ব বাংলার এক গ্রামের কোন কুটিরে ঘুমিয়ে আছে আমাদের বন্ধু। অনেককাল কোন চিঠি দেয়নি। আমিও দিইনি। কি লিখবো চিঠিতে?

সে রাত্রে হোলনা। আজ লিখি কাল লিখি ক'রে আরও দু'চার দিন গেল। তারপর একখানা ছোটো চিঠি লিখলাম বন্ধুকে। সাধারণ দু'চার কথার চিঠিটা লিখে যেন ভারি ভাল লেগে গেল।

লিখে ডাকে দেবার পর মনে হোল অনেক কথাই লেখা যেতো। লিখতে পারতাম কলেজের ছেলেদের কথা, জলসা হবে সেই কথা কিংবা তাকে সাহায্য করতে যে নাটক হবে সেই কথা। কিন্তু এসব মনে হোল পরে। অবিশ্যি পরেও কোনদিন আর এ নিয়ে কিছু লেখা হয় নি।

বন্ধুর উত্তর আসতে আসতে কলেজে গানের আসরটা হ'য়ে গেল।

গান কতটা জমেছিল জানিনা। আসর ভাঙতে ভাঙতে রাত ভোর হ'য়ে গিয়েছিল এটা মনে আছে। আর মনে আছে রমাপতির মুখের ভঙ্গীটা। সে ভঙ্গীর কোন বর্ণনা নেই।

গানের জলসা হ'য়ে যাওয়ার দিন চারেক পরে কলেজের বারান্দায় আমাদেরই জনকয়েক কি একটা জটলা করছে দেখে আমিও জুটলাম। চাপা চাপা ভাবে কি একটা কথা নিয়ে যেন নানা ইঙ্গিত করা হচ্ছে। আমি একে জিজ্ঞেস করি ওকে জিজ্ঞেস করি, 'কি হয়েছে? ব্যাপার কি?' এরই মধ্যে দেখলাম রমাপতি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে আর তাকে দেখে এরা সবাই চুপ হ'য়ে গেল। রমাপতি নেমে আসতে বোধ হয় রমেন কি আর কেউ হবে এগিয়ে বল্লো, আচ্ছা রমাদা জলসা থেকে নাকি একপয়সাও ওঠে নি?

রমাপতি সোজা রমেনের দিকে তাকিয়ে বল্লে, কোত্থেকে শুনলে?

রমেন একটা নার্থবাচক শব্দ উচ্চারণ ক'রতে রমাপতি বল্লে, ঠিকই শুনেছিস্ এক পয়সা তো ওঠেই নি। উল্টে শালার দু'দশ টাকা আমারই গাঁট গচ্চা।

কথাটা বলে একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে বল্লে, শালারা গান গায় ভাল, খায় তার চেয়ে অনেক বেশী।

বলতে বলতে চটিতে শব্দ তুলে রমাপতি চলে গেল। রমেন ঘুরে বল্লো, কেমন বলেছিলাম কিনা?

আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মৃণ্ময়। সে বল্লে, আমরা আগেই বলেছি, গান শুনতে কি লোকে পয়সা দেয়?

রমেন বল্লো, বেশ তো নাটক নামিয়েই দেখ না। আমি আছি। তবে বাবা যা তা নাটক হলে চলবে না।

কি হ'লে চলবে এবং কারা চালাবে শোনবার মত মনের অবস্থা

ছিলনা। মানুষের মনে আশা থাকেই। জলসা থেকে কিছু একটা পাওয়া যাবে আশা ছিল। রমাপতির মুখভঙ্গীটাই একমাত্র নূতন জিনিস পেলাম। আর বাকি সব যা ছিল তাই রইল।

এর পরেই বন্ধুর চিঠি পেলাম। সে লিখেছে: তোমাকে আজ লিখিব কাল লিখিব করিয়া দেরি হইয়া গেল। আজকাল প্রায় সব সময় শুইয়া থাকি। মাথার পাশে জানালা দিয়া আকাশ আর মাঠ দেখি। এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত প্রায়। আকাশে প্রচুর সাদা মেঘ জমিয়া থাকে দেখিতে ভাল লাগে। এতদিন বড় বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টির সময় শরীরটা বড় ভাল ছিলনা। প্রায়ই জ্বর হত। কিছুই ভাল লাগিত না। গ্রামের কবিরাজ মহাশয় এখনও ওষুধ দিতেছেন। ওষুধের পয়সা দেওয়া সব সময় হইয়া উঠেনা।

সে সব কথায় কাজ নাই। এই বিছানায় শুইয়া শুইয়া আমার একটা কিছু করিতে ইচ্ছা করে। ফরাসী ভাষা শিখিবার কথা কি তোমাকে লিখিয়াছি? আমার ফরাসী ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করে। আমাকে খান কতক বই পাঠাইয়া দিও।

পড়াশুনা মন দিয়া করিও। পরীক্ষায় ভাল result করিবে। আমার বোধ হয় এ বৎসর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। পরে হইবে। আমার ছোট ভাই এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে। তাহাকে একটু আধটু পড়াই।

আশা করি ভাল আছ। আমার জন্য ভাবনা করিও না। আমি সুস্থ হইয়া উঠিব। পত্রের উত্তর দিও। ইতি।

আজ জানি কাজটা আমি ঠিক করিনি। কিন্তু সেদিন ঐ ফরাসী ভাষা শেখবার বই পাঠাতে মন সায় দেয়নি। নিজের মনে যখন দ্বিধা উঠলো তখন আর দু' একজনকে জিজ্ঞেস করলাম তারাও বল্লো, 'উঁহু, অত্যন্ত Strain হবে। ও না পাঠানই ভাল।'

কলেজ ষ্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকান ঘুরে ঘুরে গোটা দুই তিন বই কিনেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঠাইনি। যে রকম ছেলে বঙ্কু কি জানি যদি উঠে পড়ে লেগে যায় ফরাসী শিখতে। সেটাতো হঠাৎ বিপদ ডেকে আনবে।

অথচ কি আমি লিখবো বঙ্কুকে? ঠিক তার পরের চিঠিতে এ নিয়ে কিছু লিখলাম না। পরে হাল্‌কা-ভাবে বোধ হয় ইঙ্গিত ক'রেছিলাম, কি হবে ফরাসী শিখে? এমনি ধরণের কোন কথা। তার জবাব সে দেয়নি। তারপর আর কোন চিঠিতেই এ নিয়ে কিছু লেখেনি এও আমার বেশ মনে আছে।

বই যখন পাঠাবোনা স্থির ক'রে ফেলেছি কিন্তু এনিয়ে কি লিখবো বুঝে উঠিনি এমনি সময় কলেজে ছেলেদের কথাবার্তায় জানলাম পূজোর ছুটি হয়ে যাচ্ছে আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই। খবর শুনে খুব একটা খুশী হ'য়ে উঠতে পারলাম না। মুহূর্তে গতবারের পূজোর ছুটির কথা মনে পড়লো। সেবার বঙ্কু আমাকে গোপনে বলেছিল, 'জানো, রাত্রে আমার ঘুম হয়না।' ভাই বোনেদের জন্য টুকিটাকি কত কিছুই কিনে রেখেছিল। এই তো সেদিন! তবু দিনটা বেশ দূরে চলে গিয়েছে! কলেজ থেকে ফেরার পথে চেয়ে চেয়ে দেখলাম দোকান পাট সেজে বসেছে। আকাশে বাতাসে পূজো পূজো গন্ধ। নানা কারণে এবার পূজোয় আমার বাড়ী যাওয়া হবেনা। যাবো সাঁওতাল পরগণায়। কি জানি পূজোর আকাশ বাতাস সেখানে কেমন! এখানে দেখছি ছাদ খোলা দোতলা বাসে বড্ড ভিড়। রাস্তায় জনতার ভিড়। পূজো এসে গিয়েছে সত্যি। আমি এতদিন চোখ খুলে চোখের সামনে পরিবর্ত্তনটা দেখেও দেখিনি। পথ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ মালতীর কথা মনে পড়লো। কি জানি মেয়েটা কেমন আছে? অনেকদিন তাকে দেখিনি। অনেকদিন তার কথা

জিজ্ঞেস করাও হয়নি।

জিজ্ঞেস করবো কাকে? রমেশকে নিশ্চয়ই নয়। জিজ্ঞেস ক'রলে ক'রতে হয় কাগজওয়ালাকে। কিন্তু সে আজকাল সদা ব্যস্ত। কখন কলেজে আসে দু'টো চারটে ক্লাস করতে করতে হঠাৎ দেখি নেই। কখন সরে পড়েছে। যদি বা দৈবাৎ কোন ফাঁকা ঘণ্টায় দেখা হ'য়ে যায় কিছু একটা বলতে বলতে কাগজওয়ালা বলে বসবে, 'জরুরী একটা কাজ রয়েছে। অনুমতি করেন তো যাই।' অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে তখনই চলে যাবে। বাড়ী গেলেও পাওয়া যাবেনা নিশ্চয়ই। অবিশ্যি আমার যে খুবই প্রয়োজন এমন নয়। তবু কোথায় যেন খিচ লাগে। একই কলেজে একই সঙ্গে পড়ি। খেটেখুটে পড়া আমাকেও চালাতে হয়। আর পাঁচটা ছেলেকেও দুঃখ কষ্ট ক'রে পড়তে হয়। কিন্তু অমন নাভিশ্বাস সময় নেই একমাত্র কাগজওয়ালার। অথচ ইদানীং কাগজওয়ালা এমন এক মুখভাব নিয়ে চলে যে সাধারণ হাল্কা কথা বলতেও ঠেকে যায়। তার বিনয়েরও কোন মানে পাইনা।

কলেজ ছুটি হ'তে হ'তে রমেশ তার দলবল নিয়ে নাটকের ব্যাপারটা ঠিকঠাক ক'রে ফেল্লো। নাটক যে হবেই এটা স্থির হ'য়ে গেল। কি নাটক হবে তাও। কে কে পাঠ নিচ্ছে তা নাকি একরকম স্থির হ'য়েই ছিল। এখন শুরু হবে রিহার্সেল। কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ওরা ছুটির সময় কলেজের একটা রুমও পেয়ে গেল। এরকমটা বড় হয়না। তবে কিনা মহৎ উদ্দেশ্য ব'লে অধ্যক্ষ মহাশয় খুব একটা আপত্তি তোলেননি। শেষ পর্যন্ত রিহার্সেলটা কলেজের কক্ষে না হ'য়ে হয়েছিল হোস্টেলের একটা ফাঁকা কোঠায় আর এর ওর বাড়ীতে। এই রিহার্সেলের ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে রমেশ খানিকটা দিগ্বিজয়ীর ভাব নিয়ে বল্লে, 'আপনাদের সহায়তা পেলে আমরা শুধু নাটক নয় আমাদের স্নেহভাজন অতি দরিদ্র বন্ধুবিহারীর

ক'লকাতায় এনে চিকিৎসার ব্যবস্থাও ক'রে ফেলব।' শুনে নানাজনে নানা মন্তব্য ক'রলো। প্রায় সবাই অবিশ্যি স্বীকার ক'রলো এ অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু আমি লক্ষ্য ক'রলাম (হ'তে পারে আমার ভুল হয়েছিল) সবাই যেন কি রকম বিব্রত বোধ করলো। অমন যে রমাপতি সেও যেন বড় অবাক হ'য়ে গেল। মুখে বল্লো, 'এতো খুব ভাল কথা। একটা কাজের মত কাজ হয়, কিন্তু বড় শক্ত।'

বোধ হয় এর দিন দুই পরেই কলেজের শেষ ক্লাশ হ'য়ে ছুটি হয়ে যাবে। তার আগের দিনই কলেজ বেশ ফাঁকা হ'য়ে গেছে। পিছিয়ে পড়া দু'চারজন প্রফেসর সেদিনও খুব মন দিয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। আর মন দিয়েছে দেখলাম আমাদের কাগজওয়ালা। আরগ্যানিক কেমিষ্ট্রির ক্লাশের পর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ ছিল কিন্তু সে ক্লাশটা আর হোলনা। ডেমনষ্ট্রেটরের কাছে নানা অজুহাত দিয়ে অনেকেই সরে পড়লো। দু'চার দশজন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে যেন কি করবে বুঝতে পারছেনা। ডেমনষ্ট্রেটর নিজেই পথ দেখিয়ে দিলেন। অধিকাংশ যখন নেই তখন এ প্রক্রিয়াতো আবার নূতন ক'রে নিতেই হবে। অতএব থাক।

প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ থেকে বেরিয়ে আসছি। দেখি কাগজওয়ালাও আসছে সঙ্গে সঙ্গে। একটু অবাকই হ'য়ে গেলাম। আজকে যখন সবাই যাই যাই করছে তখন ওর শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়াটা যেন খাপছাড়া। কাগজওয়ালা বেরিয়ে আসতে আসতে বল্লো, আপনি কি খুব ব্যস্ত? আমার একটা কাজ করে দেবেন?

হেসে বল্লাম, 'আপনার কাজ তো? বেশ কি বলুন?' কাগজওয়ালা বল্লো, আমাকে একটু কি কি পড়া হোল কতটা কোন বিষয়ে এগিয়েছে শুধু মাত্র ফোর্থ ইয়ারে···দেখে নিলে ছুটিতে···বুঝতেই পারেন···।

বুঝতে পারলাম, কিন্তু দেখিয়ে দিতে কি আমিই পারবো ? আমিও যে ইন্দুর কাছ থেকে দেখে নেবো ভেবেছিলাম। ইন্দু তখনও হাত মাথা নেড়ে ডেমনষ্ট্রেটরের সঙ্গে কি নিয়ে বুঝছিল। সে দিকে ইঙ্গিত ক'রে কাগজওয়ালাকে বল্লাম, আমিও অন্ধ আপনিও। চলুন ইন্দুর কাছে যাই। ঘাত ঘোত সবই ওর জানা। চাই কি গোটাকয় জরুরি প্রশ্নও বাত্‌লে দিতে পারবে।

ইন্দুকে নিয়ে এক চায়ের দোকানে বসলাম তিনজনে। তারপর সেই গুরুতর গুরুত্বপূর্ণ কর্ম প্রায় সমাধা করা গেল। তিন তিনটি গুরুভার বিজ্ঞান শাস্ত্রের গোটা কুড়ি বাইশ বইয়ের হিসেব নিকেশ ক'রে ইন্দু মোটামুটি একটা খসড়া টেনে দিলে। তাতে ফাঁক রইল প্রচুর। তবু কোনমতে বি, এস্‌সির দরজা গলিয়ে যাবার মত পথটা দেখিয়ে দিলো। এই খসড়া টানতে গিয়ে ইন্দু অবিশ্যি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হোল বার বার। আমরাও প্রায় তাই। ইন্দু যদি অতটা আয়ত্বে এনেও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ফেল করবার আশঙ্কা করে তাহ'লে আমরা যারা সবে শুরু করবার ইচ্ছা রাখি তাদের কি গতি হবে ? এর কোন সন্তোষজনক উত্তর ইন্দুর কাছে ছিলনা। কিন্তু কাগজওয়ালা দেখলাম গম্ভীরভাবে সবই টুকে নিলে। টুকে নিলাম আমিও। কিন্তু ভরসা খুব রইলোনা।

এই অত্যন্ত জরুরী কাজ শেষ হ'তে ইন্দু আর বসলোনা। দু'চারটে ফাঁক বোধ হয় তারও বেরিয়ে পড়েছে। সেগুলি সারবার মতলবেই খুব সম্ভব সে তাড়াহুড়ো ক'রে চলে গেলো। বসে রইলাম আমরা দু'জনে। আমি বল্লাম, কি বলেন, পারা যাবে ?

কাগজওয়ালা বল্লো, পারতেই হবে।

সায় দিয়ে বল্লাম, তা তো বটেই, কিন্তু এযে একেবারে বিশাল সাগর ! কোন কূল কিনারাই পাচ্ছিনা।

কাগজওয়ালা মৃদু হেসে পকেট থেকে বিড়ি বার ক'রে দু'কাপ চায়ের জন্য বলে দিলো। একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বল্লাম, সারাটা পূজোর ছুটি আপনারা পড়বার সময় পাবেন, কিন্তু আমার সে সুযোগ হবে কিনা সন্দেহ। প্রায় সমস্ত ছুটিটাই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হবে পারিবারিক প্রয়োজনে। আপনাদের সেরকম কিছু নেই।

চায়ের পেয়ালা সামনে টেনে নিয়ে বল্লো কাগজওয়ালা, তুলনা করবেন না ওতে বিস্তর বিপদ। আপনার পারিবারিক, আমার আবার সামাজিক প্রয়োজন। একটা মিটিং তো দেখেই এসেছেন। অমনি অনেক মিটিংয়েই যেতে হয় আমাকে। তাছাড়া এবারে দিন পাঁচ সাত থাকবো ক'লকাতার বাইরে। একটা বড় রকমের সর্বভারতীয় কনভেনশনের কথা হয়েছে। যেতেও হবে। পরীক্ষার পড়া তার কাছে অতি তুচ্ছ।

একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, কনভেনশানটা কি ?

কি আবার, হাত উল্টে বল্লো কাগজওয়ালা, একটা বড় রকমের সভা। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় লোকজন আসবে। অনেক বড় বড় গালভরা কথা হবে। তারপর যাহোক কয়েকটা প্রস্তাবও গৃহীত হবে। উদ্দেশ্য, সে সব প্রস্তাবের সঙ্গে তাল রেখে কাজ করা। অথচ মুস্কিল কোথায় জানেন ? এসব আন্দোলনে উপস্থিত ক্ষেত্রে যখন তখন প্রয়োজন মত মতিস্থির করে পথ করতে হয়। অনেকটা আধুনিক যুদ্ধের মত। যখন যেরকম অবস্থার উৎপত্তি তখন সেরকম ব্যবস্থা। এতে আগে থেকে ফর্মূলা বেঁধে দেওয়া যায় না। অথচ নেতারা সে কথা বুঝবেন না। তারা চান প্রতিটি পদক্ষেপ সম্ভব হ'লে প্রতিটি হৃদস্পন্দন আগে থেকে ছক ক'ষে বেঁধে রাখতে। যেন মানুষ এমন এক কল যে সে নিয়মে চলবেই। সে মানুষ আবার কারা ? যারা নাকি আশা হারিয়ে বিশ্বাস হারিয়ে একেবারে সর্বহারা হ'য়ে বসে আছে।

তাদের সন্দেহের সীমা নেই, তাদের পদে পদে দ্বিধা আর নয়ত একেবারে মরিয়া হোয়ে ফেটে পড়া। এরাই হচ্ছে মজুর শ্রেণী যাদের নিয়ে আন্দোলন। নেতাদের ধারণা সর্বহারা মানে যার জীবনী সংগ্রহের একমাত্র পথ শারীরিক শ্রম বিনিময়। কিন্তু এর যে একটা বৃহৎ দিক আছে, এরা যে ইতিহাস জানে না, রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় বিধান কোন কিছুতেই মন নেই, কেবল আছে সংখ্যা। বিরাট এবং প্রচণ্ড। এরা চায় এদের ক্ষেপিয়ে তুলতে, লোভ দেখিয়ে লাভ দেখিয়ে প্রতিমুহূর্তে উত্তেজনা দিয়ে, প্রতিমুহূর্তে লড়াই লড়াই ব'লে মাতিয়ে রেখে একদিন এই বিরাট ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলে এরা ভাবে সেই একদিনে বাজিমাত্‌ ক'রে ফেলবে। সেদিন চূড়ান্ত ধ্বংসের মাঝ থেকে এরা সোনার অতীত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। যেন শ' কয়েক ধনী লোক, শ' কয়েক শাসক, কয়েক শ' বা সহস্র বিরোধীদলের লোককে খুন ক'রে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় শাসনের আস্তানা-গুলি দখল করে কলকারখানা দখল ক'রে আর লক্ষ লক্ষ কৃষকের মাঝে জমি বিলি ক'রে দিলেই বিপ্লব হ'য়ে গেল। বিপ্লবের প্রথম ধাপের পত্তনি হ'য়ে গেল। তারপর? তারপর আর কি, প্ল্যান কর আর দেশশুদ্ধ সর্বহারাদের পরিচালনা কর। এ একেবারে ছকে বাধা প্ল্যান করা। এতে কোন খুঁৎ নেই। বুঝতে পেরেছেন কি আমরা চাই?

বুঝতে ঠিক না পারলেও (এমন দীর্ঘ ভাষণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না) মাথা নেড়ে জানালাম: পেরেছি। কাগজওয়ালা মৃদু হেসে বল্লো, প্ল্যান তো নিখুঁৎ, কিন্তু যত মুস্কিল ঐ সর্বহারাদের নিয়ে। ওদের দিয়ে যে বিপ্লব করাতে হবে! নিজেরা করলেই তো হবে না। করাতে হবে। এখন এই করানর কাজটা আরম্ভ ক'রতে গিয়েই যত গেরো। সে গেরো কেবলই ফস্কে যায়। ফস্কে যেতে যেতে আবার

নূতন পথ নূতন মত বার ক'রে কর্তারা আমাদের চালু ক'রে তোলেন, চাঙা ক'রে তোলেন—আবার নূতন ক'রে কোমর বেঁধে আমরা লেগে পড়ি। কনভেনশনের মহৎ উদ্দেশ্যটা এই! কর্তাদের বুকনি শোনা। বুঝি না বুঝি আমরাও বেশ কিছুটা বকবো, বক্তৃতা দেবো, তারপর নবীন দৃষ্টি নিয়ে ফিরে আসবো।

ইচ্ছে হোল জিজ্ঞেস করি, কর্তাটা কারা? আর আমরাই বা কারা? কিন্তু কাগজওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস ক'রতে ভরসা হোলনা। বুঝলাম এ আমার বি,.এস-সি পরীক্ষার চেয়েও জটিল ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমার চেয়ে কাগজ-ওয়ালার দখল বেশী। আর তাছাড়া এ বিষয়ে নিয়ে উত্তেজিত হওয়ার মত সঠিক জ্ঞান আমার তখনও হয়নি। কথায় কথায় যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ ক'রে গেল কাগজওয়ালা, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় বিধান,—তার কোন একটি নিয়েও আমার জ্ঞান তো ছিলই না আগ্রহও ছিল কিনা সন্দেহ। কাগজওয়ালা চুপ করে একটু অন্যমনস্ক হ'য়েই আছে। চায়ের দোকানে ক্রমে ভিড় বেড়ে উঠছে। বেলা পড়ে ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যের দিকে চলছে। একবার ইচ্ছে হোল বলি, আপনি কথাগুলি বলেছেন বেশ ভালই। আমি বুঝতে পারিনি বটে, তবে বুঝেছি কথাগুলি বেশ। কিন্তু এ হচ্ছে অযৌক্তিক কথা, এরকম কথা মনে এলেও মুখে আনা যায় না।

প্রসঙ্গ একেবারে বদ্‌লে দিয়ে একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্লাম, তা হ'লে ছুটিতে পড়তে পারছেন না। কাগজওয়ালা দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে ফেল্লো আমার দিকে। তারপর সোজা হয়ে বসে বল্লো, পড়তে হবেই।

চায়ের দাম আগেই দেওয়া হয়েছিল। কথাটা বলতে বলতে কাগজওয়ালা উঠে পড়ছিল। আমি বল্লাম, এখনই উঠবেন? বসুন বসুন! আবার সেই ছুটির পর তো দেখা হবে।

কাগজওয়ালা বসে পড়ে বল্লো, কিছু বলবেন বুঝি ?

স্বীকার করলাম কিছু বলার জন্যই বসিয়েছি। বল্লাম, আচ্ছা মালতীর খবর কি ? অনেককাল দেখিনি। ভাল আছে ?

কাগজওয়ালা সহজভাবে বলে, উঁ তা ভালই আছে। অসুখ করেনি। But.....।

But বলে আমার দিকে তাকিয়ে কাগজওয়ালা যেন হঠাৎ বলে ফেল্লো, ঐ রমেশ ছোঁড়াটা জ্বালিয়ে মারলে। কি বলবো যেমন বোকা তেমনি বোকার মত চালাক, কিন্তু প্যাচ আছেই। প্যাচের ডিপো একটা।

একটু থেমে বল্লো, And he is cruel too !

এই শেষ কথাটায় কি জানি ছিল আমি মনে মনে বেশ হকচকিয়ে গেলাম। বল্লাম, cruel মানে ? কি করে ?

কাগজওয়ালা নিস্পৃহভাবে বল্লো, সে শুনলেও আপনার খারাপ লাগবে। এমনিতে যত কিছু করার আছে, এই চিঠি পত্তর পড়া, স্পাই লাগান, এসব তো আছেই। তাছাড়া, will you believe it ? মারধরও করে। বড় ভাই ছোট বোন। কারণে অকারণে শাসন ধমক ধামক কিল চড় চাপড়, এইতো দিন কয় আগে বেতও মেরেছে।

চকিতে কি ভেবে নিয়ে বল্লাম, কেন বাড়ীতে আর লোক নেই ? তারা কিছু বলেনা ? দেখেনা ? একটা বয়স্থা মেয়েকে ! এ কি ক'রে সম্ভব ?

কাগজওয়ালা বল্লো খুব শান্ত গলায়, সম্ভব। বাড়ীতে লোকজন আছে সত্যি কিন্তু, কিন্তু কেন বুঝতে পারছেন না ? এ যে টেপা কল। মার খেয়েও চুপ থাকবে, তা নইলে, যদি সবাই জেনে যায় ? বাড়ীর লোক জেনে যাবে। পাড়ার লোক জেনে যাবে। তাহ'লে যে,···মেয়েদের

চেনেন তো? আগুনে পুড়ে মরবে তবু লোক লজ্জার ভয় যাবে না। এ আমি ঠিক বুঝি না, আপনাকে বুঝিয়ে বলবো কি ক'রে?

মাথা নিচু ক'রে বসে রইলো কাগজওয়ালা খানিকক্ষণ, তারপর কি যেন ভেবে দেখে মাথা তুলে বল্লো, এ আমার চরম লজ্জার কথা।

একটু চুপ থেকে খানিকটা নিজে নিজেই বল্লো, কি করলে যে ভাল হয় তাও জানিনা।

আমি নিরুত্তর নীরব। কথা বলবার মত কথা পেলাম না। বোধ হয় সে ইচ্ছাও ছিলনা। যৌবনের প্রাণচঞ্চল উচ্ছ্বাসে যা একান্ত সুন্দর আর সহজ মনে হ'য়েছিল মানুষে মানুষে সম্পর্কের জটিলতায় আর সমাজের বর্বরযুগীয় নিয়মের অনুসরণে আজ তা নিতান্ত নিষ্ঠুর এবং কদর্য যদি হয়ে থাকে আমি বিংশ বর্ষীয় যুবক পথের সন্ধান দি কি ক'রে?

আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কাগজওয়ালা এক সময়ে বল্লো, চলুন ওঠা যাক।

উঠে পড়লাম। বেরিয়ে এলাম। কাগজওয়ালা চলেও গেল। কিন্তু মালতীর কথা ভুলতে পারলাম না।

তারপর কলেজে শেষ ক্লাশ। সেদিন ক্লাশ শেষে কাগজওয়ালা আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি ক'লকাতায় ফিরছেন কবে?

বল্লাম, কবে ফিরবো ঠিক নেই। দিন দশ পনরো পরই।' একটু ইতস্তত ক'রে কাগজওয়ালা বল্লো, আমাকে চিঠি দিয়ে জানাবেন।

বল্লাম, জানাবো।

কাগজওয়ালা চলে যেতে যেতে ইচ্ছে হোল ডেকে আনি। মালতীর কথাটা একবার জেনে যাই। কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই তো গলায় সেই ফাঁস উঠে আসবে। কলেজের গেট থেকে ফিরে এলাম ভেতরে। দেখা হ'ল রমেশের সঙ্গে। ইন্দু বল্লো আগামী টেস্ট পরীক্ষার কথা।

রমেশ জানালো থিয়েটারের ব্যবস্থা পাকাপাকি হ'য়ে গেছে। দেখা আরও অনেকের সঙ্গে হ'লো। এই ছুটির আরম্ভে আমরা যেন প্রত্যেকে একটা ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে কথা কইলাম। কে কোথায় যাচ্ছে? কি রকম পড়াশুনা সম্ভব হবে ছুটির সময়? রমেন বল্লো বঙ্কুর কথা। বীরেন্দ্র নামে একটি ছেলের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তাম, এই পরিচয়। আজ তার সঙ্গেও কিছু আলাপ আলোচনা হোল। রমাপতিও একটু ঠাট্টা ইয়ারকি ক'রলো সহজভাবে। তবে সে খোলা মানুষ। সোজাসুজি জানিয়ে দিলো ঐ থিয়েটারওয়ালাদের একবার বাগে পেলে সে দেখে নেবে।

বোধ হয় হাওড়া ষ্টেশনের ভিড় হৈ হট্টগোলের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে কামরায় জায়গা নিতে গিয়ে কলেজ জীবনটাকে পেছনে রেখে চলে গিয়েছিলাম। ক'লকাতা ছেড়ে যেতে যেতে মালতী, কাগজওয়ালা, বঙ্কু, রমাপতি, রমেশ আর রমেন ইন্দু এদের সবাইকে দূরে সরিয়ে দিয়ে চলে গেলাম। অন্ততঃ যে তীব্রতার সঙ্গে এদের সম্বন্ধে অনুভূতি কাজ করছিল, তা অনেকটা স্তিমিত হ'য়ে পড়লো। খুব দূরে নয়, সাঁওতাল পরগণায় ছোট বড় নানা সহরে ঘুরে বেড়ালাম। দু'দিন এখানে, চারদিন অন্যখানে। এই ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনের জন্যেও মালতী আর কাগজওয়ালার বেদনার্ত সমস্যাটা যেন তেমন নাড়া দিয়ে তুলতে পারলো না। পদ্মার পাড়কে মনে হোল ছবির মত। অসুস্থ বঙ্কু যেন দীর্ঘকালের রোগী। রাতের গভীরে ট্রেণের জানালা দিয়ে ওপরের তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন বঙ্কুর হাসিমুখ দেখতে পেতাম। কদাচিৎ রাত্রি শেষ দিকচক্রবালের পাণ্ডুর আলোকে মনে হতো কাগজওয়ালা আর মালতী পাশাপাশি চলেছে। দূরে দূরে সুপ্ত গ্রাম। শিশিরে ভেজা উঁচুনিচু ঘাসে ভরা

মাঠ আর শাল বন। শরতের মোলায়েম শীতভাব। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম আর ভাবতাম কত সুন্দর এই পৃথিবী আরও কত সুন্দর হ'তে পারে!

আশ্বিনের শেষ দিকে একদিন সকালে ক'লকাতায় ফিরে এলাম। কলেজ খুলতে তখনও দশ বারদিন বাকি। এই ক'দিন বেশ কিছুটা পড়ে ফেলবো এমনি একটা সঙ্কল্প নিয়ে মেসে এসে উঠলাম। মেস্ প্রায় ফাঁকা। দু'চারজন বোর্ডার আছেন মাত্র। তারা থাকেন মেসে, খেয়ে আসেন বাইরে থেকে। আমার রুমমেট আসতে তখনও বেশ দেরী। নীরব নিঃঝুম মেসের ঘরে এসে মনে হোল যেন বাড়ী ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে চেয়ারে বসে চৌকিতে পা দিয়ে আরাম ক'রে সিগ্রেট টানছি আর কোলের উপর খোলা বই থেকে দু'চার লাইন পড়ছি। ক'লকাতায় ফেরার আগেই কাগজওয়ালাকে চিঠি দিয়ে এসেছিলাম। বই পড়তে পড়তে মনে মনে আশা করছি কাগজওয়ালা এসে যেতেও পারে। মন্দ হয়না। বেশ খানিকটা গল্প-সল্প করা যায়। আবার একটু আশঙ্কাও হচ্ছিল গল্প কি হবে? আজকাল কাগজওয়ালা যেমন হয়ে উঠেছে—দু'চার কথা বলতে বলতেই হয়তো বক্তৃতা আরম্ভ ক'রে দেবে, কিংবা কোন কথাই বলবেনা; হুঁ হাঁ না ব'লেই কাটিয়ে দেবে সময়। বক্তৃতাগুলি অবিশ্যি মন্দ লাগেনা, কিন্তু সব সময় নয়। গল্প-সল্প বলতে যা বোঝায় তাতে বক্তৃতার গুরুত্ব নেই যুক্তি-তর্কের ঝাঁজও নেই। তবু কাগজওয়ালা আসতে পারে এই আশাটা মনে মনে ক্ষীণধারার মত বয়ে চলছে।

নিচে সিঁড়ির গোড়া থেকে আমার নাম ধরে কে যেন হাঁক ডাক করছে। উঠে গেলাম। সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় একটি লোক। গায়ে ফতুয়া। মস্ত একজোড়া গোঁফ। গায়ের রং ঘোর

কালো। পরনের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত। চেহারা-ছবি দেখতে দেখতে লোকটা ওপরে উঠে এলো। লোকটা কথা কইলো বাংলায় কিন্তু পোষাক দেখে আর বলার ধরণে বুঝলাম বাড়ী তার বিহারে।

আমার নাম নিয়ে বল্লো এখানে কেউ থাকে? আমি তাকে পরিচয় দিলাম তার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করলাম। আমার পরিচয় শুনে আমাকে লোকটা মাথা থেকে পা অবধি না হ'লেও কোমর পর্যন্ত বেশ নজর ক'রে দেখলো, তারপর বেশ কাছে এগিয়ে এসে বল্লো, আমার নাম বিঠুয়া। গলা নামিয়ে বল্লো, দিদিমণির খুব ব্যারাম। হাসপাতালে আছে। আপনি একবার যাবেন।

অবাক হ'য়ে বল্লাম, দিদিমণি কে?

বিঠুয়া চকিতে আমাকে আর একবার বেশ ক'রে দেখে নিয়ে বল্লো, মালতী দিদিমণি। রমেশ দাদাবাবুর বোন। আপনার ঠিকানা নম্বর আর নামতো দিদিমণি বল্লো আমাকে। খবর দিতে বল্লো।

বল্লাম, কি অসুখ তোমার দিদিমণির? হাসপাতালে কেন? রমেশ বাবু কোথায়?

বিঠুয়া বেশ একটু মাথা নেড়ে বল্লো, বাড়ীতে কেউ নেই। সব হাওয়া খেতে মধুপুর চলে গিয়েছে। রমেশদা ছিল, আমি ছিলাম, আর দিদিমণি। কাল বিকেলে আমি দিদিমণিকে হাসপাতাল নিয়ে গেলাম। আর রমেশদা আজ টেলিগেরাম করে দিয়েছে।

বিঠুয়াকে নিয়ে ঘরের ভিতরে এসে বসলাম। তক্তপোশের একপাশে তাকে বসিয়ে বল্লাম, তোমার দিদিমণির অসুখটা কি হয়েছে?

বিঠুয়া মাথা নেড়ে বল্লো, সে তো আমি জানিনা।

ধৈর্য ধরে আবার বল্লাম, কলেরা হয়েছে, বসন্ত হয়েছে, নাকি পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে···

বলতে বলতে বিঠুয়া বলে উঠলো, হাঁ হাঁ ঐ।

হাত ভেঙেছে ?

হাত ভাঙতে পারে, বুকের ভেতরে ব্যারাম হ'তে পারে, তবে আমি ঠিক জানিনা। তবে খুব খুন গিয়েছে আর দিদিমণির তবিয়ৎ খুব খারাপ হয়েছে।

হঠাৎ কি করে হোল ?

প্রৌঢ় বিহারবাসী মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লো, তাও আমি জানিনা।

বুঝলাম বিঠুয়া যতটা জানে ততটাও জানেনা বলছে। একটু ভেবে নিয়ে বল্লাম, আচ্ছা বিকেলে হাসপাতাল খুল্লে আমি যাবো।

বিঠুয়া চলে গেল। আমি একটা জামা গায় দিয়ে ছুটলাম ভবানীপুরে কাগজওয়ালার কাছে। কাগজওয়ালার মার কাছে শুনলাম কাগজওয়ালা দিন সাতেক হোল দিল্লী গিয়েছে, আসবে আর দু'এক দিনের মধ্যেই। এলেই যেন আমার সঙ্গে দেখা ক'রে বলে দিয়ে চলে এলাম। ফেরার পথে একবার হাসপাতালের দরজা ঘুরে গেলাম। নোটিশে পরিষ্কার লেখা রয়েছে, বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টা। তবু ভেতরে ঢুকে এ জানালায়, ও জানালায় একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। উত্তরে ধমক খেয়ে মুখ বুজে চলে এলাম।

মেসে ফিরতে ফিরতে খেয়াল হ'ল কাগজওয়ালার ঠিকানা নিয়ে একটা চিঠি কিংবা টেলিগ্রাম করে দিলে হ'ত। তখনই আবার যেতে ইচ্ছে হ'লনা। তাছাড়া ব্যাপারটা বড় রহস্যময় মনে হোল। অসুখ নয়, কোন রকম অ্যাক্সিডেণ্ট হওয়া সম্ভব। অথচ ও বেটা তাও পরিষ্কার কিছু বল্লে না। অ্যাকসিডেণ্ট যদি হ'য়েই থাকে তাহ'লে সেটা কতটা গুরুতর তাও বিঠুয়া কিছু বল্লেনা বা বলতে পারলেনা। আর একটা বিষয় খেয়াল হ'ল বিকেলের দিকে যখন ভবানীপুরে যাচ্ছি তখন। রমেশ রয়েছে ক'লকাতায়। সে নিশ্চয়ই বোনকে দেখতে যাবে। সেই

সঙ্গে আমিও যদি যাই তাহ'লে সেতো বড় সুবিধের হবেনা। অথচ খবর দিয়েছে দেখে আসবার জন্য।

বাসটা তার স্বাভাবিক গতিতেই চলছে, কিন্তু আমি মনে মনে চলছি ধীরে ধীরে। এ যে কি হ'তে কি হ'ল কিছুই ঠাহর ক'রতে পারছিনা। অন্ততঃ মালতীর পাশে রমেশের সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে গেলে কিছু একটা বলতে হবে কিন্তু সে কথাটা কি তাও যে গুছিয়ে নিতে পারছিনা। বাস থেকে নেমে কাগজওয়ালার বাড়ী পর্যন্ত গেলাম এই জটিলতার জালে জড়িয়ে। সেখানে কাগজওয়ালার ঠিকানা নিয়ে ডাকঘরে গেলাম। সাত পাঁচ ভেবে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলাম। হাতে তখনও সময় ছিল। বেশ ভালভাবে ব্যাপারটার হদিশ ক'রতে একটা চায়ের দোকানে এসে বসলাম। কাপ দুয়েক চা খেয়ে গোটা তিন চার সিগ্রেট পুড়িয়ে প্রথমে যতটা বুঝেছিলাম তার বেশী এতটুকুও বুঝলামনা।

অতএব অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্তভাবে পায়ের পর পা ফেলে পাঁচটার বেশ একটু আগেই হাসপাতালের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। দেখি বিন্দুয়া আমারও আগে এসে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে দূরে একটা ফাঁকা যায়গায় আমাকে ডেকে নিয়ে বল্লে: দাদাবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়েছে। আজই দশ বাজে পুলিশের লোক এসে দাদাবাবুকে খোঁজ করলো। আমি বল্লাম দাদাবাবু আছে। দাদাবাবুকে ডেকে দিতে কি সব বল্লো তারপর থানায় নিয়ে গেল। আমিও থানায় গেলাম। তাতো দাদাবাবুকে ছাড়লোনা। দাদাবাবু আমাকে বল্লো মেজবাবু এলে খবর দিতে। আমাকে বাড়ী যেতে বল্লো। আমি বাড়ী চলে আসছি। দিদিমণিকে এখন কি বলবো ?

মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল লোকটা পাগল নয়তো ? আমাকে বিভ্রান্ত করতে বানিয়ে বলছে না তো ? রমেশের চক্রান্তে পড়ে আমি,

পাক খাচ্ছি না তো? বিঠুয়াকে ভাল ক'রে দেখলাম। সে মুখে জাল জুয়োচুরি কিংবা পাগলামির আভাষ পেলাম না। অত্যন্ত করুণ মুখ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি প্রশ্ন করলাম, তোমার দাদাবাবুকে ধরেছে কেন?

মাথা নেড়ে বল্লো, আমি জানিনা।

থানায় গেলে পুলিশের লোকের কথাবার্তা শুনলে তবু বুঝলে না?

একটা হাত তুলে কি একটা ভঙ্গী ক'রে বল্লো, পুলিশের লোক কত কিছু বলে. তাতে বিশ্বাস কি?

বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গে বল্লাম, এখন দিদিমণি যদি জিজ্ঞেস করে রমেশবাবুর কথা, কি বলবে?

বিঠুয়া দেখলাম তাও ভেবে রেখেছে। অনায়াসে বল্লো. সে একটা কিছু বলবো। পুলিশের কথা বলবোনা। তা দাদাবাবুর কি হবে?

কি হবে তা আমার জানার কথা নয়। বল্লাম, টেলিগ্রাম তো ক'রেই দিয়েছো। কাকে করেছো? মেজবাবুকে?

বিঠুয়া বল্লো, মেজবাবু হোল বড়বাবুর মেজভাই। দাদাবাবুর কাকা। মেজবাবু থাকলে কি আর এসব হয়? মেজবাবু দু'দিনের জন্যে গিয়েছেন আর দেখুন কত কাণ্ড হ'য়ে গেল।

উত্তর দিলাম না। উত্তর দেবার কিছু ছিলনা। গেটের আশে পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে বিঠুয়াকে নিয়ে ভেতরে গেলাম। বেড্ নাম্বার বিঠুয়ার জানা ছিল। তাকেই অনুসরণ করে একতলার লম্বা একটা ঘরের ভেতরে দু'পাশে রোগিনীদের সারির মাঝ দিয়ে মালতীর বেডের পাশে এসে দাঁড়ালাম। মালতী চোখ বুজে শুয়ে আছে। মুখটা প্রায় রক্তশূন্য। গায়ে একটা কম্বল ঢাকা। একটা হাত বাইরে বেরিয়ে আছে। চোখ বুজে আছে বটে কিন্তু ঘুমিয়ে ছিলনা।

আমরা পাশে দাঁড়াতে বোধ হয় পায়ের শব্দ শুনে চোখ খুলে তাকালো। নীরবে আমাকে দেখলো। নীরবে বিঠুয়াকে দেখলো। বিঠুয়া খাটের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু ক'রে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছ দিদিমণি?

মৃদু একটু হাসলো মালতী। আমিও তখন খাটটা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছি। মালতী হাতের ইঙ্গিত করে পাশে বসতে বল্লো। বসলাম পাশে। বল্লাম, কি হয়েছে আপনার?

মালতী আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু গলায় বল্লো, জানিনা।

আমি মালতীর দিকে তাকিয়ে আছি যেন যতটা সম্ভব চোখ দিয়ে দেখে ব্যাপারটা আন্দাজ করবো। মালতীর ঠোঁট নড়ে উঠলো। কি যেন বল্লো, বুঝতে পারলাম না। মাথা নিচু ক'রে আবার শুনলাম। মালতী বলছে, দাদা মেরেছে। ...ও কি ক'লকাতায়?

মাথা নেড়ে বল্লাম, দিল্লী গেছে। চিঠি দিয়েছি।

মালতী যেন বুঝতেই পারেনি এমনিভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি আবার বল্লাম, এলে দেখা করবে আপনার সঙ্গে। মালতী বল্লো, আচ্ছা।

আচ্ছা বলে আবার চোখ বুজে রইলো। বিঠুয়া খাটের এপাশ থেকে ওপাশে সরে গিয়ে আমাকে বল্লো, কোন ডাক্তারকে ডেকে জানবো দিদিমণি কেমন আছে?

বল্লাম, চেষ্টা করে দেখো।

বিঠুয়া চলে গেল ডাক্তারের খোঁজে। আমি বসে আছি মালতীর পাশে। মনে হোল ও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু পরে মালতী চোখ খুলে তাকালো। তাকিয়ে আমাকে যেন ঠাহর ক'রে দেখলো। তারপর আস্তে আস্তে বল্লো, দাদা এলোনা?

চট্ করে জবাব খুঁজে পেলাম না। একটু ইতস্তত করে বল্লাম, আসবে হয়তো পরে।

মালতী তাকিয়েই রইলো। যেন তখনও কথাটা বুঝতে চাইছে। তারপর মৃদুকণ্ঠে আবার কি যেন বল্লো বুঝতে পারলাম না। মাথা নিচু ক'রে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম বলছে, আমার বড্ড লেগেছে। বড় ভয় লাগছে। ওকে বলবেন দাদাকে যেন মারধর না করে।

বল্লাম, বলবো।

আমি সত্যি বলবো কিনা এইটাই যেন মালতী আমাকে দেখে বুঝে নিল তারপর ধীরে ধীরে ডান হাতটা বুকের উপর টেনে নিয়ে চোখ বুজলো।

পায়ের শব্দে চোখ তুলে দেখি বিঠ্ঠুয়া আসছে সঙ্গে আসছে এক মেমসাহেব নার্স। মালতীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে মেমসাহেব বিঠ্ঠুয়াকে হিন্দীতে বল্লো ভয় পাবার কিছু নেই। আমার দিকে তাকিয়ে বল্লো ইংরেজীতে যে কেসটা বড় রহস্যময়। আমি কে? কোন আত্মীয় কি?

বল্লাম, আত্মীয় বটে, তবে আমিও এ ব্যাপারে একেবারে অন্ধকারে। প্রশ্ন করলাম বিপদ আছে কি? ঠিক কি হয়েছে?

মেম সাহেব উত্তরে বল্লো, ঠিক কি হয়েছে সে জানেনা। তবে বিপদ আছে এটা সত্যি। তোমাদের রেসিডেন্ট সার্জেনের সঙ্গে দেখা করা উচিত।

একটু চুপ থেকে আমাদের যতটা সম্ভব শিগ্‌গির চলে যেতে বল্লো নতুবা রোগিনী ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে।

চলে যেতে যেতে ফিরে এসে বল্লো, ওকে কেবিনে রাখা উচিত। সর্বক্ষণ নার্সিং দরকার। তোমরা এটা ভেবে দেখো।

মেমসাহেব চলে যেতে দেখলাম মালতী চোখ খুলে তাকিয়ে আছে।

বিঠ্ঠুয়া মেমসাহেবের কথা কি বুঝেছিল জানিনা কিন্তু যাওয়ার

কথায় কিছু আপত্তি করলো না। মালতীকে বল্লাম শান্তভাবে, আপনার বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে, আপনি ঘুমিয়ে থাকুন! ভয়ের কিছু নেই। আমরা আবার কাল আসবো।

মালতী বল্লো, ওকে নিয়ে আসবেন?

বল্লাম, যদি ক'লকাতায় এসে যায়, তাহ'লে নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো।

বিঠুয়া বল্লো, মেজবাবু কাল এসে যাবে দিদিমণি। ভয় কিছু নেই।

মালতী বল্লো, কাল এসো বিঠুয়া।

আমরা বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে রেসিডেন্ট সার্জেনের খোঁজ করলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তখন দেখা করা হ'লনা। তিনি কাল সকালের আগে দেখা দিতে পারবেন না। রাস্তায় আসতে আসতে বিঠুয়া কেঁদে ফেল্লো। বল্লো, মেমসাহেব বলছে পুলিশ ডাকবে। আমাকে বড় ভয় দেখিয়েছে।

রাস্তায় পা দিয়ে আমি বল্লাম, কি হয়েছিল বলতো, তুমি যেন জেনেও বলছোনা?

বিঠুয়া চোখের জল মুছে যা বল্লো তার সারমর্ম মালতীর কথা থেকেই বুঝেছিলাম। আগের দিন দুপুরে বিঠুয়া গিয়েছিল এক দেশোয়ালি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে আসে বিকেল পাঁচটায়। ফিরে এসে দেখে দিদিমণি পড়ে আছে বারান্দায়। কাপড় রক্তে ভেসে গিয়েছে। গায়ের জামা কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে। দিদিমণির হুঁস নেই। পাড়ার এক ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসে সে। ডাক্তারবাবু আর সে ধরাধরি ক'রে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেয়। তারপর ওষুধ-বিষুধ দিয়ে ডাক্তারবাবু হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। রমেশবাবু তখন বাড়ী ছিলনা। রাত্তিরে রমেশ বাবু ফিরে এলে বিঠুয়া তাকে সব বলে। রমেশ বাবু ডাক্তারের কাছে যায় তারপর মেজবাবুকে টেলিগ্রাম করে দেয়। তারপর আজ

সকালে পুলিশ এসে রমেশ বাবুকে ধরে নিয়ে গেছে। আর সে একলা মুখ্যু মানুষ, সে এখন কি করবে ?

আমি সব কথা শুনলাম, কিন্তু সবটা যেন বুঝতে পারলাম না। মালতী বলেছে দাদা মেরেছে। মারধর ক'রে রমেশ কি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ? কিন্তু পুলিশের লোক খবর পেল কি করে ? ডাক্তার কি খবর দিয়ে রমেশকে ধরিয়ে দিয়েছে ? আমি বিঠুয়াকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা বিঠুয়া পুলিশ রমেশবাবুকে ধরে নিয়ে গেল কেন ? তোমার দিদিমণিকে রমেশবাবু মেরেছিল এখবর পুলিশ কি ক'রে জানলো ?

বিঠুয়া উত্তরে বেশ কিছুটা খেদোক্তি করলে। বিশ বছর সে এ বাড়ীতে কাজ করছে। দাদাবাবুকে সে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। দিদিমণিকে সে আতুর ঘর থেকে বড় করেছে। আজ সেই দাদাবাবু এ কি কাণ্ড করলো ! খেদোক্তির পর সে পুলিশের লোককে গাল পাড়লে বেশ চোস্ত হিন্দীতে। তারপর যা বল্লে তার সত্যতা আমি আজও নিশ্চয়ভাবে জানিনা। রমেশবাবুকে পুলিশ ধরেছে মেয়ে চুরির দায়ে। দার্জিলিং থেকে কোন একটা নেপালী মেয়েকে নাকি রমেশবাবু আর তার এক সঙ্গী চুরি করে নিয়ে এসেছে। সে মেয়ের আপনার লোকেরা ক'লকাতায় এসে খোঁজ খবর করছিল। পুলিশে তারাই খবর দিয়েছে। পুলিশ আজ এসে রমেশবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে। তবে বিঠুয়ার বিশ্বাস এ ঘটনা একেবারে বানানো মিথ্যে কথা। তার দাদাবাবু ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিঠুয়াকে বিদায় দিয়ে একটা বাসে উঠে বসলাম। কোনো কিছু ভেবে দেখবার চেষ্টা আমার ছিলনা। বাসের জানলা দিয়ে দু'চোখকে ছেড়ে দিলাম যা দেখে দেখুক আর মনকে ছেড়ে দিলাম যা ভাবতে হয় ভাবুক। নজর নেই আমার কোন কিছুতেই মন নেই আমার

বিশেষ কোন দিকে। চোখে পড়ে গড়ের মাঠের সবুজ ঘাস। দূর সীমান্তে গঙ্গার ওপারে মেঘ জমেছে। আর মনে পড়ে শৈশবের ছবি। সেই যে ছোট বেলায় কবে সাঁতার কাটতে শিখলাম, কবে একা একা গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরেছিলাম। পাশের বাড়ীর সেই যে মেয়েটা যার নাম ছিল ইন্দু তার চোখ যেন ঠিক মালতীর মত। মালতী বাঁচবে তো? বাঁচবে নিশ্চয়ই কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে বাঁচবে কি? আমার ভয় হয় ভেতরে ভেতরে কি যেন ঘটে গিয়েছে মালতীর দেহে? বাবার সঙ্গে বাজারে গিয়ে সেই মাংস কিনতে গিয়েছিলাম। খাসি পাঁঠার রক্তাক্ত ধড়গুলি ঝুলিয়ে রেখেছে আর যকৃৎ প্লিহা আরও সব দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদি দেখলাম হঠাৎ চোখের উপরে বাসে চলতে চলতে। গাটা কেমন গুলিয়ে উঠলো। বাস্ থেকে নেমে পড়লাম চৌরঙ্গীর মোড়ে। তারপর প্রশস্ত চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মেসে ফিরলাম।

সে রাত্রে ঘুম হয়নি বলা চলেনা আবার ঘুম হয়েছিল বল্লেও মিথ্যে বলা হবে। রাত সাড়ে আটটা ন'টায় শুয়ে পড়েছিলাম। আর সারারাত এপাশ ওপাশ ক'রে কখনো ঘুমুচ্ছি কখনো ঘুমের একটা আচ্ছন্নভাবে চাপা পড়ে আছি। একেবারে রাত্রি ভোর হয় হয় তখন সত্যি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে।

বেলা তখন ন'টা হবে। জানালা দিয়ে রোদ মেজেতে গিয়ে পড়েছে। চোখ মুখ রগড়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দিলাম। ঘরে ঢুকলো কাগজওয়ালা।

শুধু বলতে পারায় শুধু মাত্র কাউকে বলে ফেল্লেই যে বোঝা কমে যায় এটা একেবারে 'হাতে হাতে' জানলাম সেইবার। কাগজওয়ালাকে দেখে তাকে আনুপূর্বিক সব বলতে পেরে আমি যেন খুশী হয়ে উঠলাম। যেন রাত্রির দুঃস্বপ্ন আমার কেটে গেল। কাগজওয়ালার হাতে চায়ের

পেয়ালা তুলে দিয়ে বল্লাম, আমার মনে হয় আমি পাগল হ'য়ে যেতাম। আপনি এসে পড়ায় যেন মুক্তি পেলাম।

মুখ বুজে একটি কথাও না বলে কাগজওয়ালা সব শুনলো। বোধ হয় সামান্য দু'একটি প্রশ্ন করেছিল। আমার কথা শেষ হয়েছে আন্দাজ ক'রে পেয়ালা নামিয়ে রেখে বল্লো, আপনার চিঠি পাইনি। পাওয়ার কথাও নয়।

তারপর একটু চুপ থেকে বল্লো, এসে যখন পড়েইছি ব্যবস্থা করবোই।

ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। হাসপাতালে এসে রেসিডেন্ট সার্জেনের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি একটু অপেক্ষা করতে বল্লেন। আমরা অপেক্ষা করছি বারান্দায় পায়চারি ক'রে। এরই মধ্যে দেখি বিঠুয়া আসছে সঙ্গে স্যুটপরা মধ্য বয়সের একজন দীর্ঘ চেহারার ভদ্রলোক। কাগজওয়ালা তাকে দেখে এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক কাগজওয়ালাকে চিনতেন। সংক্ষেপে কাগজওয়ালা তাকে ব্যাপারটা বল্লো। রেসিডেন্ট সার্জেনের সঙ্গে দেখা করার কথাও বল্লো। আমি গতকাল কি ভাবে খবর পেয়েছিলাম এবং মালতীকে দেখে কি মনে হয়েছিল তা বল্লাম। তিনি নিরুত্তরে সবই শুনলেন। তারপর আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। কাগজওয়ালা আমাকে বল্লো, চিনতে পারলেন? মালতীর কাকা। নিজেও ডাক্তার। হাসপাতালে ভাল ব্যবস্থাই করবেন।

বিঠুয়া একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদাবাবুর কথা বলেছো?

বিঠুয়া অবিশ্যি উত্তর দিলে বলেছে, কিন্তু ঐ সামান্য কথা থেকেই মনে হ'ল এ কালকের বিঠুয়া নয়। তার মেজবাবু এসে গিয়েছে এখন আর আমাদের সঙ্গে সে পরিচয়টা অন্ততঃ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা রাখতে চায়না।

ডাক্তারবাবু মালতীর কাকাও যে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকবেন এরকম ভাবা ভুল। তবু সেদিন বেলা দুপুর পর্যন্ত দুজনে অপেক্ষা করে রইলাম। বেলা প্রায় এগারোটায় ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। কাগজওয়ালাই এগিয়ে গিয়ে তাকে মালতীর কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি কাগজওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভেবে দেখলেন। তারপর পরিষ্কার ইংরেজীতে বল্লেন, মালতী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আজ বিকেলে যদি তুমি আস দেখা ক'রে যেতে পার।

কাগজওয়ালা বল্লো, কিন্তু মালতীর কি হয়েছে, কেমন সে আছে? ডাক্তারবাবু মৃদুভাবে বল্লেন, দেখা যাক।

বলে তিনি চলে গেলেন। সঙ্গে গেল বিঠ্ঠয়া। আমরাও গুটি গুটি চলে এলাম। কাগজওয়ালা চিন্তিত মুখে চলছে। আমিও চলছি পাশে পাশে। হঠাৎ কাগজওয়ালা পাশ ফিরে আমাকে বল্লো, আচ্ছা চলি। আমার অনেক কাজ। বিকেল পাঁচটায় আসবেন এখানে! মালতীকে দেখে যাবো।

সেদিন বিকেলে মালতীকে দেখতে এলাম আমরা দুজন। কেবিনে লোহার খাটে তুষারশুভ্র বিছানায় মালতী শুয়ে আছে। আমাদের দেখে বোধ হয় খুশী হয়েছিল। কাগজওয়ালাকে অনেকক্ষণ শুধু তাকিয়ে দেখলো তারপর মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, কাকার সঙ্গে দেখা করেছ?

কাগজওয়ালা মাথা নেড়ে বল্লো, করেছি। সে সব কথা পরে হবে। তুমি কেমন আছ?

মালতী বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বল্লো, পেটে বড় ব্যাথা। আর কি রকম যেন দুর্বল!

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়লো এমনিভাবে প্রশ্ন করলো, দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে? তাকে একবার আসতে বলবে?

কাগজওয়ালা উত্তর করলো, দেখা হয়নি। দাদার জন্য ভেবোনা সে আসবে।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মালতী ধীরে ধীরে বল্লো, দাদার উপর রাগ রেখোনা। দাদার সত্যি কোন দোষ নেই। আমি পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর কিছু মনে নেই। যখন বুঝলাম দেখি বিঠুয়া আমার মুখের উপর ঝুকে আছে। বিঠুয়াকে তোমার ঠিকানা দিয়েছিলাম। আর ঠিকানা দিয়েছিলাম ওর। চোখের ইঙ্গিতে আমাকে দেখিয়ে দিল মালতী। বিঠুয়া আমাকে হাসপাতালে নিয়ে এল। তারপর কত কি যে হয়ে গেল! আচ্ছা আমি ভাল হব কতদিনে? পরীক্ষা দিতে পারবো?

কাগজওয়ালা সংক্ষেপে বল্লো, পারবে। আজকে আর কথা নয়! ভাল হয়ে উঠলে সব শুনবো।

মালতী সত্যি চুপ হয়ে গেল। খানিক চোখ বুজে রইলো; মাঝে মধ্যে এ ও তা জিজ্ঞেস করলো। তারপর যেন ঘুমিয়েই পড়লো। আমরা বেরিয়ে এলাম পা টিপে টিপে।

বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তার গোলমাল এড়িয়ে একটা পার্কে এসে বসলাম। কাগজওয়ালা একটা বিড়ি ধরিয়ে বল্লো, ওর কাকার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কথাবার্তা হ'লো। আমাকেই তিনি দায়ী করলেন মালতীর জন্যে! আবার এও বল্লেন আমি যেন অন্ততঃ একবার ক'রে প্রতিদিন মালতীকে দেখে আসি।

আমি বল্লাম, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি কি ঘটেছিল বলুন তো? রমেশের মার খেয়েই কি এরকমটা হয়েছে! আর ঠিক ঠিক হয়েছে কি?

কাগজওয়ালা নিরুত্তর কিছুক্ষণ বসে থেকে বল্লো, রমেশের মার খেয়ে তো বটেই, তাছাড়া ঐতো শুনলেন পড়ে গিয়েছিল। তবে কি ক'রে কি হয়েছিল সেটা জানে রমেশ। সে এখন হাজতবাস করছে।

আর জানে মালতী সে এখন কেবিনে প্রায় অচৈতন্য। ওর ডাক্তার কাকা বল্লেন যা-ই হয়ে থাক সেরে উঠবে। আর কিছু বল্লেন না। বল্লেননা বোধ হয় ডাক্তারদের ঐরকম স্বভাব ব'লে আর খানিকটা আমি বাইরের লোক বলে।

আমি বল্লাম, যাই বলুন ওর কাকা লোকবেশ ভাল। তা নইলে··· ।

কাগজওয়ালা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লো, ভাল বলেন কাকে ? মন্দ বলেন কাকে ? ভাল কবিতার মতই ভাল মানুষের definition দেওয়া যায় না। শুধু বলতে পারেন ও যখন যার ভাল লাগে তখনই ভাল। মানুষও ভাল কবিতাও ভাল। ওর কাকাকে ভাল বলছেন বলুন। আমি বলবো অবস্থার দাস। তবে বুদ্ধিমান দাসত্ব বটে। অবস্থা অনুসারেই চলেন তবে অবস্থাকে বুঝে চলেন। আজ এ অবস্থায় মালতীর ভালর জন্যেই আমার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা দরকার। মালতীর সঙ্গে আমাকে দেখা ক'রতে দেওয়া দরকার। তিনি জেদের বশে তা বন্ধ করেন নি।

তর্ক করতে পারতাম কাগজওয়ালার সঙ্গে ওর বক্তব্য নিয়ে কিন্তু তর্ক করতে ইচ্ছে হ'লনা। আমি বল্লাম, ঐ রকম লোককেই আমরা ভাল বলি।

কাগজওয়ালা বিড়িটা ফেলে দিয়ে বল্লো, যদি প্রশ্ন করি কেন বলেন তবে কিন্তু উত্তর দিতে পারবেন না।

ব'লে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি অন্য কথা পাড়লাম। রমেশের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

কাগজওয়ালা বল্লো, আপনি যতটা জানেন, আমিও ঠিক তাই। এ নিয়ে কিছু জানতে চাওয়াটা, বুঝতেই পারেন, ভাল দেখায় না। ওর কাকার দু' একটি মন্তব্য থেকে বুঝলাম রমেশের সম্বন্ধে তিনি কর্তব্য পালনে ব্যগ্র তার বেশী কিছু নয়।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছিলো। আমাকে টিউশন করতে যেতে হবে। আমি উঠে পড়লাম। কাগজওয়ালাও যাবে তার ছাত্র পড়াতে। সেও নীরবে বেরিয়ে এল পার্ক থেকে। আবার পরদিন দেখা হবে ব'লে আমরা চলে গেলাম।

ক্রমে এটাই একটা রুটিনে এসে দাঁড়ালো। বিকেলের দিকে মালতীকে দেখতে যাই। কাগজওয়ালা আসে। আধঘণ্টা একঘণ্টা মালতীর কেবিনে থাকি। তারপর বেরিয়ে এসে বসি এই পার্কে। কিছু কথাবার্তা হয় কিছু ভবিষ্যৎ আলোচনাও হয় তারপর চলে যাই যে যার কাজে। রুটিনের ব্যাঘাত ঘটলো দিন দুই। একদিন হ'ল মালতীর অপারেশন আর দ্বিতীয় দিনও দেখা করতে দিলে না। ঐ দু'দিন ছাড়া প্রতিদিন প্রায় একমাস পযন্ত আমরা যেতাম, বসতাম, কিন্তু কথাবার্তা বলতো কাগজওয়ালা আর মালতী। আমি শুনতাম। ওদের সঙ্গে একই কেবিনে বসে থাকতাম বটে, কিন্তু যেন এক সঙ্গে থাকতাম না। এখানে এলে ওরা একা। এ নিয়ে আমার মনে দ্বিধা উঠেছিল সত্যি। এবং সেজন্য একদিন আমি গেলাম না। কিন্তু পরদিন এসে কাগজওয়ালা ধরে নিয়ে গেল। গেলাম সঙ্গে। মৃদু আপত্তি জানিয়ে-ছিলাম। তাতে খুব ফল হ'লনা। কাগজওয়ালা বোধ হয় আন্দাজ ক'রেছিল। সেদিন পার্কে বসে বলেছিল, খুব স্বার্থপর মনে হয়, হয় না?

আমতা আমতা ক'রে উত্তর দিলাম, না তা নয়। তবে আমার উপস্থিত থাকার প্রয়োজন যেমন দেখিনা, আপনাদের কথাবার্তায় ব্যাঘাতও নিশ্চয়ই হয়।

কাগজওয়ালা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বল্লে, খুব যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছেন, কিন্তু আপনার যাওয়াটাই আমাদের পছন্দ।' আমার কথা থাক, মালতীর নিশ্চয়ই ইচ্ছে হয় আপনিও যান। এর কারণ ঠিক কি

আমি বলতে পারছিনা, তবে মালতীর হয়তো ধারণা আপনি উপস্থিত থাকলে সেটা সামাজিক আর না থাকলে সেটা ব্যক্তিগত। এবং এখনও ব্যক্তিগত সম্পর্কটা খোলাখুলিভাবে মালতী চায় না।

স্ত্রীলোকের মন নিয়ে আমার অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব, অতএব কাগজওয়ালার ভাষ্য সেদিন মেনে নিলাম। দু' একদিন এ নিয়ে মালতীকে জিজ্ঞেস ক'রতে গিয়েও জিজ্ঞেস করিনি। একদিনের কথা আমার মনে আছে। সেদিন কলেজ ছুটি হওয়ার আগেই কাগজওয়ালা তার বিশেষ কাজে চলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল হাসপাতালে যাবে সে একটু দেরীতে। আমি যেন অপেক্ষা না ক'রেই চলে যাই। তাই গেলাম। ভাবতে ভাবতে গেলাম আজকে বলেই ফেলবো। দেখি মালতী কি জবাব দেয়।

কিন্তু সেদিন কেবিনে ঢুকতে গিয়ে দেখি রমেশ বসে। রমেশকে হঠাৎ দেখে একেবারে চমকে গেলাম। ইতিমধ্যে অবিশ্যি শুনেছিলাম তার কাকা তাকে বেল্ নিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। কেস্ চলছে। শুনেছিলাম, তবে রমেশের সঙ্গে দেখা হয়নি। কলেজে সে তখনও যায় নি। হাসপাতালে বোনকে দেখতে আসতো সকালে কিংবা দুপুরে। কথাটা মালতী একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল কাগজওয়ালাকে। তারই ভয়ে রমেশ নাকি বিকেলের দিকে আসেনা।

হঠাৎ রমেশের সঙ্গে দেখ হ'য়ে যেতে কি বলবো ভেবে পেলাম না। তাছাড়া মালতী রমেশের বোন। আমি কেউ নয়। অথচ আমি এসেছি হাসপাতালে মালতীকে দেখতে। এসে যখন পড়েইছি ঢুকে পড়লাম বীরদর্পে নয়, হাসিমুখেও নয়, সহজভাবে। দেখলাম রমেশ আগের চেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে, মাথার চুল ছোট ক'রে ছাটা, আর গায়ে একটা হাফ সার্ট। আমাকে রমেশ বিশেষ অতিথির মত সাদরে আহ্বান করে নিজের হাতে একটা চেয়ার টেনে বসতে বল্লো। আমি সহজভাবে

বসলাম কিন্তু মনে মনে একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের সঙ্গে রমেশকে দেখছি। এই রমেশ আমারই সহপাঠি বয়সে আমার চেয়ে বছর দু'য়ের বড় কিন্তু এখন সে মেয়েচুরি কেসের আসামী। খবরের কাগজে নয় একেবারে চোখের সামনে উপস্থিত। ওর চোখ মুখের ভাবে আমি প্রায় সেই রমেশকেই দেখলাম যাকে কলেজে দেখছি প্রায় এক বছরকাল। মেয়ে চুরির আসামী বটে কিন্তু চেহারায় মুখের ভাবে এমন কোন বিশেষ নূতনত্ব খুঁজে পেলাম না। আমার চোখ পুলিশের চোখ নয় তাই হয়তো মুখের উপর গভীর কোন পাপের ছাপ চোখে পড়লো না। আঙ্গিকের বিশেষত্ব নেই কিন্তু ব্যবহারে নূতনত্ব ছিল। রমেশ একটু অস্থির প্রকৃতির হয়ে উঠেছে। কথাবার্তায় হাত নাড়ায় ওর চোখের দৃষ্টিতে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন। আমি আসতে বসলোনা বেশীক্ষণ। সাধারণ দু'চারটে কথা বললো আমাকে, জিজ্ঞেস করলো কলেজের কথা, মালতীকে চটপট ভাল হ'য়ে উঠবার তাগিদ দিলো, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কিছুটা নিন্দা ক'রে হাত-ঘড়িটা একফাঁকে দেখে নিয়ে বল্লো, এবার উঠি। আপনি বসুন! she is much better to-day

উঠে গেল রমেশ। আমি গভীরভাবে ভাবছি রমেশকে কি দেখলাম! আর মালতীও চুপ ক'রে আছে। যেন নিত্য যে তালে এখানে আসি বসি কথা কই সে তালটা রমেশ ভেঙে দিয়ে গেছে। মালতী পাশ ফিরে শুলো ধীরে ধীরে। আমি উঠে পড়ে সাহায্য করতে করতে মালতী বল্লো, পারবো। শুনলেন ত দাদা কি বল্লো?

আমি চেয়ারে বসতে বসতে বল্লাম, অনেকটা ভাল—কতটা ভাল তা কি ক'রে জানবো?

মালতী আমার কথার জবাব না দিয়ে তত্ত্বকথা পাড়লো, জানেন মানুষের অসুখ করলে বড় স্বার্থপর হয়? তখন নিজের কথা ছাড়া

কিছু যেন ভাবাই যায় না। আরও মজার তখন শুধু নিজের কথা শুনতে ইচ্ছে হয়। হয়না ?

বল্লাম, সেটা কি খুব অদ্ভুত ?

মালতী বল্লো, অদ্ভুত নয় ? আমার তো মনে হয় খুব বিচ্ছিরি। সবচেয়ে খারাপ লাগে অসুখ ক'রলো আর সবাই মিলে গোম্‌ড়া মুখ করে আহা উহু সুরু ক'রলো। তারপর এদিক থেকে একজন বলে এমনি থাকো ওটা খেওনা, ওদিক থেকে আর একজন বলবে ওষুধ খেয়েছে রাত্তিরে ঘুম হয়েছে ? জ্বালাতন আর কাকে বলে! আমার তো মনে হয় এই হাসপাতালে আসা ডাক্তার বৈদ্যি কাটাছেঁড়া ওষুধ পত্তর এ-সবের কোন দরকার ছিল না। বাড়ী যদি থাকতাম অম্‌নি অম্‌নি ভাল হয়ে যেতাম। বলুন দেখি একটু মার খেলে অমনি ডাক্তার ডাকতে হয় কি ?

বল্লাম, তা হয়তো হয়না। কিন্তু আপনি যে পড়ে গিয়েছিলেন চোট লেগেছিল····

মালতী আমার কথা কেড়ে নিয়ে বল্লো, পড়ে বুঝি কেউ যায়না! এই যে সকাল সন্ধ্যে, যাকগে সে কথা। সে আপনি বুঝবেন না।

একটু চুপ থেকে মালতী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লো, মধুপুরে গেলাম না আর তাতেই দাদা রেগে গেল। বাড়ীশুদ্ধ সবাই যাচ্ছে আমাকেও যেতে হবে! আমি বল্লাম, না, তা কেন ? আমি দুদিন ক'লকাতায় একা একা থাকবো হাত পা ছড়িয়ে একটু জিরিয়ে নেবো। বাস্ অম্‌নি দাদা গোঁ ধরলো-সেও যাবে না। যাবে না তো যেও না। আমি কিন্তু বুঝেছিলাম দাদা রেগে গিয়েছে।

মালতীর দিকে বেশ ক'রে তাকিয়ে দেখলাম ভাল সে হয়েছে কিন্তু মুখের পাণ্ডুর ভাবটা যায়নি। আমার একটু অস্বস্তি লাগছিল।

বল্লাম কাগজওয়ালার কথা। সে আসছে একটু পরেই। কি একটা কাজে গিয়েছে কাজটা সেরেই চলে আসবে।

মালতী মৃদু হেসে বল্লো, ভয়ানক কাজের লোক! আচ্ছা বলুনতো এতো ওর কি কাজ?

আমি আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্লাম, এই সব নানান্ রকম কাজ। এখানে ওখানে যেতে হয় লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে হয়। এই আর কি!

বলতে বলতে কাগজওয়ালা এসে পড়তে বল্লাম, এইতো এসে গিয়েছে। ওকেই জিজ্ঞেস করুন?

মালতী বল্লো, কাজে নাকি গিয়েছিলেন? কি কাজ?

কাগজওয়ালা চেয়ারে বসতে বসতে বল্লো, কাজ না বলে অকাজও বলতে পারো। একটা মিটিং ছিল। তুমি কেমন আছ?

মালতী বল্লো, দাদা এসেছিলো। দাদা ত বলে গেল, much better, তোমার কেমন মনে হয়?

কাগজওয়ালা বল্লো, মনে অনেক কিছু হয়। তোমার কেমন লাগছে?

মালতী ডান হাতটা কপালে দিয়ে চুল সরিয়ে বল্লো, লাগছে ভালই তবে কেমন যেন দুর্বল। আচ্ছা বলতে পারো দাদার কি হয়েছে?

কাগজওয়ালা হাসি মুখে বল্লো, একথার উত্তর আমি কি করে দি? তোমার দাদার কি হয়েছে সেটা তোমার দাদা নিশ্চয়ই জানে। আমার ত জানার কথা নয়।

মালতী চোখ তুলে কাগজওয়ালাকে দেখলো যেন বিশেষভাবে। আমি বল্লাম, রমেশবাবু ত এসেছিলেন, জিজ্ঞেস করলেই পারতেন?

মালতী বল্লো চোখ নামিয়ে, জিজ্ঞেস করেছিলাম, দাদা হেসে ফেল্লো। বল্লো, হবেটা কি। আমাকে মেরেছিলো তাই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। আসতে ইচ্ছে করেনি।

কাগজওয়ালা বল্লো, তা এমন কিছু অসম্ভব কথা নয়। তোমার ভাবনাটা কি নিয়ে?

মালতী বল্লো, আমার ভাবনাটা যে কি নিয়ে বলতে পারিনা। সকালে মা এসেছিল। দাদার কথায় মা কেঁদে ফেল্লো। দুপুরে কাকা এলো তাকে দাদার কথা জিজ্ঞেস করতে দেখলাম এড়িয়ে গেলো। তাছাড়া দাদাও যেন কেমন হয়ে গিয়েছে! কাগজওয়ালার দিকে তাকিয়ে বল্লো, সত্যি আমার যেন কিরকম লাগছে!

কাগজওয়ালা চুপ করে রইলো। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখলাম একটা থার্মোমিটার নিয়ে একজন নার্স ঢুকছে। থার্মোমিটার'টা মুখে দিয়ে চুপ করে নার্স দাঁড়িয়ে রইলো। কাগজওয়ালা নার্সের সঙ্গে মালতীর স্বাস্থ্য নিয়ে দু'একটা কথা বল্লো তারপর নার্স থার্মোমিটার তুলে নিয়ে টেম্পারেচার নোট করে চলে গেল।

মালতী চুপ করে শুয়ে আছে। আমি ভাবছি আজকের সঙ্গে অন্য দিনের তফাৎটা কোথায়। কাগজওয়ালা মালতীর দিকে একটু এগিয়ে বসে বল্লো, একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির ভাল হয়ে ওঠো! এখনও পরীক্ষা দেবার সময় আছে।

মালতী জিজ্ঞেস করলো, আমি তো পরীক্ষা দেবো, কিন্তু তুমি? তোমার মিটিংয়ের কি শেষ নেই?

কাগজওয়ালা বল্লো ওদিকের জানালা দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে, শেষ থাকবেনা কেন, শেষ কিসের নেই?

তারপর মাথা ঘুরিয়ে মালতীর দিকে তাকিয়ে বল্লো, এই যে এত বড় একটা ঘটনা, দুর্ঘটনা বল্লেই ভাল হয়, এই যে তুমি মধুপুর গেলেনা থেকে শুরু করে যা সব ঘটলো এরও তো শেষ আছে। তবে হ্যা যখন যেটা ঘটে তখন সেটার যেন শেষ থাকেনা।

মধুপুরে যাইনি বলে তুমিও রাগ করে আছ? প্রশ্ন করে মালতী।

কাগজওয়ালা মাথা নেড়ে বল্লো, রাগ করিনি। কিন্তু গেলেনা কেন সেটা বুঝতে পারি না।

একটু অভিমান নিয়ে বল্লো মালতী, তোমাকে বুঝতে বলেছে কে? আমি যাইনি আমার ভাল লাগে ক'লকাতায় থাকতে। এটাতো বোঝ?

কাগজওয়ালা অতি অনায়াসে বল্লো, কেন আমি কি পালিয়ে যাচ্ছিলাম?

পালিয়ে যাবে! মালতী অবাক হয়ে বল্লো, পালিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে! ইস্, এতোই সাহস!

আমি দরজা দিয়ে ওধারের বারান্দার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এদের নীরব দৃষ্টি বিনিময়ের প্রতি আমার যত কৌতূহলই থাক আমি বাঁধা হয়ে উঠতে চাইনা। খানিকক্ষণ চুপচাপ গেল। কাগজওয়ালা বল্লো নিচু গলায়, এদিকে মার খেয়ে খেয়ে হাড় যে শক্ত হয়ে গেল।

উত্তরে কি যেন বল্লো মালতী আমি ঠিক শুনতে পেলাম না।

খানিকক্ষণ পরে মালতী আমাকে ডেকে বল্লো, কি হল আপনার, একেবারে চুপ হয়ে আছেন?

বল্লাম, হয়নি কিছুই। কিন্তু এবার উঠতে হয়।

মালতী হেসে বল্লো, আপনাকেও কাজে পেয়েছে? খুব বুঝি তাড়া?

কাগজওয়ালা বল্লো, উনি যাবেন ছাত্র পড়াতে, সেখানে পেটের তাড়া। চলুন ওঠা যাক্।

বলে কাগজওয়ালা উঠে পড়লো। আমি বল্লাম, আপনি উঠেছেন কেন, বসুন, বসুন! আমার সত্যি একটু কাজ আছে। ট্যুইশনে পরে যাবো।

কাগজওয়ালা ইতস্তত করে বসে পড়লো, আচ্ছা যান। আমার আরও কিছুটা সময় আছে।

চলে এলাম ওদের রেখে। কাজ কিছু ছিলনা। এই চলে আসাটাই একটা কাজ হয়ে উঠেছিল।

সেদিন খোলাখুলি ভাবলাম কথাটা। এতদিন ভাবতে গিয়েও যেন ভাবতে পারিনি। আড়াল থেকে আলগোছে দেখেছি। কথাটা মনে এলেও ঠাঁই দেইনি। সেদিন একটা চায়ের দোকানে নিরিবিলি এক পেয়ালা চা নিয়ে বসে ভেবে দেখলাম কাগজওয়ালা আর মালতীর শেষ পর্য্যন্ত যাত্রাটা কোনদিকে। এতদিন পর্য্যন্ত এই যে দুজন পাশাপাশি চলেছে এটাই যেন আমার কাছে একটা মস্ত বিষয় হয়েছিল। জানতাম এ পাশাপাশি চলাটা চিরস্থায়ী করাটা বড় সহজ নয়। কিন্তু চিরস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ীত্বের দৃষ্টি থেকে দেখার মত মন ছিলনা। কোনমতে চারদিকের ঘন বুনট জনতার মধ্যে দুটি জন যে নিজেদের বাছাই পথে চলতে চায় এটাই ছিল আমার কাছে পরম বিস্ময়ের। বয়সটা কাঁচা তাই পাকাপাকি ব্যবস্থার পাশ দিয়ে ভেবে দেখিনা। অভিজ্ঞতার অভাব বল্লে কিছুই বলা হয়না, কারণ কলেজ জীবনে দায়িত্ব বলতে পরীক্ষার দায়িত্ব আর ভাগ্যদোষে পরীক্ষার দায়িত্ব ছাড়া আরও কিছুটা দায়িত্ব আমাকে বইতে হতো বটে কিন্তু পরিবর্তনের দিকে মনের যে চাহিদা ছিল নিত্য নূতনের প্রতি যে টান অনুভব করতাম তারই ফলে কোন কিছুই বেশ পাকাপাকিভাবে বনিয়াদ গেড়ে বসছে বা বসবে বা বসতে পারে সে সম্বন্ধে শুধু নিরুৎসাহ নয় দৃষ্টি ছিলনা।

কিন্তু একটা পূজোর ছুটিতে কাগজওয়ালার ভাষায় যে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিলো, অন্ততঃ আপাত দৃষ্টিতে শুধু সেই দুর্ঘটনা যেন একেবারে চমকে দিয়ে নূতন করে ভাবতে শেখালে। পাকাপাকি বন্দোবস্তের টানে নয় এই যে একটা অচল অবস্থার চড়ায় এসে ঠেকে গিয়েছে এর থেকে সরে নেমে আসতে গেলেই ঐ একটি পথ। বুঝলাম কাগজওয়ালার সমস্যা অনেক। তার উপর সে আবার রাজনীতি করে। আর এও

বুঝলাম ও মেয়ের সাহস আছে আর আছে ঠিক বুদ্ধি নয় কি রকম একটা অন্তর্জ্ঞান। সমস্যা যা-ই থাক, আর বাধা বিপত্তি যতই থাকুক এদের দুজনের যেমন সহজ সরল অনায়াস গতি তাতে এদের যাত্রাপথ থেকে হটিয়ে দিতে পারবে বলেও মনে হয়না।

বাধা অবিশ্যি কোন্ দিক থেকে কিভাবে আসবে আমি সবটা বুঝে পেলাম না। মালতীর পরিবারে তার কাকাই প্রধান কর্তা আর হোল মালতীর ভাই রমেশ। এ ছাড়াও আছে মালতীর মা।

কিন্তু না বাধা বিপত্তির কথা যাক্। বাধা আর বিপত্তি কত দিক থেকেই আসতে পারে তার হিসেব করা যায়না। যেটা হিসেব করা যায় বুঝে দেখা চলে সেটা হচ্ছে মালতী আর কাগজওয়ালার ঘনিষ্ঠতা। কথাটা আশ্চর্য তবুও সত্যি সেদিন সেই চায়ের দোকানে প্রথম আমি ওদের বিয়ের কথাটা তলিয়ে দেখলাম।

আমার কাছে ওটা একেবারে নূতন। একদিকে হাসপাতালের কেবিন আর রমেশের কেস্ অপর দিকে এই একটা নূতন পথের দিকে আমার মন খুলে যেতে এ যেন এক নূতন অবস্থায় নিজেকে খুঁজে পেলাম। সেদিন ছাত্র পড়াতে পড়াতে এই নূতন পাওয়াকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। দুএকবার হাসিও পেল। এতো এমন কিছু নূতন নয়, তবুও আমি যেন সেদিনই প্রথম দেখে ভারি অবাক হয়ে গিয়েছি!

পরদিন কলেজে রমেশ এলো। ক্লাশে কে তার ব্যাপার জানতো কে জানতোনা আমি জানিনা। কিন্তু ও নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেউ করলোনা। তাছাড়া আমার বোধহয় সেদিকে দৃষ্টিও ছিল না। আমি দেখছিলাম কাগজওয়ালাকে। এই ছেলে আজ হোক কাল হোক বিয়ের জন্য উদ্যোগী হবে এটাই হোল আমার পক্ষে পরম বিস্ময়ের। ওকে দেখে এমন তো কিছু পেলাম না। আর পাঁচটা ছেলের মত নয়। সেতো আজকেও নয় কালকেও নয়। কথাবার্তায় চালচলন ব্যবহারে কাগজ-

ওয়ালা আর পাঁচটা ছেলের চেয়ে আলাদা এতো মেনেই নিয়েছিলাম, কিন্তু গতানুগতিক পথে পা দিয়ে সেও যে চলবে এইটে যেন মেনে নিতে পারছিলাম না। সত্যি বলতে কি নিজের ধ্যান ধারণায় কিংবা বইপত্র খুঁজে পেতে দেখেছি যুবক যুবতীর প্রেমকাহিনী যে ধারা অবলম্বন করেই চলুক, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। বিবাহ-পূর্ব জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতেই প্রধানত এ সব কাহিনীর জন্ম আর বিবাহতেই তার সমাপ্তি। তার পরের কথায় আমাদের যেন আগ্রহের অভাব আছে। এর পর যা ঘটে তাতে যেন নূতন কিছু থাকতে পারেনা। গতানুগতিক কিংবা তারই কিছু হের ফের। কাগজওয়ালা আর মালতীকে নিয়ে যে আধা কল্পনা আধা বাস্তব স্বপ্ন রচনায় মগ্ন ছিলাম ওদের যাত্রাশেষের ইঙ্গিত পেতে আমার যেন আর কিছু কৌতূহল থাকছেনা! আমি কাগজওয়ালাকে দেখে দেখে এই বুঝতে চাইলাম এর যে ভিন্ন চেহারা সেটা সে লুকিয়ে রাখবে কোথায়, নাকি এমনি হয়?

সেদিন কলেজ শেষে কাগজওয়ালার সঙ্গে এক সঙ্গেই মালতীকে দেখতে এসেছিলাম। যথারীতি পার্কে গিয়েও বসলাম। তারপর যে যার কাজে চলে গেলাম। কথাবার্তা বিশেষ কিছু হলোনা। যাওবা হোল তা ঐ রমেশকে নিয়ে।

রমেশ একটা 'কিছু হয়নি ভাব' নিয়ে কলেজে আসছে। শুধু আসছে না, কলেজে যে নাটকের ব্যবস্থাটা হচ্ছিল সেটাতেও সে বেশ লেগে গিয়েছে। পূজোর ছুটিতে নাটকের রিহার্সেল কিছুটা হ'য়েছিল তারপর ক্রমে ক্রমে থেমে গিয়েছিল। রমেশ আবার উঠে পড়ে লেগেছে রিহার্সেল নিয়ে। রিহার্সেলের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদাও উঠছে অল্প স্বল্প। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল আজ হোক কাল হোক রমেশের ব্যাপারটা চাপা থাকবে না এবং তখন এ নিয়ে যে আন্দোলন ফেটে পড়বে তার ঠেলায়

রমেশ যে কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক কি! আর সেই সঙ্গে এই নাটকের ব্যবস্থাদিও হয়তো বানচাল হয়ে যাবে।

এই অদ্ভূত একটা আশঙ্কা নিয়ে কলেজে যাই আসি। মাঝে সাঝে ইন্দুর সতর্ক-বাণী মন দিয়ে শুনে বাড়ী ফিরে বই নিয়ে বসি। ওদিকে মালতী ক্রমে সেরে উঠছে। বোধহয় অক্টোবর মাসের শেষা-শেষি তখন। বঙ্কুর একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা একেবারে নূতন ধরণের। ছোট চিঠি। সে লিখেছে: এবার মনে হয় আমি সত্যি অসুস্থ। গায়ে জ্বর সব সময় আছে। কাসিও সারিতেছে না। আমার যেন কিছুই আর ভাল লাগে না। সে কথা লিখিয়া তোমার মন খারাপ করিতে চাই না। তোমার টেস্ট পরীক্ষা আসিয়া গেল। ভাল করিয়া পড়িও। তোমার চিঠি পাইলে ভাল লাগে। মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্র দিও। ইতি

এ চিঠির কথা আমি কাউকে বলতে পারলাম না। অবিশ্যি বঙ্কু বিহারীর চিঠিপত্র নিয়ে আমাকে কলেজের ছেলেরাও বড় একটা জিজ্ঞেস করতো না। মালতী বরং কচিদ্ কদাচিৎ জানতে চাইতো। এ চিঠিটা পাওয়ার পর মালতী যেদিন হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ী যাবে তার আগের দিন সে কথায় কথায় বঙ্কুর কথা জিজ্ঞেস করে বসলো। আমি বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম।

চিঠিটা আমার মনে একটা বোঝা হয়ে রইলো। কাউকে বলতে পারলে বোঝাটা কমতো কিন্তু কোন দিক দিয়ে কি কথায় আমি কথাটা বলবো বুঝে পেলাম না। একটা উত্তর অবিশ্যি লিখে দিলাম। সেটা বঙ্কুর চিঠির উত্তর মোটেই নয়। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ভাল ভাল কথার ডালি সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

সবেমাত্র ভোরের দিকে শীত পড়তে শুরু করেছে। শেষ রাত্তিরে

গায়ে একটা চাদর টেনে আরাম করে ঘুমুচ্ছি। কাগজওয়ালার ঠেলা খেয়ে ঘুম ভেঙে জেগে বসলাম।

কি খবর ?

কাগজওয়ালা বল্লো, কথা আছে। চলুন।

মুখটা ধুয়ে নিয়ে কাগজওয়ালার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন খবরটা কি ? এত সকালে কি মনে করে ?

কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে কাগজওয়ালা বল্লো, আপনার কাছে একটা প্রার্থনা আছে। আপনার রুমটা এক দুপুরের জন্য দিতে হবে। আমাদের একটা ঘরোয়া মিটিং আছে। জরুরী মিটিং।

দুপুরবেলায় মিটিং। ঘরতো দুপুরে খালি পড়েই থাকে। ঘর দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছে হোল। বল্লাম, ঘর আপনি পাবেন। মিটিংটা কি নিয়ে জানতে পারি কি ?

পেয়ালায় চুমুক দিযে কাগজওয়ালা বল্লো, ঐযে বল্লাম জরুরী মিটিং দুপুর বারোটা থেকে তিনটে অবধি।

হেসে বল্লাম, এত ঘর থাকতে আমার এই ঘরেই কেন মিটিং ডাকছেন অন্ততঃ সেটাতো জানতে পারি ?

কাগজওয়ালা আমার দিকে তাকিযে বল্লো, নাইবা জানলেন। তার চেয়ে বরং খবর শুনুন। রমেশ বাবু মুক্তি পেয়েছে।

বল্লাম, খবর বটে তবে ভাল কি মন্দ বলা শক্ত।

উত্তরে কাগজওয়ালা হেসে চুপ ক'রে রইলো। আমি মালতীর কথা জিজ্ঞেস করলাম। কাগজওয়ালা বল্লো সম্ভব সে ভালই আছে। তার বেশী কিছু সে জানে না।

কলেজে যাচ্ছে না ? প্রশ্ন করলাম।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে কাগজওয়ালা বল্লো, বোধ হয় যাচ্ছে। আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম দেখা ক'রতে পারিনি। তাছাড়া বুঝতেই পারেন দেখা ক'রতে গেলেই আবার কি হ'তে কি হয় তার ঠিক কি!

কথাটা বেসুরো ঠেক্‌লো। তবু ওনিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে হ'ল না। আমার ঘরে মিটিং করার ব্যাপারটা কাগজওয়ালা এড়িয়ে গেল। মিটিংয়ের কথা ব'লে নয় কাগজওয়ালার কথা ব'লেই জানতে ইচ্ছে হ'য়েছিল। আমি ওর দিল্লী কনভেনশেনের কথাটা পাড়লাম।

বল্লাম, দিল্লী যে গিয়েছিলেন কি দেখে এলেন?

কাগজওয়ালা জবাব দিল, দেখতে যাইনি। প্রায় কিছুই দেখিওনি। বলতে পারেন শুনতে গিয়েছিলাম। কিছুটা বলতে গিয়েছিলাম।

একটু চুপ থেকে খালি পেয়ালাটা সরিয়ে রেখে বল্লো, আজকে উঠি। আমাকে অনেক যায়গায় যেতে হবে। তাহলে ঐ কথা রইলো বারটা থেকে তিনটে।

বলতে বলতে উঠে পড়লো কাগজওয়ালা। বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম, কলেজে যাচ্ছেন?

মাথা নেড়ে কাগজওয়ালা সাইকেলে উঠতে উঠতে বলে গেলো, আজ বোধ হয় আর যাওয়া হবে না।

সেদিন কলেজে গোটা দুই ক্লাশের পর ছুটি হ'য়ে গেল। কে একজন মহাজন ব্যক্তি দেহত্যাগ করেছেন তাই বেলা একটা নাগাদ কলেজের হাফ্ হলিডে হয়ে গেল। আচমকা ছুটির জন্যে নয় তখনই কোথাও যাওয়ার যায়গা নেই বলে দু'একজন সঙ্গী সাথী জুটিয়ে গলির মোড়ে রেস্তোরাঁয় এসে আড্ডা জমালাম, তিনটে পর্যন্ত বাড়ীমুখো হ'তে পারবোনা। অন্ততঃ ঘণ্টা দুই আমাকে বাইরে থাকতেই হবে। রুমমেট্‌কেও বলে দিয়েছিলাম। তার ছুটি হবে কিনা জানি না। ছুটি হ'য়ে থাকলেও তার যাওয়ার যায়গা আছে।

চায়ের দোকানে কথা উঠলো আগামী নাটক নিয়ে। নাটকের রিহার্সেল প্রায় সম্পূর্ণ। আর দিন সাতেকের মধ্যেই না কি স্টেজ বেঁধে নাটক দেখানো হবে। কিন্তু উপস্থিত সঙ্গীরা বিশেষ ক'রে রমেন নাটকের বিষয় বস্তুর মোটেই প্রশংসা ক'রতে পারলো না। রমেন সবিস্তারে বল্লো, এ যুগে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র সব ব্যাপারে সচল। বিয়ের বাসরে কিংবা মৃত্যুপথযাত্রীর পরলোক যাত্রায়, রবীন্দ্রনাথ সব নিয়ে লিখেছেন।

আর একটি ছেলে তার নাম মনে নেই। ধরে নিলাম তার নাম শ্যামল। সে ছেলেটি কথাবার্তা কম বলতো। রমেনের কথায় সে বল্লো, কিন্তু বঙ্কবিহারী কুণ্ডর জন্যে রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখে যান নি।

সর্বেশ্বর নামে একটি ছেলে টেবিলের উপর ঝুকে পড়ে বল্লো, তোমার কথার জবাব দিতে আমার সমস্ত ভাষা মূক হ'য়ে গেছে। যা বলবে তার একটা মানে থাকা চাই তো?

সুকোমল নামে লাল সাট পরা একটি ছেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্লো, তোমরা কেউ শুনেছ কিনা জানি না। রমেশকে নিয়ে আমি এমন একটা কথা শুনেছি তা সত্যি যদি হয়, তাহলে চুলোয় যাক নাটক, ওটাকে মেরে তাড়াতে হয়।

কি ছিল সুকোমলের কথায় সবাই কাছাকাছি ঝুকে পড়ে চাপা প্রশ্ন করলো, কি করেছে রমেশ? একজন বল্লো, টাকা মেরেছে বুঝি?

রমেন বল্লো, তা যা-ই করে থাক তাতে নাটকের অপরাধ কি?

সর্বেশ্বর জবাব দিলে, নাটকের অপরাধ নাটক করার নামে ও টাকা মেরেছে।

সুকোমল কি যেন বলতে বলতে চায়ের দোকানে ঢুকলো রমেশ নিজেই। আপাততঃ আলোচনাটা থেমে রইল। রমেশ একটা চেয়ার টেনে আমাদের সঙ্গে বসলো। তারপর একটা চাপা শ্বাস ছেড়ে বল্লো,

এমন জানলে ও সব ঝামেলায় যেতাম না।

সবাইর মুখের দিকে একে একে তাকিয়ে রমেশ আবার বল্লো, তোমাদের কি, তোমরা তো চাঁদা দিয়ে খালাস! এদিকে আমাকে যে কত দিকে ছুটতে হচ্ছে! ওরে বাপস্!

রমেশ একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বল্লো, তা ঝুঁকি নিয়েছেন বইতেই হবে। কিন্তু আপনার রবীন্দ্রনাথের নাটক Select করা উচিত ছিল।

রমেশ মানবে না রমেনের কথা। সে কি যেন সব বল্লো তাতে যুক্তি থাক আর না থাক গলার জোর ছিল। ক্রমে এক কথায় দু কথায় তর্কটা বেশ জোর হ'য়ে উঠলো। আমিও বোধ হয় দু' চার কথা বলেছিলাম। অবিশ্যি বলা বাহুল্য এ ধরণের তর্কযুদ্ধে যা হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম কিছু হ'ল না। কিছু কম বল্লাম আমি আর প্রায় কিছুই বল্লেনা শ্যামল। আর বাকি সবাই অনেক কিছু বল্লো। অনেক চা আর সিগ্রেট উড়লো। দু একবার ঝগড়া হতে হতে থেমে গেলো। শেষটায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে এলো বাক্‌বিতণ্ডা। কে কত পড়েছে, নাটকের নাটকত্ব নিয়ে কার কতটা জ্ঞান, সুরুচি কাকে বলে, সর্বশেষে উঠলো কালচারের কথা।

তখন তিনটে প্রায় বাজে। আমি উঠে পড়লাম। উঠতে উঠতেই শুনলাম সুকোমল বলছে রমেশকে, তুমি ভাই আর যাই বলো কালচারের কথাটা বলোনা! ওটা তোমার শোভা পায় না।

রমেশ বল্লো, কেন কালচার কি তোমার একার না কি? এরপর আর শুনতে পেলাম না। রাস্তায় বেরিয়ে একটা শঙ্কা নিয়ে মেসের দিকে চল্লাম। সুকোমল যা হোক কিছু শুনেছে। এতদিন যে কেউ শোনে নি বা শুনলেও বলে নি এটাই আশ্চর্য। সুকোমল শুনেছে এবং কারণ যা-ই থাক সে একেবারে খোলাখুলি বলছে না। কিন্তু বলতে যখন শুরু করেছে তখন একথা খুব বেশী দিন চাপা থাকবে না।

নিজের মনেই একটা প্রশ্ন উঠলো চাপা যদি নাও থাকে তাতে আমার কি ? রমেশের কথা যদি সবাই জেনে যায় আর তাই নিয়ে যদি সবাই বলাবলি করে কিংবা রমেশকে গাল পাড়ে নিন্দা করে আমার তাতে কি এসে যায় ? কি এসে যায় বুঝে পেলাম না কিন্তু একটা অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা মনে আমার থেকেই গেল।

প্রায় মেস বাড়ীর দরজা পর্যন্ত ঐ কথাটা নিয়েই ভাবতে ভাবতে এসে গেলাম। দরজায় এসে গিয়ে দ্বিধায় পড়লাম। তিনটে বেজে গিয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু যারা মিটিং করছে তারা ভারতীয় একেবারে তিনটি বাজতে বাজতেই বেরিয়ে গেছে কি ? ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতেই গলার আওয়াজে বুঝলাম ওদের এখনো তিনটে বাজে নি। বলছিল একজন কিন্তু বলার ধরণে মনে হোল শ্রোতারা সব কান পেতে আছে। অপেক্ষা করছি। ভাবছি এখন কি করি ? কোথায় গিযে সময়টা পার করি ? ভেতরে মিটিংযে হঠাৎ অনেক গলার তোলপাড় শুরু হযে গেল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। বেশ একটু শাঁসালো গলায় কে যেন বল্লে, আস্তে আস্তে। কমরেড, আমাদের যার যা বলবার আছে একে একে বল্লে সবাই শুনতে পাব। আজকের দিনে………।

ধীরে ধীরে নেমে এলাম। বেরিয়ে এলাম বাইরে। নিজের উপর রাগ হোল কাগজওয়ালার উপরেও। বাইরে এসে মেসের দরজায় চায়ের দোকানে এসে সেদিনের কাগজটা নিয়ে বসলাম। সে এক পরম অভিজ্ঞতা। পুরোপুরি কাগজ বোধ হয় কেউ কোনদিন পড়ে না। কিন্তু সেদিন ঐ রকম একটা সঙ্কল্প নিয়ে খবরের কাগজটা খুলে বসলাম। জোর করেই পড়েও ফেল্লাম প্রায় পৃষ্ঠা তিনেক। প্রায় এক চোখে পড়া। এক চোখ রয়েছে রাস্তার দিকে কখন ওরা মেস থেকে বেরিয়ে যায় সেদিকে। ভাল খবর মন্দ খবর দেশী খবর বিদেশী

খবর পড়তে পড়তে এক কোণে দেখি রমেশের খবরও ছাপা রয়েছে। সেটা রমেশের বে-কসুর খালাস প্রাপ্তির খবর। তাতে ভারতীয় দণ্ড বিধির ধারার উল্লেখ রয়েছে কিন্তু ঠিক কি অপরাধে রমেশ ধরা পড়েছিল তা নেই। রমেশের নাম রয়েছে কিন্তু ঠিকানা নেই। খবরের হেড্‌লাইনটাও কোন সন্দেহের উদ্রেক করে না। গোটা চার পাঁচ লাইনে সমস্ত খবরের সমাপ্তি। তার সঙ্গেই রমেশের সঙ্গীটির নাম রয়েছে মৃন্ময় চৌধুরি। সেও মুক্তি পেয়েছে। কাগজটা সামনে ঠেলে রেখে একটু ভাবতে বসলাম। মৃন্ময় চৌধুরিও আমাদের সঙ্গেই পড়ে। কিন্তু সে যে রমেশের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ তা জানতাম না। এতদিন তার নামও এ ব্যাপারে শুনি নি। সুকোমল আজকে রমেশের কথাই বল্লো মৃন্ময়ের নামও করলো না। হঠাৎ এক ঝটকায় ভাবনাটা সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ছি দেখলাম মেস গেট দিয়ে কথা বলতে বলতে জন আট দশ বেশী এবং কম বয়সের যুবক বেরিয়ে গেল।

একটু অপেক্ষা করে আমি মেসে এসে ঢুকলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে কাগজওয়ালার গলা শুনতে পেলাম। দরজাটা ভেজান। দরজার কড়াটা নেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, আসতে পারি ?

ভেতরের কথা থেমে গেল। আবার প্রায় তখনই কাগজওয়ালা ডাকলো, আসুন আসুন !

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বল্লো, অত্যন্ত দুঃখীত। প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি হয়ে গেল।

আমি দেখলাম ঘরের ভেতরটা আর চেনা যায় না। বিছানা বালিশ চাদর সব যেন তোলপাড় হয়ে গেছে। তারই একপাশে দেয়াল ঘেঁষে কাগজওয়ালা বসে আছে। আর একদিকে টেবিলে কনুই রেখে বসে আছেন একজন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের পরনে পাঞ্জাবি পায়জামা, চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা, মুখটা লম্বাটে রোগামত, আর

এক মাথা অবিন্যস্ত চুল। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করে দিল কাগজওয়ালা। ভদ্রলোকের নাম অমিয় চৌধুরি।

হাতজোর করে কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে অমিয় বাবু বলে উঠলেন, আপনার কথা শুনলাম। সময়ে অসময়ে আপনি আমাদের অনেক সহায়তা করেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য নিয়েও আপনার সমর্থন রয়েছে। তা আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেই পারেন। অবিশ্যি যোগ আপনি দিয়েছেন। একেবারে পুরোপুরি যোগ দিলেই ত সুন্দর হয়।

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। সাম্‌লে নিয়ে বল্লাম, রাজনীতি বলুন রাষ্ট্রনীতিই বলুন আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

অমিয়বাবু একটু উঠে বসে বল্লেন, বুঝতেই হবে এমনতো কথা নেই। যতটা বুঝেছেন তাতেই হবে। ক্রমে বুঝবেন। কাজের ভেতর দিয়ে বুঝবেন।

কাগজওয়ালা বলে উঠলো, এইখানেই আমার আপত্তি। আমি ওর কথায় কিছু বলছিনা। কিন্তু এই যে দলে টেনে আনবার পদ্ধতি আপনাদের, এই যে দল ভারি করবার পথ আপনারা নিয়েছেন এটা কোনমতেই ভাল হতে পারে না। শুধু এ ব্যাপারেই নয়, সভ্য সংখ্যা বাড়ানো থেকে যে কোন ছোট বড় আন্দোলনেও আমি দেখেছি আমাদের অনেকেই সময়োপযোগী উত্তেজক যাহোক কিছু বলে আন্দোলনকে কি বলে গিয়ে সার্থক করে তুলবার চেষ্টা,—এটা কি —এটাতো একটা হুজুগে মাতানো ছাড়া আর কিছু নব। এ কি একটা প্যানেশিয়া পাওয়া গেছে, যে চেঁচিয়ে চীৎকার করে পাড়ার লোক জড়ো করে যেমন করেই হোক এ দাওয়াই প্রচার করতেই হবে। লোকে বুঝুক আর না বুঝুক, মানুক না মানুক, ঢাক ঢোল পিটিয়ে গলার জোর সম্বল করে বাহাদুরকা খেল্ দেখাবার ব্যাপার এতো নয়!

অমিয়বাবু নিঃসন্দেহে অত্যন্ত চমকে গেলেন। তিনি চোখ বড়

বড় করে বল্লেন, এই যদি আপনার মনের কথা, আমাদের সম্বন্ধে আপনি এরকম অসম্ভব ভুল ধারণা পোষণ করেন, তাহলে আপনি পার্টিতে আছেন কি করে ?

কাগজওয়ালা বল্লো, এই করে যতদিন পারি থাক:বো। যদি নিজের কথা খোলাখুলি বলতে না পারি, যদি নিজের অভিজ্ঞতা জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধিকে বিদায় দিয়ে পার্টি নামক এক আধিভৌতিক phanpasyকে সর্বব্যাপারে নতশিরে মেনে নিতে হয়, থাকবো না। সে পার্টিতে থাকবার অন্ততঃ আমার কোন প্রয়োজন দেখি না।

কি যেন একটা উত্তর দিয়েছিলেন অমিয়বাবু। তার প্রত্যুত্তর দিলে কাগজওয়ালা। সত্যি সত্যি একটা বাক্য বিনিময়ের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। সে সব কথা আজ আমার সব মনে নেই। দুজনের মূল বক্তব্যটা শুধু মনে আছে। কাগজওয়ালার বক্তব্য বোধ হয় এই ছিল যে ব্যক্তি-মতকে স্থান দিতে হবে। ব্যক্তির সত্ত্বাকে মানতে হবে। গৌরিয় মঠ কিংবা ঐ ধরণের ধর্মপ্রতিষ্ঠানে যেমন সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণের ব্যবস্থা থাকে এ পার্টিতে যদি তাই ঘটে তাহলে সে তাতে নেই। অমিয়বাবু বল্লেন যে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জনের কথা ওঠেনা। ব্যক্তিকে স্থান দিতেও কোন বাধা নেই কিন্তু এক ব্যক্তির চেয়ে অনেক ব্যক্তির মিলিত মন অনেক বেশী মূল্যবান। অনেক ব্যক্তি মিলেই পার্টি। অতএব পার্টির কথাও যে কোন ব্যক্তির কথার চেয়ে অনেক বেশী গ্রাহ্য।

দুজনের কথা আর শেষ হয় না। এদিকে বাইরে আলো মিলিয়ে আসছে। আমি বসে বসে ভাবছি এ সময়ে আমার রুমমেট এসে পড়লে খুব ভাল হয়। এদের কথা থামে। শেষ পর্যন্ত রুমমেট অবিশ্যি এলোনা, তবে অমিয়বাবু সেদিনের মত কথা মুলতবী রেখে উঠে পড়লেন।

কাগজওয়ালা উঠবার নামও করলে না। অমিয়বাবু চলে যেতে আমাকে বল্লো, এককাপ চা খাওয়াতে পারেন?

বল্লাম, চলুন নিচে চায়ের দোকানে। সেখানে বসে খেতে আপত্তি আছে?

কাগজওয়ালা উঠতে উঠতে বল্লো, আপত্তি কিছুতেই নেই এক গোয়ার্তুমি ছাড়া।

বুঝলাম কাগজওয়ালার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারটা নূতন। সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে রুমমেটের সঙ্গে দেখা। তাকে একটু নিচু গলায় বল্লাম, ঘরটা গুছিয়ে রেখো। আমি বেরুচ্ছি।

নিচে নেমে চায়ের দোকানে এসে বসলাম। কাগজওয়ালাকে দু'একবার দেখে নিয়ে বল্লাম, আপনি কিন্তু খাম্‌কা তর্ক করলেন। অমিয়বাবু এমন কিছু খারাপ অনুরোধ করেন নি। দলের লোক বাড়াতে সবাই চায়।

কাগজওয়ালা পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে বল্লো, সেটা আমার প্রতিবাদের বিষয় নয়। আমার প্রতিবাদ বা মনে করুন বক্তব্যটা আপনাকে বুঝিয়ে বলাও শক্ত হবে। আপনার বুদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করছিনা। কিন্তু দেখুন কোন দিনই কোন কাজের চেহারা অপর কাউকেই বুঝিয়ে বলা যায় না। ভাষার জোরে হৃদয়ের ভাব-ব্যাখ্যাও যেমন সম্পূর্ণ সম্ভব হয়না অনেকখানি আড়ালে থেকে যায় বাস্তব কাজের ব্যাপারেও তাই। এই যে আমি কাগজ বেচি, কিংবা কাগজের agency নিয়ে কাগজ চালাই, এতো সামান্য সাধারণ কাজ কিন্তু এরও প্রতিটি খুঁটিনাটি কি বুঝিয়ে বলা যায়? ধরুন না কেন সওদাগরী অফিসের নিম্নতম কেরাণী সাধারণ কাজ করে, কিন্তু কি যে তার কাজ সেটা হাতে নাতে না করলে শুধু মুখে বলে কি সেটা বোঝান যায়? যদিবা মুখে কেউ বলে যারা শুনলো তারাই কি বুঝতে পারে? মোটা-

মুটি বলা চলে এই রকমের কাজ। মোটামুটি আন্দাজ করা চলে এই হয়ত হবে। তার বেশী কখনও কি সম্ভব? বলুন, সম্ভব?

কাগজওয়ালার কথাটা যেন বুঝতে পারলাম, বল্লাম, তা হয়তো হবে কিন্তু ঐ রকম আন্দাজ দিয়েই ত পৃথিবী চলছে।

মাথা নেড়ে বল্লো কাগজওয়ালা, পৃথিবীটা শুধু এই দিয়ে কি ঐ দিয়ে চলছে না। চলছে সব কিছু দিয়ে। কিছু আন্দাজ কিছু বাস্তব শিক্ষা অভিজ্ঞতা কিছু বুদ্ধি কিছুবা নির্বুদ্ধি সব দিয়েই চলছে। কিন্তু এখানে আমি যে কাজের কথা বলছি সেটা মানুষ নিয়ে। হাতুড়ি পিটিয়ে লোহার কাজ নিঃসন্দেহে শক্ত, কিন্তু আদর্শের পাকে ফেলে স্বার্থের গন্ধ দিয়ে প্যাঁচ কষে দলের নাম দিয়ে শক্তিমান ক'রে যে কাজ সেটা অত্যন্ত জটিল আর তাতে হঠাৎ তেঁতে উঠবার ঠাঁই হয় না। ইংরেজীতে যাকে বলে Impulse সে Impulse কে অতি সাবধানে এড়িয়ে যেতে হয়। কিছু মনে করবেন না আপনাকে বলছি বটে, কিন্তু কিছু কিছু অন্য কথার রেশ থেকে যাচ্ছে। বাস্তবিক একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, কি করে এরা মুহূর্তে বদলে যায়? এরা কেউ আর মধ্যবিত্ত সন্তান না, কেউ আর মধ্যবিত্ত সমাজের মন নিয়ে চলে না। একদিকে বলবে এই কথা অন্যদিকে মজুর নামে যে জীবের জীবনের রঙিন ফানুস গড়ে তুলবে সে মজুর আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না।

বোধ হয় আর বিশেষ কিছু বলেনি কাগজওয়ালা। চা খেয়ে নিয়ে আমার দিকে সহজভাবে তাকিয়ে বল্লো, আপনার খুব অসুবিধা হয়েছে। পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছেন বোধ হয়? আমি ভবিষ্যতে সাবধান হবো।

সেদিন কাগজওয়ালা চলে যাওয়ার পরও ওদের কথাটা যেন মন থেকে গেলনা। আমার অবিশ্যি রাজনীতিযুক্ত চিন্তা নয় আমি

ভাবলাম কাগজওয়ালা যদি এতই ভিন্ন ও দলের লোকদের থেকে—তাহলে কি করে সে টিকে আছে? কোন দলের সব লোকই যে এক রকম হবে সে রকম রোমান্টিক ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু আমার মনে হল কোথায় যেন কাগজওয়ালা দলীয় ব্যাপারটাই সরিয়ে দিতে চাইছে। সে যেন দলগত ব্যবস্থাটাই মানতে পারছে না। আমার অবিশ্যি ভুল হতেও পারে। হতে পারে কাগজওয়ালাও দল গড়তে চায় দলে থাকতে চায় তবে সে দলের ঐক্য অন্য রকম হবে। ঠিক কথাটি কি আমি ভেবে বুঝে পেলাম না। শুধু এটুকু বুঝলাম কোথাও নিশ্চয়ই কোন বৈষম্য ঘটেছে বা ঘটছে।

উপরে আমি যা লিখলাম তা খুব পরিষ্কার নয়। শুধু সেই সুদূরের দিনটিতেই যে আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি নি তা নয়। তারপর থেকে বহুদিন কাগজওয়ালার কথা মনে পড়লেই এই বৈষম্যের কথাটা আমি ভেবেছি কিন্তু পুরোপুরিভাবে এর পরিষ্কার কারণগুলি আমি বুঝতে পারি নি। যে দিনটির কথা লিখলাম সেদিন কাগজ-ওয়ালা বেশ উত্তেজিত অবস্থায় ছিল এবং উত্তেজিত থাকলে কোন মানুষই তার কথাটি ঠিক বলতে পারে না। সেদিনের পরেও কাগজ-ওয়ালা আমাকে বলেছে, বলেছে ক্ষোভের সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে, কিন্তু যতই কেননা চেষ্টা করি কোথায় যে ও বাধা পেল কি দিক দিয়ে ওর পরিবর্তন ঘটে গেলো সেটা বুঝতে পারা যেমন শক্ত হয়েছিল—বুঝেও লিখতে তার চেয়ে কঠিন মনে হচ্ছে।

বোধ হয় নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি হবে সময়টা। পরীক্ষার পড়া নিয়ে মনে মনে বেশ শঙ্কিত বোধ করছি ওদিকে শীতও ক্রমে নেমে আসছে উত্তরের হাওয়ায় হাওয়ায়। কলেজের ক্লাশগুলি হয়ে উঠেছে প্রায় অকুরন্ত। প্রত্যেক প্রফেসর তার পড়া নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত।

কোনরকমে গিলে খাইয়ে দিয়ে তবে যেন তাঁদের মুক্তি। এরই মধ্যে বহুদিনের চেষ্টার ফলে স্টেজ বেঁধে নাটকও হয়ে গেল। যেন নাটকটা শেষ হওয়ার অপেক্ষাতেই ছিল সব কিছু। বোধ হয় এক শনিবারের রাত্রে নাটক হোল, তারপরের সপ্তাহের মাঝামাঝি একদিন ক্লাশে বিরাট গোলমাল। হিসেব করে রমেশ নাকি দেখিয়ে দিয়েছে এক পয়সাও উদবৃত্ত হয়নি বরং তার এবং আরও দু একজনের বেশ কিছু খরচা হয়েছে। একথা রমাপতির দল মানবে না। তারা বলছে সমস্ত ব্যাপারটাই জোচ্চুরি। বঙ্কুবিহারির জন্য চাঁদা দিয়েছে অনেকেই। শ'পাঁচেক টাকা নাকি উঠেছিল। তার থেকে খরচ খরচা বাদ দিয়ে অন্ততঃ শ' তিনেক টাকা থাকার কথা। এইবার শালাদের ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শ্যালক সম্পর্কিত ব্যক্তিদের কারও খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন Inorganic Chemistryর ক্লাশ হওয়ার কথা। প্রফেসর গোস্বামি রেজেষ্ট্রী হাতে ঘুরে গেলেন। ক্লাশ করবেন কি ক্লাশে ঢুকতেই পারলেন না। সেদিন গোটা দুই ক্লাশ অমনি গেল। অনেক লেকচার হল। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিল। অবশেষে রমাপতির 'আচ্ছা দেখে নেবো' মতলবে সবাই সায় দেওয়ায় ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটল আপাততঃ। পরদিন ক্লাশে আসতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। বাস থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে কলেজ গেটে এসেই দেখি রীতিমত ভিড় জমে গেছে। কি ব্যাপার, কিসের ভিড, বুঝতে না বুঝতে কাগজওয়ালা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভিড় থেকে দূরে গলির আরও অনেকটা ভেতরে।

বেশ দ্রুত গলায় সংক্ষিপ্ত সংবাদদাতার মত বলে গেল, শুনুন, রমেশ প্রচণ্ড মার খেয়েছে। মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এই একটু আগে এ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি ওর বাড়ীতে যদি পারেন খবরটা দিয়ে আসবেন। এবার আমার একটা

খবর আছে। আমি যাচ্ছি বেলঘরের দিকে। সেখানে একটা কারখানায় স্ট্রাইক হচ্ছে তাই নিয়ে আমাকে যেতে হচ্ছে। আমার মাকে বলে আসবেন রাত্তিরে না ফিরলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আর মাকে বলবেন মালতী এলে তাকেও যেন বুঝিয়ে বলে।

আমি রমেশের কথা প্রায় ভুলে গিয়ে বল্লাম, রাত্তিরে না হয় ফিরবেন না, কবে ফিরবেন ?

ইতস্ততঃ ক'রে বল্লো কাগজওয়ালা, তাও বলতে পারছি না। ধরা না পড়লে কালই ফিরবো। তবে কি জানেন ? আচ্ছা সে পরে বলবো।

আমাকে আর কোন কথা বলার অবসর না দিয়েই কাগজওয়ালা চলে গেল বড় রাস্তার দিকে। বুঝলাম সাইকেল আনে নি। কিন্তু কলেজে এসেছিল কেন ? আচমকা খেয়াল হল রমেশের বাড়ীর ঠিকানা তো বলে যায় নি। রাস্তাটার নাম জানি আর জানি ওর কাকার নাম। তিনি ডাক্তার। সম্ভবত খুঁজে বার করা যাবে। ভাবতে ভাবতে কলেজের গেটের দিকে এগিয়ে এলাম। ভিড় তখনও আছে। তবে সে ভিড় জমাট বাঁধা নয়। ছাড়া ছাড়া ভাবে এখানে ওখানে জটলা করছে আর তারই সম্মিলিত গুঞ্জন ধ্বনি গলিটায় গম গম করছে।

কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকতেই দেখি একদিকে ইন্দু আর জন দুই তিন ছেলে এই নিয়ে খুব উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনছি ইন্দু আমাকে দেখতে পেয়ে বল্লো, কখন এলে ?

বল্লাম, এই তো একটু আগে। বলতে বলতে আমি ইন্দুকে ডেকে নিয়ে প্রাঙ্গণ ছেড়ে বারান্দায় উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছিল বলো ত' ?

চোখের চশমায় একটা ঠেলা দিয়ে তুলে দিয়ে ইন্দু বল্লো, রমাপতি তো লুকিয়ে ছিলো। আজ রমেশকে হাতের কাছে পেয়ে

খুব ঠেঙ্গিয়েছে। তারপর কি হয় বলতে পারছি না। রমেশকে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। রমাপতি তার দলবল নিয়ে সরে পড়ছে। শুনছি পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। আমার ভাই বিশ্বাস হয় না। মারামারি তো কতই হয় সবই কি পুলিশ এসে মিটিয়ে দেয়?

মাথা নেড়ে বল্লাম, কিন্তু রমাপতি হঠাৎ মারধর করলো এ কি সেই টাকার ব্যাপার?

ইন্দু বল্লো, তাছাড়া আর কি! কাল থেকেই ক্ষেপে আছে। আর ভেবে দেখো ক্ষেপার কথাই। অতগুলো টাকা একেবারে নস্যির মত উড়িয়ে দিলো। তবে শুনছিলাম আরও নাকি কি সব ব্যাপার আছে। ঐ সব যা তা বলাবলি করছিল। কি নাকি রমেশের নামে কেস্ হয়েছে। এইসব।

দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ইন্দু চুপ করে থেকে আবার বল্লো, এই যে মারটা খেল আশ্চর্য কি জানো কলেজের দ্বারোয়ানটা ছাড়া বড় কেউ আটকাতে যায় নি। আমাদের ক্লাশের তো কেউ যায়ইনি। অন্যান্য ইয়ারের দু'চারটি এগিয়ে গিয়েছিল রমাপতির ভাষণ শুনে তারাও পিছিয়ে গেল। শেষটায় ল্যাবরেটারির বেয়ারা তিন চারজন আর দ্বারোয়ান এই এরা মাঝে পড়ে মার থামায়! ওদিকে ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল নেবে আসেন। এ্যাম্বুলেন্সে ফোন ক'রে দিয়েছিল অফিস থেকে। এ্যাম্বুলেন্স এসে ওকে নিয়ে গেল। এদিকে থানায় না কি ডায়ারি করিয়েছে, কি না কি পুলিশ আসবে, অত সব জানি না। ইঃ কি কলেজে পড়তে এলাম বাবা! আজ এই, কাল ঐ, কেবল হৈ রৈ গোলমাল! ভাল লাগে না বত ইয়ে!

ইন্দুর সরল মুখে বিরক্তির ছাপটা পড়ে ভাল। খানিকটা বিরক্তি খানিকটা অভিমান খানিকটা দ্বাগত মুখভাব নিয়ে ইন্দু বল্লো; চলো যাই এবার ক্লাশে।

আমি হেসে ফেলে বল্লাম, আজ আর ক্লাশ জমবে না। তুমি যাও আমি ঘণ্টা দুই পরে যাচ্ছি।

অতি সরল বাংলায় যাকে বলে কর্তব্য সম্পাদন তাই করতে বেরুলাম। ভবানীপুরে এক বাড়ীতে খবর দিতে হবে তাদের ছেলে মার খেয়ে হাসপাতালে গেছে। আর এক বাড়ীতে গিয়ে বলতে হবে ছেলে রাতভোর না ফিরলেও ভাবনার কিছু নেই, সে কোথাও না কোথাও নিশ্চয় আছে। কোথায় আছে? তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

বেলা প্রায় একটা নাগাদ রমেশের বাড়ীটা পাওয়া গেল। কলিং বেল টিপে দাঁড়ালাম। দরজা খুলে দিলে বিমলা। সংবাদটা তাকে দিলেও চলতো। সাত পাঁচ ভেবে তার মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। দেখা হোল মেজবাবু অর্থাৎ রমেশের ডাক্তার কাকার সঙ্গে।

তাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে বল্লাম, কলেজে একটা মারামারি হয়েছে। রমেশবাবু মার খেয়ে হাসপাতালে আছেন। খুব সম্ভব মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল। আমি শুধু খবরটা জানিয়ে গেলাম।

ডাক্তার বাবু স্বভাবতই আরও কিছু জানতে চাইলেন, কে মেরেছে, কেন মেরেছে, ইত্যাদি। আমি বল্লাম অত সব আমি জানি না। কলেজে গিয়ে শুনলাম রমেশ বাবু মার খেয়েছে বাড়ীতে খবর দেওয়াটা কর্তব্য বোধে জানিয়ে গেলাম। ডাক্তার বাবু ধন্যবাদ জানালেন। আমি বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। এদিকের রাস্তাগুলি বিশেষ জানা নেই। এদিক সেদিক দেখে নিয়ে কাগজওয়ালার বাড়ীটার দিক আন্দাজ করে এগোলাম রাস্তা বরাবর। খানিকটা এগোতেই বাঁদিকের একটি গলির মোড়ে দেখি মালতী দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে এগিয়ে এলো, হেসে বল্লো, খুব অবাক হয়ে গেলেন?

আমি বল্লাম, কেমন আছেন? আপনি যে দিব্যি হেঁটে ফিরে

বেড়াচ্ছেন এতেই আশ্চর্য লাগছে। সেই অসুখের পর এই তো প্রথম দেখছি।

মালতী বল্লো, বেরুবো না তো চিরকাল শুয়ে থাকবো? একটু চুপ থেকে বল্লো, দাদার কি হয়েছে? মার খেয়েছে বল্লেন, আপনি দেখেন নি?

আমি বল্লাম, আমি দেখিনি। আমি কলেজে যাওয়ার আগেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মালতী চুপ করে আমাকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বল্লো, এখন কি কলেজে ফিরে যাচ্ছেন না কি মেসে?

বল্লাম, না যাচ্ছি আমাদের কাগজওয়ালার বাড়ী। সেখানেও সংবাদ দেওয়ার আছে। চলুন না যাই!

মালতী বল্লো, চলুন। সেখানে কি সংবাদ? তিনি কি করেছেন? পুলিশে ধরা পড়েছেন?

চলতে চলতে বল্লাম, না এখনও ধরা পড়েন নি তবে পড়ার আশঙ্কা আছে।

পাশাপাশি চলছি দুজনে। পাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মালতীর মুখের রংটা সুস্থ হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু চেহারায় একটা গাম্ভীর্য এসেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও যে চটপটে ভাবটা ছিল সেটা নেই। মালতী বল্লো, চুপ করে আছেন কেন, বলুন?

বল্লাম, বলার খুব কিছু নেই। বেলঘরের কাছে কি এক কারখানায় ষ্ট্রাইক হবে কিংবা হচ্ছে, আমাকে বলে গেল রাত্তিরে না ফিরলে যেন বাড়ীর লোক দুর্ভাবনা না করে। আমি ভগ্নদূত, সেই দুঃসংবাদ দিতে চলেছি।

মালতী কোন উত্তর দিলো না। কি একটা ভাবনায় মগ্ন হয়ে চল্লো আমার পাশে পাশে। শীতের দুপুর। রোদ্‌টা বেশ চড়া।

রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। কচিদ্ কোন পানের দোকানে রেডিওর গান শুনতে এ বাড়ী ও বাড়ীর চাকর বাকর কিংবা দুচারজন বেকারের ভিড় হয়েছে। তারা গানও শুনছে আমাকে আর মালতীকে দেখে একটু আধটু ইঙ্গিতও করছে। মাঝে মাঝে রিক্সাওয়ালা ঠুংঠাং আওয়াজ তুলে সোয়ারি নিয়ে ছুটে চলেছে। বল্লাম, এখান থেকে ওদের বাড়ী বেশ দূর বলে মনে হচ্ছে। একটা রিক্সা ডাকবো ?

মালতী মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে, আমি যে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি এটা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না ?

কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে উঠলো, শুনুন, খবরটা আপনি বলে আসুন। বলবেন আমি বিকেলের দিকে যাবো। যেন ভাবনা না করে। বাড়ীটা চিনতে পারবেন তো ?

বল্লাম, তা পারবো।

মালতী বল্লো, তাহলে আমি চলি। বাড়ী যাই। কাকা এখনই নিশ্চয় হাসপাতালে বেরিয়ে যাবে। আমার একেবারে খেয়ালই হয় নি। কিছু মনে করবেন না। দাদার জন্য মনটা ভাল লাগছে না।

চলে গেল মালতী। আমি ওর চলে যাওয়া দেখলাম খানিকক্ষণ। রাস্তাটা যেখানে ডানদিকে মোড় ফিরেছে সেখানে গিয়ে মালতী একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখলো তারপর আর ওকে দেখা গেল না। আমি আবার পথ চলতে শুরু করলাম।

কাগজওয়ালার বাড়ীতে খবর দিয়ে যখন বাসে এসে উঠলাম তখন শীতের বেলা হেলে পড়েছে। তবু কলেজে ফিরে এলাম। ক্লাশ যদি দু' একটা এখনও করা যায় মন্দ কি ! তাছাড়া পুলিশ এলো কিনা সেটাও জানা দরকার। এলাম কলেজে। ক্লাশও করলাম। শুনলাম রমাপতি এরই মধ্যে কলেজে এসে ঘুরে গিয়েছে। শাসিয়ে গেছে মৃন্ময় চৌধুরিকে পেলে খুন করে ফেলবে। সেদিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ থেকে

বেরুলাম ছটায়। তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। কলেজের আলো-আঁধারি শীতার্ত সন্ধ্যায় আমরা জন কয় ছাত্র চুপচাপ রাস্তায় বেরিয়ে এসে যে যার আশ্রয়ের দিকে পা বাড়ালাম। পুলিশ তখনো আসে নি। মনে মনে জানতাম আসবে না। কিন্তু এই কলেজে রমেশ আবার কি করে আসবে এইটেই বোধ হয় আমাদের সবারই প্রশ্ন ছিল।

শীতের সন্ধ্যায় বিষণ্ণ মন নিয়ে ফিরে আসতে আসতে কি জানি কেন বার বার কলেজ বাড়ীটার ছবি মনে ভেসে উঠলো। বিদায় নিয়ে আমরা আজই যাচ্ছি না তবু যেন কি রকম একটা চলে যাওয়ার কথা মনে হলো। এই কলেজ থেকে বন্ধু গিয়েছে। তারও আগে গিয়েছে সেই যে ছেলেটি স্যুইসাইড করলো। আজ রমেশ গেলো। মৃন্ময়কে যতদূর জানি কলেজ একরকম সে করেই না। আজকের ঘটনার পর সেও বোধ হয় আর আসবে না। চলে যাবো আমরাও। তবু এই যে যাওয়ার আগে কি সব যেন ঘটে গেলো যা না ঘটলেও পারতো।

সেদিন গভীর রাত্রে দরজার কড়া নাড়ার শব্দে জেগে গেলুম। লাইট জ্বালিয়ে দরজা খুলতে দেখি কাগজওয়ালা দাঁড়িয়ে।

কি ব্যাপার? এত রাত্রে? ভেতরে আসুন!

ডেকে বসালাম। রুমমেটও জেগে বসলো। কাগজওয়ালা যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করে বল্লো, বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তা নইলে বাড়ী পর্যন্ত হেঁটে চলে যেতাম। আজ রাতটা আপনাদের এখানে থেকে যেতে হচ্ছে।

রুম মেট নীরবে উঠে মেঝের উপর দুটো তক্তপোষের ফাঁকে বিছানা করে অর্থাৎ কম্বলের উপর চাদর বিছিয়ে একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়লো। তার বিছানাটা সে কাগজওয়ালাকে ছেড়ে দিলো। আমি বল্লাম, শোয়ার ব্যবস্থা তো হল। কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।

কাগজওয়ালা রুমমেটের বিছানায় আমার গরম চাদরটা গায়ে টেনে শুতে শুতে বল্লো, খাওয়া নয় এইযে শুতে পারলাম এতেই প্রচুর আরাম পাচ্ছি। সেই বেলঘরে থেকে হেঁটে ফিরছি। এখন কটা হবে ?

টেব্লের উপর ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বল্লাম, দেড়টা বাজে। মিনিট দশেক ফাষ্ট আছে।

বলতে বলতে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়লাম বটে ঘুম এলোনা। রুম-মেটকে আমি চিনি। তার কাজকর্ম অমনি অনায়াস। অল্পস্বল্প নাক ডাকার অভ্যাস তার। মেঝের বিছানায় শুতে শুতে তার নাক ডাকছে। আমি পাশ ফিরে শুয়ে টেব্লের উপর থেকে সিগারেট আর দেশালাই হাতড়ে নিয়ে ধরালাম একটা সিগারেট। ওধারের বিছানা থেকে কাগজওয়ালা বল্লো, ঘুমোন নি ? দিন ত একটা সিগারেট ? মনটা ভাল নেই। ঘুম আমারও আসছে না।

সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরে আমি হঠাৎ সরাসরি একটা প্রশ্ন করে বসলাম কাগজওয়ালাকে, আচ্ছা, একটা কথা বলবেন ? অনেকদিন আগে ইন্দু বলেছিল আপনি নাকি কম্যুনিস্ট। সত্যি কি তাই ?

উত্তর হোল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, না। আমি কম্যুনিস্ট নই। আমি কেন, কোনদিন কোন মানুষই কম্যুনিস্ট হয়না। যারা ভাবে তারা কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছে তারা ভুল ভাবে। অপর যারা তাদের কম্যুনিষ্ট মনে করে তারাও ভুল করে। মানুষ মানুষই। সে কবিও নয় সায়ন্টিষ্টও নয় আর্টিষ্টও নয়। সে একটা অনেক কিছু নিয়ে গড়া মানুষ। অমুকে ডাক্তার, কিংবা অমুকে উকিল, সেটা হলো তার পেশাদারি পরিচয়। অমুকে আর্টিষ্ট বলে যদি বলা হয় আর্ট তার পেশা তাহলে তার আর্টের সাধনাকে······কি ঘুমিয়ে পড়লেন না কি ?

বল্লাম, ঘুমিয়ে পড়িনি তবে সব যেন কি রকম গুলিয়ে যাচ্ছে।

আমি কিন্তু মনে মনে জানতাম আপনি রীতিমত কম্যুনিষ্ট।

একটু চাপা গলায় বল্লো, আপনি মালতীকে জানেন। আমার সঙ্গে মালতীর সম্পর্কটা কি তাও জানেন। তাহলে কি আপনি বলবেন আমি লোকটা প্রেম করে বেড়াই প্রেম আমার পেশা? বলুন, বলবেন?

বল্লাম, তা নয়, কিন্তু ...... ।

কাগজওয়ালা সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে বল্লো, আপনি জানেন না আমি জানি মধ্যযুগের ধার্মিকদের নানা নিয়ম ছিল। দশ বছর মঠে বাস করলে তারা ফ্রায়ার হতো, আঠারো বছরে হতো ডিন, এমনি সব ভাগ ছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টিতেও নানা ভাগ আছে। কেউ পি. সি. কেউ সি. সি. কেউ ডি. সি. এই সব। আবার কেউ পুরোপুরি সভ্য। কেউ আধাআধি সভ্য। কেউ বা শুধু সিম্‌-প্যাথাইজার। এরা সবাই কম্যুনিষ্ট। অথচ সমস্যাটা কোথায় জানেন? এই যেমন আজকের মিটিংয়ের ব্যাপারটা বলি। মজতুরদের মিটিং। এদের জন পাঁচছয় মজতুর ছাড়া বাকী সব আনকোরা মজতুর। লালঝাণ্ডা ছাড়া তারা আর বিশেষ কিছু কম্যুনিজম জানে না। আমরা কলকাতা থেকে সবজান্তা কম্যুনিষ্ট গিয়েছি জন চারেক। উদ্দেশ্য মিটিং করে ওদের দিয়ে একটা ষ্ট্রাইক ঘটানো। যারা কম্যুনিজম জানেনা তাদের কম্যুনিজম বোঝাতে আমরা যাইনি। আমরা গিয়েছি উপস্থিত কিছু মাইনে বাড়ানোর কথা বলে কিছু বা সহানুভূতি দেখিয়ে মজতুরদের উত্তেজিত ক'রে কোনরকমে একটা ষ্ট্রাইক ঘটিয়ে ফেলতে। প্রায় শ'তুই মজতুরকে আমরা ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে কি বলবো কম্যুনিজমের হাতিয়ার ক'রে ফেলতে। মনে করুন এরা ষ্ট্রাইক ক'রলো। সে যে কি ব্যাপার আপনার ধারণা হবে না। দিন এনে দিন চলে যাদের তারা কাজ বন্ধ ক'রে বসে আছে। মালিক চড়াও হচ্ছে নানা পথে। পুলিশের

জুলুমতো আছেই। ষ্ট্রাইক যদি ভেঙে পড়ে তাহ'লে ত' কথাই নাই, যদি নাও ভাঙে যদি সাফল্য লাভও করে তাহ'লেও ঐযে মজুর দল তারা কি কম্যুনিষ্ট হয় নাকি? তারা কি কম্যুনিজম বুঝে ফেলে? তাও কি কখনও সম্ভব? তারা বুঝলো একজোট হয়ে মাইনে বাড়ানো চলে। আর যদি ষ্ট্রাইক ভেঙে পড়ে তাহলে তারা বুঝলো শয়তানের কারসাজিতে পড়ে তাদের রুজি চলে গেল।

বোধহয় একটু ঢুল এসেছিল আমার। হাতের সিগারেটটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে বল্লাম, তাহ'লে আমার প্রথম প্রশ্নটার কি হ'ল ? আপনি কি কম্যুনিস্ট নন?

কাগজওয়ালা সিগারেটটা দেয়ালে পিস্টে টুকরোটা দরজার দিকে ছুড়ে ফেলে দিযে বল্লো, উত্তর তো দিয়েছি। আমি কম্যুনিস্ট নই। কম্যুনিজমে বিশ্বাস করি সে জন্যে কাজও করি। কিন্তু কম্যুনিজমে বিশ্বাস করাটা বাহাতুরি কিছু নয়। আমার ধারণা কম্যুনিজম নামটা নূতন আর এর ডায়নামিক্ প্রিন্সিপ্যালও নূতন কিন্তু এর মূল সূত্র অতি প্রাচীন। মানুযে মানুষে সমান অধিকার সব বিষয়ে সব ব্যাপারে ইতিহাসের এই তো পরিচালন ক্ষমতা। ভেবে দেখুন সেন্স অব ইকুয়িটি শেষ পযন্ত মানবমনের এই মূল ধারণা অসভ্য বর্বর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসকে চালিয়ে এনেছে কিনা? আজ আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করছি, কিন্তু মূল সূত্রটা কোথায়, আমাদের প্রধান appeal কোথায? এইখানে। আমরা জানি প্রত্যেক মানুষের মনেই ন্যাযের একটা ধারা আছেই। রাস্তায একটা ঝগড়া হ'লে আমরা ঝগড়াটা যে মিটিয়ে দি সেও ন্যায়মান ক'রে। কিন্তু, নাঃ আপনাকে ঘুমুতে দিচ্ছিনা। আপনি এত সব প্রশ্ন করেন নি।

আমি বল্লাম, আমি জানতে চাইছিলাম আপনারা যারা কম্যুনিস্ট ব'লে পরিচিত তাদের কাজটা কি? তাদের কি বাড়ীঘর ছেড়ে, মা ভাই

বোন সব ফেলে রেখে, পড়াশুনো তুলে রেখে, রুজি রোজগার ভুলে গিয়ে কেবল মিটিং করা লেকচার দেওয়া আর ষ্ট্রাইক ঘটানো, এই কাজ ?

খানিকক্ষণ চুপ থেকে কাগজওয়ালা বল্লো, খুব ভালো বলেছেন। এখন দেখছি প্রায় তাই। শুধু এখন নয় আজ বেশ কিছুদিন ধরেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। অস্বস্তি যত বাড়ে আমাদের মতিও তত অস্থির হয়ে পড়ে। আর আমরা আরও বেশী ক'রে চা খাই সিগারেট টানি আর কাজের নামে মানুষ ক্ষেপিয়ে বেড়াই। প্রায় তাই।

আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে কাগজওয়ালা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লো, আজকে একরকম ঝগড়াই হ'য়ে গেল। সেদিনের অমিয় বাবুকে মনে আছে তার সঙ্গে। তার সঙ্গে আর সবাইর সঙ্গেও। মিটিং ডেকেছে কিন্তু আমি কিছুতেই ওদের কথা বলবো না। আমি বলবো পরিষ্কার কথায় ষ্ট্রাইক ক'রে কি বিপদ হ'তে পারে সেই কথা। আমি বল্লাম ষ্ট্রাইক ক'রে শুধু মাইনে বাড়ালেই চলবে না, মাইনে নাও বাড়তে পারে। আমি ষ্ট্রাইক করতে মানাও করলাম। যদি ওরা ওদের জোর কোথায় দাবী কোথায় দায়িত্ব কি বুঝতে না পারে আমি বল্লাম তোমরা ভাই ষ্ট্রাইক করো না। শেষ পর্যন্ত অবশ্যি সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম হ'য়ে গেল। হঠাৎ লাঠি নিয়ে একদল পুলিশ ঝাপিয়ে পড়ে সে কি দমাদম মার, কে যে কোথায় ছুটলাম ? তখন রাত আটটা সাড়ে আটটা। ওদিকে কলকাতার বাইরে বেশ রাত্ত তখন। অন্ধকারে রাস্তা চিনিনা, ছুটছি ত' ছুটছি। কে কোথায় গিয়ে পড়লাম জানিনা। অবশেষে একটা পান বিড়ির দোকনদারকে জিজ্ঞেস ক'রে বড় রাস্তায় যাবার হদিশ পেলাম। ওদিকের বাস তখন বন্ধ। পায়ে হেঁটে ফিরলাম।

একটু পরে বল্লো কাগজওয়ালা, নাঃ এবার ঘুমুই। কাল আবার আজকের জন্য ব্যাখ্যান দিতে হবে। পারিতো কালকেই শেষ।

সে রাত্রে নয়। সে রাত্রে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লাম। বেশ কিছুদিন পরে কলেজ থেকে সেদিনও ফিরছি সন্ধ্যার পর দেখি রাস্তায় একটা আলোর তলায় দাঁড়িয়ে অমিয় বাবু আর কাগজওয়ালা। আমাকে দেখে কাগজওয়ালা অমিয় বাবুর সঙ্গে কথা শেষ ক'রে দিয়ে আমার সঙ্গে চল্লো। এ কয়দিন ক্লাশে কাগজওয়ালাকে দেখেছি মাঝে মাঝে। সেদিন রাস্তায় দেখা হ'তে মনে হোল আমার অনেক কিছু জানবার আছে।

কাগজওয়ালা বল্লো, বড়দিনের ছুটির আগেই কি রকম শীত পড়েছে। এবার শীতটা জোর পড়বে।

আমি বল্লাম, আমার তো বরাবর ঐ রকম মনে হয়।

কাগজওয়ালা বল্লো, ছাত্র পড়াতে যাবেন না ?

বল্লাম, সন্ধ্যে বেলায় পড়াচ্ছি না। পড়াই সকালে।

'ভাল করেছেন।' বলতে বলতে কাগজওয়ালা একটা চায়ের দোকানের দিকে মোড় ফিরলো। 'আসুন চা খেয়ে যাই।'

প্রায় দশটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত ক্লাশ ক'রে ক্লান্ত লাগছিল। শুধু চা ভাল লাগবে না, কিন্তু চায়ের সঙ্গে আরও কিছু সব সময় জোটানো শক্ত হ'য়ে পড়ে। পকেটে হাত চাপড়ে চায়ের দোকানের ছোট চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসলাম।

চা এলো। কাগজওয়ালা বিড়ি বার ক'রলো। বিড়িটা ধরিয়ে চা খাচ্ছি। কাগজওয়ালা বল্লো, রমেশ ট্রান্সফার নিয়েছে, জানেন ?

বল্লাম, জানিনা। কলেজে শুনছিলাম। কিন্তু এখন ট্রান্সফার নিয়ে যাবে কোন চুলোয় ?

কাগজওয়ালা বল্লো, হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরেছে এ খবরটা নিশ্চয়ই জানেন না ?

মাথা নেড়ে জানালাম, জানিনা। তারপর পেয়ালায় চুমুক দিলাম।

কাগজওয়ালা বল্লো, হালের কোন খবরই রাখেন না দেখছি। রমেশ বাড়ী ফিরে নূতন আদেশ দিয়েছে।

চকিতে মুখ তুলে প্রশ্ন করলাম, আদেশ মানে কিসের আদেশ?

কাগজওয়ালা মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হ'য়ে, পরমুহূর্তেই সহজভাবে বল্লো, আদেশটা বোঝা শক্ত। অর্থাৎ অনেকখানি background জানা দরকার। বলেছে হয় মালতী বাড়ী ছাড়বে না হয় ও বাড়ী ছাড়বে।

'তার মানে?' অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম। বাড়ী ছাড়বে মানে? হোস্টেলে যাবে নাকি রমেশই মেসে যাবে?

কাগজওয়ালা হাত উল্টে বল্লো, বুঝুন এখন ধাঁধাঁর প্যাঁচ। গোড়ায় একটা কথা আছে। এই যে রমেশ মার খেল কলেজে এ নাকি আমি ব্যবস্থা করেছিলাম। আবার আমি যে ব্যবস্থা ক'রেছিলাম তার মূলে না কি মালতীর সায় ছিল।

এক চুমুক চা খেয়ে কাগজওয়ালা বল্লো, বেচারা মালতী! সেদিন মায়ের কাছে বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছে মেয়েটা।

আবার একটু চা খেয়ে বল্লো, অথচ She loves her brother!

আমি সত্যই মানব মনের এরকম ঘোরালো প্যাঁচের কথা জানতাম না। রমেশের কথা শুনে কথাটা ঠাহর ক'রতেই কিছুটা সময় গেল। ভেবে পেলাম না এতে রমেশের লাভ কোথায়, কি তার স্বার্থ। কাগজওয়ালা বল্লো, ভাবছেন রমেশ এরকম কেন বলে? আমিও ভেবেছি। সত্যি বুঝিনা। তবে এটা বুঝি আর কিছু না হোক এতে রমেশের রোষ মেটে। এই যেমন বাঙ্গালী কেরানী ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগে মেজাজ খারাপ ক'রে বাইরের শত অপমানের রাগ ঘরে গিয়ে বৌকে কিংবা ছেলেমেয়েকে মেরে মেটায়। দেখেন নি বুঝি? আমি তো বস্তিতে থাকি প্রায়ই মানব মনের অনেক বিকারই দেখতে হয়।

চুপ ক'রে শুনলাম কথাগুলি। বিড়িটা ফেলে দিয়ে বাইরে গিয়ে সিগারেট কিনে আনলাম। সিগারেট ধরিয়ে বল্লাম, তারপর আপনি কি করছেন?

কাগজওয়ালা বল্লো, তারপর মানে কিসের পর?

বল্লাম, বি,-এস্-সির পর। আমাদের তো এখন এই কথা। জানুয়ারীর প্রথমেই টেস্ট তারপর কে কোথায় থাকবো ঠিক কি? (এই বল্লাম বটে। সত্যি সত্যি আমার প্রশ্নটা ছিল মালতীকে নিয়ে। রমেশের এরকম হুকুম জারির পর আপনি কি করছেন? কিন্তু প্রশ্নটা কি রকম ঘুরে গেল।) আমাদের তো এখন বি. এস্-সির পর কে কি করছি তাই নিয়েই কথাবার্তা শুধু।

কাগজওয়ালা প্রতি প্রশ্ন করে, আপনারা কে কি করছেন? আমি তো এটা খেয়ালই করি নি।

আমরা? বল্লাম আমি, আমরা প্রায় সবাই চাকরি করবো কিংবা চাকরির চেষ্টা করবো। প্রায় সবাই সেই তালে। ইন্দু বীরেন এমনি দু'চারজন অনার্স কোর্সের ছেলেরা এম এস্-সির কথা বলছে। তাও সুর যেন মিনমিনে।

কাগজওয়ালা বল্লো, আমি যে কি করবো বলতে পারছি না। It depends। হয়তো চাকরি নিতে হবে। এম, এস-সি পড়তে পারবো না। ম্যাথমেটিকস্ নিয়ে এম্-এ পড়বো।

একটু চুপ থেকে বল্লো, কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লাগবে যদি, হাসবেন না যেন, যদি কল কারখানায় মজুর হতে পারি। That will be my dearest work।

কাগজওয়ালাকে বোঝার চেষ্টা আমি অনেকদিন আগে ছেড়ে দিয়েছি। তার এই অতি প্রিয় ভবিষ্যতকে না বুঝেও প্রশ্ন করলাম, সেটা কি করে সম্ভব? কারখানায় চাকরি নিয়ে হাতুড়ি পিটবেন?

হেসে ফেলে কাগজওয়ালা বল্লো, হাতুড়ি না পিটলে কি মজুর হওয়া যায় না? এই বুঝি আপনার ধারণা?

স্বীকার করলাম কিসে মজুর হওয়া যায় জানিনা। কিন্তু বি, এস্-সি পাশ ক'রে দিন মজুরের চাকরি পাওয়া শক্ত হবে।

কাগজওয়ালা মাথা নেড়ে বল্লো, বি, এস্-সি পাশ ক'রে কল কারখানায় চাকরি পাওয়া সহজ হবে। ফিটার মিস্ত্রি না হ'তে পারি কিন্তু ওদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করবার মত চাকরি তো পেতে পারি। হয়তো মাইনে কিছু বেশী হয়তো কাজটা কিছু হাল্‌কা, কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশতে পারবো, কথা কইতে পারবো, ওদের বলতে পারবো, ওদের চিনতে পারবো।

আমার মনের চাপা প্রশ্নটা এবার হঠাৎ বেরিয়ে এলো, কিন্তু মালতীর কি হবে?

কাগজওয়ালা যেন ভেবেই রেখেছিল আমার প্রশ্ন। বেশ সহজেই বল্লো, সে কথা মালতী নিশ্চয় জানে। আমার যা ভাল লাগে আপনাকে বল্লাম ওর যা ভাল লাগে ও তাই করবে।

আমি মাথা নেড়ে বল্লাম, ঠিক অতটা সহজ কিন্তু নয়। ওর যদি ভাল লাগে আপনি এম, এ, পাশ ক'রে প্রফেসর হন, তাহ'লে কি বলবেন?

হেসে ফেল্লো কাগজওয়ালা। বল্লো, এক দোকানে অনেকক্ষণ বসলে দোকানদার বিরক্ত হয়। চলুন উঠি।

উঠি বলেও কাগজওয়ালা বসেই রইলো। আমি আরও দু'পেয়ালা চায়ের কথা ব'লে বসবার সময়টা বাড়িয়ে দিয়ে কাগজওয়ালাকে একটা সিগারেট দিলাম। কাগজওয়ালা সিগারেটটা নিয়ে বল্লো, শক্ত প্রশ্ন করেছেন। আজকেই আপনাকে জবাব না দিলেও চলে কিন্তু জবাব একদিন দিতেই হবে।

টেবিলের উপর সিগারেটটা ঠুকে নিয়ে কাগজওয়ালা বল্লো, কমরেড

বিপদ অনেক। আমি এক দলভুক্ত। অন্ততঃ এখনও আছি। সে দলের নিয়ম অনুসারে মালতীকে নিয়েও অনুমতি নিতে হবে। অবিশ্যি সেটাই সব নয়। দল আমাকে ছেড়ে দিতেও পারে। হয় তো দেবে।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে কাগজওয়ালা এক চুমুক চা খেলে একটান সিগারেট টেনে মুখের ধোঁয়া ছেড়ে বল্লো, একা মানুষ। দলের মোহ তাকে পেয়ে বসে। কবে নাকি সভ্যতার প্রথম সীমায় মানুষ ছোট ছোট দল গড়ে সমাজের প্রথম পত্তন করেছিল। আজও কিন্তু মানুষ দল পেলে জুটে পড়ে। আমি একা নই অনেকের সঙ্গে বিশেষ ভাবে একত্রিত এবে মনের ওপর কি মোহ বিস্তার করে! মানুষের একক শক্তি নাকি বলবো ব্যক্তিগত শক্তি তখন কেবল দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পথ খোঁজে। বৃহৎ সমাজে এক এক ছোট ছোট সমাজ। এরও প্রচণ্ড টান। নিজের বুদ্ধি বল, বিদ্যা বল, বিশ্বাস অবিশ্বাস রীতি নীতি সব ছেড়ে দিয়ে শুধু দলের নিশানা আর তাতেই তার মুক্তি। প্রতিমুহূর্তে যাচাই করে দেখ দলের পথে পথে আমিও আছি কি, নাকি বেরিয়ে গেলাম ?

আমি বল্লাম, এদিকে চা যে জুড়িয়ে জল। আপনার কি হয়েছে বলুন তো, কথায় কথায় এত বক্তৃতা দিয়ে ফেলেন কেন ?

এক চুমুক চা খেয়ে কাগজওয়ালা বল্লো, আমিও ভাবি কি হয়েছে ? বক্তৃতাটা নেশায় দাঁড়িয়েছে। আপনাকে কি বলবো, যদি সত্যি বলতে বলেন তাহ'লে একটা কথা Confess করি। Sense of guilt জানেনতো ? আমার মনে হয় কোথায় যেন আমি দোষী। এর আর ব্যাখ্যা দিতে পারবোনা। অন্ততঃ আজকে পারবো না। ব্যক্তিজীবনের এ এক সাংঘাতিক সমস্যা। সমাজদ্রোহী হ'লে চলবেনা। সামাজিক থাকতে হবে। আবার সমাজের পরিবর্তনের জন্য ওরা বলবে বিদ্রোহ ক'রতে হবে। ঠিক এইখানেই আমি মানতে পারছি না।

আবার চায়ে চুমুক দিয়ে কাগজওয়ালা মুখ তুলে তাকালো। আমি বল্লাম, আজকে থাক। আর একদিন শুনবো আপনার কথা। আজকে যে কারণেই হোক আপনি উত্তেজিত হয়ে আছেন।

কাগজওয়ালা খানিকক্ষণ চুপচাপ চা খেয়ে বল্লো, উত্তেজিত হয়ে আছি সত্যি। ঐযে অমিয় বাবুকে দেখলেন উনি আমাকে বন্ধুভাবে warning দিয়ে গেলেন। যদি এখনও সৎপথে অর্থাৎ নেতাদের নির্দেশিত পথে আমি চলি তাহ'লে এখনও সময় আছে। অর্থাৎ খাতায় নাম থাকবে। How sil y !

বল্লাম, যেতে দিন ওসব কথা। চা খেয়ে চলুন ওঠা যাক। রাত কম হয়নি।

আরও কিছু কথাবার্তা হয়েছিল বোধ হয় চা শেষ ক'রতে ক'রতে—সে সব আমার ভাল মনে নেই। চায়ের দোকান থেকে বেরিয়েও পথ চলতে চলতে সহজভাবে বোধ হয় কিছু পড়াশুনার আলোচনা হয়েছিল। তারপর কলেজ স্কোয়ারের ধারে এসে ওকে বাসে তুলে দিয়ে আমি মেসে ফিরেছিলাম। মেসে ফিরেছিলাম কাগজওয়ালার কথা ভাবতে ভাবতে। ল্যাবরেটরিতে লোহার টুকরোকে গলে যেতে দেখেছি সালফিউরিক এ্যাসিডে,—এ যেন একটা মানুষ ভেঙে চুরে নূতন চেহারায় গড়ে উঠছে।

পরদিন ক্লাশে কাগজওয়ালার সঙ্গে দেখা হল কথাবার্তা বিশেষ হ'লনা। বোধ হয় দুজনেই গতদিনের বিষয়টা এড়িয়ে গেলাম। কলেজে আমাদের তখন প্রায় নাভিশ্বাস উপস্থিত। বড়দিনের ছুটির আর দেরি নেই। ছুটির পরেই টেস্ট পরীক্ষা। ডেলি প্যাসেঞ্জারের মত অবস্থা আমাদের। একটি মাত্র ট্রেণ সেটাও বুঝি ফেল করি। ছুটির আগের সেই শেষ ক'টি দিন কলেজ জীবনের দীর্ঘতম দিন। পর পর অতগুলি ক্লাশ, আর প্রতি ক্লাশে চোখের নিমেষে অত তত্ত্ব আর

তথ্যকে শোনা এবং হজম করা,—সে এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা !

অতি দ্রুত অতি প্রয়োজনীয় সেই উর্দ্ধশ্বাস জ্ঞানার্জনের অস্বাভাবিক প্রচেষ্টার হঠাৎ সমাপ্তি ঘটে গেল বোধ হয় বিশে ডিশেম্বর সন্ধ্যাবেলায়। তার পরেও কিছু স্পেশাল ক্লাশের কথা হয়েছিল, কিন্তু সে ক্লাশ শেষ পর্যন্ত হয়নি। আমরা সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন ভারি মাথা নিয়ে বেরিয়ে আসি তখন কলেজজীবনের সমাপ্তির কথা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এসেছিলাম মনে হয়না। ফেল ক'রে আবার ফিরবো কিনা, পাশ ক'রে এম. এ. বা এম. এসসি. পড়বো কিনা, না কি পরীক্ষার পর যে কর্মময় জীবন আরম্ভ এখানে হঠাৎ থমকে গিয়ে তারই জন্যে প্রস্তুত হওয়ার ইঙ্গিত পেলাম,—এসব কিছু মনে হয়নি। মনে মনে এই মুহূর্তে যে ক্লাশগুলি শেষ হয়ে গেল তারই জন্য স্বস্তি বোধটাই ছিল। ক্লাশের সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে একই ক্লাশের ছাত্র আমরা এইযে একত্ব বা একাত্ম বোধ সে বোধ নিয়ে আর ক্লাশ আমরা ক'রবোনা—যতদূর মনে হয় সে সন্ধ্যায় নয় পরবর্তী জীবনে ক্রমে সেটা বুঝেছিলাম।

এমনি বুঝি হয়। জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্তই বিশেষ ভাবে দেখা যায় না। প্রকৃত রূপটি বর্তমান মুহূর্তে প্রায়ই বোধ হয় চাপা থাকে। তবু একটা অন্যমনস্ক ভাব নিয়ে সেদিন মেসে ফিরলাম। দেহে মনে ক্লান্তি নিয়ে মেসের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার রুম-মেট পাশের রুমে গল্প করছিল। আমার সাড়া পেয়ে ঘরে এসে টেবিলের উপর থেকে একটা খাম দিল।

খামটা খুলে পড়লাম। বন্ধুর চিঠি। খামে লিখেছে বটে তবে লিখেছে সামান্য ক'টি কথা।

কবে তোমাকে শেষ চিঠি লিখিয়াছি মনে পড়ে না। কি লিখিয়াছিলাম তাও মনে নাই। আমার ভাই টেস্ট পরীক্ষা দিয়াছে। বোধ হয় ভাল পাশ করিবে। তাহার কথা তোমাকে আর কখনও বোধ

লিখি নাই। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করিবে। তারপর যদি পার তাহাকে দেখিবে।

আমার কথা লিখিবার আর বিশেষ কিছু নাই। আমি আর সারিয়া উঠিব না। অসুস্থতা সব দিক দিয়া ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে।

আশা করি ভাল আছ। আমার কথা ভাবিয়া মন খারাপ করিও না। ইতি। বন্ধু।

এই বন্ধুর শেষ চিঠি। সেদিন জানতামনা এই শেষ চিঠি। কিন্তু চিঠির ভাষায় কি আছে? যেন অনেক দীর্ঘশ্বাস চাপা পড়ে আছে। চিঠিটা আবার পড়লাম। জানলাম বন্ধু তার শেষ বক্তব্য বলে গেল। ভাইকে দেখিবে। ভাইয়ের নাম দেয়নি, কিভাবে আমি দেখব তাও লেখেনি। পরম বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত মনে লিখে দিয়েছে ভাইকে দেখিবে।

ক'লকাতার এক জীর্ণ মেসের স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে তক্তপোশের উপর আধময়লা বিছানায় শুয়ে জানলাম অজ্ঞাত কোন এক কিশোরের দায়িত্ব অন্তিম পথযাত্রী নিশ্চিন্ত মনে দিয়ে গেল আমার উপর। সেই মুহূর্তে আমার কিছু করবার নেই, তবু মনে হোল কত কিছু যেন করবার আছে। অনেক অনেক কাজ আমার বাকী। অনেক যাত্রীর ভিড়। পথও দীর্ঘ। সেখানে আমি একা এবং আমি অনেক।

রুম-মেটের ধাক্কা খেয়ে জেগে বসলাম। চিঠিটা পাশে নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

যাদের নিয়ে বলতে বসেছিলাম তাদের নিয়ে আমার কথা প্রায় শেষ। এরপর যা আছে তা শুধু কয়েকটা ঘটনা বা পূর্বঘটনার রেশ। তাতে আমাদের চেনা মানুষ কটির খুব একটা নূতন পরিচয় নেই।

মালতীর পরীক্ষা হয়ে গেল ফেব্রুয়ারী মাসে। পরীক্ষার পর মালতীর বিয়ে হয়ে গেল কাগজওয়ালার সঙ্গে। সে বিয়েতে রমেশের

চেষ্টার কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। মালতীর কাকা চেষ্টা কতটা করেছিলেন জানিনা তবে অনিচ্ছুক খুব ছিলেন না।

রেজিষ্ট্রারের পৌরোহিত্যে একদিন বিয়ে হয়ে গেল। মাথায় ঘোমটা টেনে কাগজওয়ালার খোলার বস্তিঘরে মালতী বৌ হয়ে ঢুকলো। এর কিছু পরেই কাগজওয়ালা বার্ণপুরের কারখানায় কি এক চাকুরি জুটিয়ে এল। বি, এসসি, পরীক্ষা দিয়ে কাগজওয়ালা চলে গেল বার্ণপুরে। তখন এপ্রিল মাস। কলকাতায় প্রচণ্ড গরম।

তারপর এক বর্ষণক্লান্ত প্রাতঃকালে মেসের ঘরে বসে ক্রস্ওয়ার্ড সলভ্ করছি। আমার দর্শনপ্রার্থী হয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল টিনের স্যুটকেশ হাতে আর সামান্য একটা বিছানা বগলে ভীত শঙ্কিত একটি শ্যাম বর্ণের ছেলে। সে বন্ধুর ভাই। তার বাক্স বিছানা নামিয়ে দু'হাত দিয়ে তার দু'হাত ধরে তাকালাম তার চোখের দিকে। দেখলাম বন্ধুর ভাই-ই বটে। চোখে তার অনেক জিজ্ঞাসা। চোখের তলায় তার গভীর দৃঢ়তা।

নূতন একটি জীবন যেন। বেরুলাম তাকে নিয়ে কলকাতার পথে।